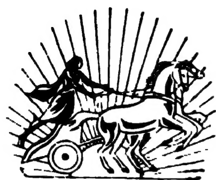
নতুন দিন

প্রফুল্ল রায়

ইস্টলাইট বুক হাউস



প্রথম সংস্করণ ঃ আশ্বিন, ১৩৬১

প্রকাশক ঃ বাসুদেব লাহিড়ী
ইষ্টলাইট বুক হাউস
২০, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড,
কলিকাতা—১

মুদ্রক ঃ নারায়ণ লাহিড়ী
লয়াল আর্ট প্রেস লিঃ
কলিকাতা—১

প্রচ্ছদভূষণ ঃ মণীন্দ্র মিত্র

মূল্য ঃ দুই টাকা বারো আনা

অগ্রজ কথাশিল্পী :

শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটক

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

পূর্ব বাঙ্‌লার ভাষা আন্দোলনের পটভূমি নিয়ে এ বছরের বৈশাখ সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় আমার একটি গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পটির নাম 'রক্তকমল'।

সাময়িক পত্রের ও গল্পের সীমাচিহ্নিত পরিসর থেকে তাকে উপন্যাসের বৃহত্তর পরিবেশে ধরে রাখার জন্য আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজ সম্পাদক ও সাহিত্যিকদের কাছ থেকে স্নেহসিঞ্চিত প্রেরণা লাভ করি। ভূমিকায় কেবলমাত্র নাম উল্লেখ করে তাঁদের মর্যাদা আমি ক্ষুণ্ণ করব না। এই সুযোগে তাঁদের প্রত্যেককে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য; এই উপন্যাসের চরিত্রগুলো কাল্পনিক। নাম, স্থান ও ঘটনার মধ্যে কেউ যদি একান্তই কোন মিল খুঁজে পান, তবে তা নিতান্তই যোগাযোগ। কারণ এর পেছনে ঐতিহাসিক সত্য রয়েছে।

—লেখক—



নতুন দিন

পূর্বভাষণ

উত্তরে তুষার-কবরী হিমালয়—যা'র অভ্রধবল দিক্‌বিস্তারের ওপর একটী পবিত্র স্বর্ণপ্রপাতের মত এসে পড়ে প্রথম সূর্যের আহ্বান; অকলঙ্ক অগ্নিলেখার মত জ্ব'ল্‌তে থাকে সহস্রচূড়া নগাধিরাজ। তারই পাদভূমি চুম্বন করে পড়ে আছে 'তরাই' এর গহন ছায়াবেষ্টনী, সেই কালনাগিনী অরণ্যবিস্তারে চোখের মণিতে কপিশ আগুনের জিঘাংসা জ্বালিয়ে ঘুরে বেড়ায় ডোরা-কাটা বাঘ, শালশাখা থেকে পাইথনের নিঃশ্বাস নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে টানতে থাকে কোন নিরপরাধ অহিংস্র পশুকে। 'তরাই' —আদিমতম পৃথিবীর প্রথম শ্যামলিম প্রকাশের মত ভয়াল, তেমনি সুন্দর, তেমনি অপরূপ। তারপরেই নেমে গেছে একটা নিঃসীম সমতলের বিস্তীর্ণ পরিসর; অবারিত ধানবন, রাশি রাশি লোধ্রফুলের সৌরভে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে-থাকা পরিশ্রমী মানুষের পবিত্রতম সৃষ্টি—গ্রাম—জনপদ।

দক্ষিণে শ্বেত চন্দনের মত বঙ্গোপসাগর—এই ভূখণ্ডের পাদমূলে নানা প্লাবনছন্দে তার আত্মসমর্পিত তরঙ্গবন্দনা। উত্তর থেকে পাঞ্চালীর বেণীবন্ধনের মত পর্ব্বতরেখা চ'লে গিয়েছে আসামের দিকে, কমলা ফুলের দেশে; চা বাগানের সবুজ সীমানাচিহ্নকে অতিক্রম ক'রে অনেক দূর পর্যন্ত। পূবে সবুজ পান্নার দীপ্তির মত আসাম আর পশ্চিমে বিহারের প্রাণহীন উষর মৃত্তিকার পাঁজর ছিন্ন ক'রে উঁকি দেওয়া জনার আর ভূট্টার ইতস্ততঃ আত্মপ্রকাশ।

উত্তরের তুষার-কবরী হিমালয়, দক্ষিণের শুভ্র-চন্দন বঙ্গোপসাগর, পূবের পান্নার দীপ্তির মত সবুজ আসাম, পশ্চিমের রুক্ষবসন বিহার—এই দিয়ে পরিবেষ্টিত যে দেশ ভূগোলের মানচিত্রে একটী নগণ্য বিন্দুর মত স্থান পেয়েছে, তার নাম বাঙ্‌লাদেশ। কিন্তু ভৌগোলিক মৃত্তিকার পরিচয়

সীমার বাইরে সংস্কৃতির বিরাট কৌতূহল নিয়ে, প্রাণচেতনার অপরিসীম জিজ্ঞাসা নিয়ে যে বাঙ্লা দেশ, তা চারদিকের প্রাচীরবেষ্টন অতিক্রান্ত হ'য়ে বীর্যবান পৃথিবীর দূরতম ক্রান্তিতে ক্রান্তিতে বিসারিত।

বিচিত্র এই ভূখণ্ড।

ওপরের ঘন নীল আকাশ চক্ররেখার পরপারে অর্দ্ধবৃত্তের আকারে নেমে গিয়েছে, তারই গায়ে কাশফুলের স্তবকের মত সঞ্চরমান মেঘের ছিন্ন পাণ্ডুলিপি ভেসে বেড়ায়, নীচে মেঘের হাঁসুলির মত মেদুর মেঘ্না, ত্রিবলী চিহ্নের মত দামোদর, পদ্মা আর ইল্সা প্রসারিত হ'য়ে র'য়েছে।

এই বাঙ্লা দেশ।

এর প্রতিটী শব্দ পূত মন্ত্রোচ্চারের মত গভীরসঞ্চারী, প্রতিটী গন্ধে দেবধূপের অপূর্ব্ব সৌরভ, প্রতিটী আলোকলেখায় নীরাজনের প্রস্তুতি, প্রতিটী স্পর্শে প্রাণশুদ্ধির সংকেত, প্রতিটী চিহ্নে লক্ষ্মীর মঙ্গলময় পদরেখা।

এই দেশ—কুসুমে সমাকীর্ণ, নীবার-মঞ্জরিতে সু-আভরণ। তবু তার মৃত্তিকাগর্ভ থেকে লাঙলের ফালে ফালে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্দের সশ্রদ্ধ অনুসন্ধানে উঠে আসে তাম্রশাসন, বিক্রমশিলা, পাষাণপট্ট ; তাদের গাত্রে গাত্রে উৎকীর্ণ র'য়েছে শিলালিপি। কোন সমর যাত্রার কাহিনী, কোন বিজয় গৌরবের ইতিহাস ; শিলা ফলকের স্নেহকোষে সঞ্জীবিত অতীতের মহানুভব পুরাবৃত্ত। কোন প্রাচীনতম কাঠের সিন্দুক থেকে আবিষ্কৃত হয় একখানা জীর্ণ পাণ্ডুলিপির কীট-দষ্ট ধ্বংসশেষ। অথৈ নদীর এপার-ওপার বেড়-দেওয়া জালে হয়ত পাওয়া গেল একটি তোরঙ্গ ; তার ভেতর কয়েকখানি ছিন্ন বিছিন্ন ভূর্জ্জপত্রে তিরচা গাছের কষ-জ্বাল-দেওয়া মসীলেখন থেকে স্পর্শমণির সন্ধান। মায়ালোকের কয়েকটি নাম—বিজয়গুপ্ত, ষষ্ঠীবর মৈত্র, নয়ান চাঁদ, কাঞ্চনমালা, রঞ্জাবতী, মাণিকতারা, ময়ূরভট্ট—উত্তরপুরুষের দৃষ্টির ওপর দিয়ে রহস্যময় শোভাযাত্রায় স্পন্দিত হ'তে হ'তে মিলিয়ে যায়।

পাষাণপট্টের ঐ লিপি, পাণ্ডুলিপির ঐ কয়েকটী রেখা তুষার-কবরী হিমভূমির পাদপীঠ থেকে বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গবিস্তার, পশ্চিমের অবরুদ্ধ পরিসীমানা থেকে মধুকমলার দেশ আসামের শ্যামল সূচনা পর্যন্ত সপ্তকোটী দৃষ্টিতে কি অপূর্ব্ব আত্মজিজ্ঞাসার, অতীতসন্ধানের আকাশপ্রদীপ জ্বেলে দেয়, ঐ কয়েকটী অক্ষর কি বিচিত্র উন্মাদনায়, পিতৃপুরুষের পরিচয় জানার পবিত্রতম আনন্দে প্রতিটী রক্তকোষকে রোমাঞ্চিত করে রাখে।

ঐ অক্ষর, ঐ পাষাণলিপি, ঐ রেখা ইন্দ্রজালের মত কুহক বিস্তার করে সমগ্র চেতনায়, সম্মোহনের মত ঘনিয়ে আসে সমস্ত মর্ম্মগ্রন্থিতে। কি অপূর্ব্ব শক্তি, কি মনোরম মোহ, কি প্রাণময় মায়া ঐ কয়েকটী লিপির। কি তাদের পরিচয়? কি তাদের ঘোষণা? এই-ই বাঙ্‌লা ভাষা। সপ্তকোটী কণ্ঠে এরই শ্রদ্ধাপ্লুত জয়ধ্বনি, এরই প্রাণিত বন্দনা।

এই ভাষা হিমালয়কে ঊর্দ্ধলিঙ্গের অমরাবতী ক'রেছে, এই ভাষা পদ্মকে লীলাকমল ক'রেছে, নদীকে স্রোতবতী প্রেম বলে কল্পনা ক'রেছে, রক্ত মাংসের নারীকে কল্যাণাসনা লক্ষ্মী বলে আরাত্রিক সজ্জিত ক'রেছে, উর্ব্বশীদের দেবভোগ্যা ক'রেছে, মৃত অতীতকে প্রাণ দান ক'রে উত্তর সাধকদের জন্য রক্ষা ক'রেছে। যুগে যুগে ঋতম্ভরা বাঙ্‌লার হৃদয়ে প্রেরণার মশাল জ্বালিয়ে কলঙ্কময় ক্লীবতার মহাপঙ্ক থেকে তা'কে অগ্নিকমল করে ফুটিয়ে তুলেছে; অবসন্নতার হীনবীর্য মুহূর্ত্তে বিদ্যুতের চাবুক দিয়ে বার বার আঘাত হেনে জাগিয়ে দিয়েছে—সাত কোটী মানুষের একই আশার, একই আনন্দ-বেদনার হৃৎস্পন্দন এই বাঙ্‌লা ভাষা। 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি' এই বাঙ্‌লা ভাষা'—

কবির ভাষা, প্রাণসাধকের ভাষা, তাপসের ভাষা, প্রেমের ভাষা, জীবনের ভাষা এই বাঙ্‌লা ভাষা—শুধু মাত্র কতকগুলি মৃত অক্ষরের শব্দ নয়, বাঙ্‌লা ভাষা প্রতিটি বাঙালীর, প্রতিটি কণ্ঠের, প্রতিটি উচ্চারণের বেদধ্বনি;

প্রতিটি মুহূর্ত্তের ওজস্বী মন্ত্রোচ্চার।

শাল-মহুয়ার, ধানবনের ফাঁকে ফাঁকে, পদ্মা-মেঘনা-ইল্‌সা-কালাবদরের তরঙ্গক্ষিপ্ত বাঁকে বাঁকে সাতকোটি মানুষের যে জীবন পরিপ্লাবিত হয়ে রয়েছে— সেই বাঙ্‌লা দেশ কবিগানের দেশ, যাত্রাপালার দেশ, ছড়া-তর্জ্জার দেশ। একদিন এরই চন্দনমৃত্তিকায় বসে শুভ্রবসন, পবিত্রদেহ কবি সামনে ঘৃতপ্রদীপ জেলে ভূর্জ্জপত্র থেকে স্বরচিত কাব্যপাঠ করে সমবেত শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। সেই কাব্যপাঠ, সেই যাত্রা-পালা-গান-ছড়ার মায়াময় আদর্শ ছবি, দীপাধারের সেই স্নিগ্ধ আলো মানসকল্পনার নিভৃতে কিরণবর্ণা অনুভূতি নিয়ে আসে। সেই অনুভূতিকে কি আশ্চর্যভাবেই না উত্তরকালের জন্য বন্দী করে রেখেছে বাঙ্‌লা ভাষা!

ইতিহাসের কোন অবসিত মুহূর্ত্তে বিজয়দুন্দুভি বাজিয়ে এসেছিল তুর্কী-মোগল, পাঠান-ইংরাজ, বিদেশী পাশব শক্তি; বাঙলার শান্তবীথি জীবনের আকাশে অকালবৈশাখীর মর্ম্মন্তুদ পরিণতি টেনে এনেছিল। ঠিক সেই সময় কৈবর্ত্ত-ভল্লা-রাজবংশীর শপথকঠিন মুঠিতে-বদ্ধ বল্লম-তলোয়ারে, কৃপাণ-সড়কির উজ্জ্বল অগ্নিফলকে এই ভাষা প্রচণ্ড খরতেজে জ্বলে উঠেছিল, সহস্র সহস্র চোখের সুতীক্ষ্ণ প্রতিজ্ঞায় এই ভাষা আকাশের চলবিদ্যুৎ সঞ্চার করে এনেছিল। 'মোর দুগ্ধ খেয়ে বেটা রণে ভীত হ'লি, তখনি জন্মে তুই কেন না মরিলি'—

আবার নবদ্বীপের পথে পথে, শান্তিপুরের মাটিতে মাটিতে যখন নিমাইর অঙ্গের লাবিন নবনীর মত মূর্চ্ছিত হ'য়ে ঝ'রেছিল তখন এই ভাষা একটি নিভৃতে ফোটা কৃষ্ণকলির মত শান্ত, স্নেহ-প্রলেপের মত কোমল। প্রেমে-ক্ষমায় স্নিগ্ধসুন্দর। 'মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কী প্রেম দেব না।'

বাঙ্‌লা দেশ যুগে যুগে তার সুমিত শিল্পের, তার আত্মসাধনার বিজয়দূতকে শ্যাম কম্বোজে, সাগরিকা বলি-যবদ্বীপে, তুষার-দুহিতা তিব্বত-

সিকিমে পাঠিয়েছে। বাঙ্‌লার জ্ঞান-প্রজ্ঞার মশাল জ্বালিয়ে দূরের দেশের ক্লেদাক্ত অন্ধকারের নির্ম্মম যবনিকা দূর ক'রতে গিয়েছিলেন কীর্ত্তিধ্বজ দীপঙ্কর, শিল্পবাণীর বরপুত্র বীটপাল আর ধীমান। নেপালের রাজদরবার থেকে বাঙ্‌লা ভাষার আদিম গ্রন্থ-আবিষ্কার তারই ঐতিহাসিক সাক্ষ্য। 'কায়া তউবঅ, পঞ্চ বি ডাল, চঞ্চল চিএ পৈঠো কাল।'

শৈব-তন্ত্র-শব-বৈষ্ণব-নাথ, সর্ব্বসাধনার লীলাভূমি বাঙ্‌লা দেশ। সাধু-সন্ত-বাউল-চারণের বিচরণ-নিকেতন। আকাশের মত অবারিত ভাটিয়ালি, বিবাগী মনের উদাসী বাউল বাঙ্‌লার হেউলিফুলের সুবাস-মন্থর বাতাসে লীলায়িত হয়ে রয়েছে।

তাই এই ভাষা কখনো জটামণ্ডিত শবসাধক। হিন্দুর করোটিতে মুসলমানের রক্ত নিয়ে কারণ পান করে চলেছে অগ্নিনেত্র কাপালিক—সেই বীরাচারী তান্ত্রিক। ভয়াল শ্মশানে ধুনি জ্বালিয়ে তার নির্ম্মম তপস্যা।

কখনও এই ভাষা দিগ্‌বসনা চামুণ্ডা, ভুজধৃত রুধিরলিপ্ত প্রহরণে, রক্তজিহ্বায় সে মূর্ত্তি দানবদলনে ভয়ঙ্করী। কখনও গৈরিকবাস শুদ্ধাচারী তাপস; কখনও নিরলঙ্কারা যোগিনী আবার কখনও মাঙ্গল্যের আল্‌পনায়, নতুন ধানের স্বর্ণমঞ্জরিতে, স্নিগ্ধ ভূষণে কমলাসনা লক্ষ্মী; নেত্রে তার আশীর্ব্বাদ, হস্তে তার বরাভয়, মধুর হাসির স্নেহে অজস্র কল্যাণধারা।

সেই ভাষা।

সেই সাতকোটি প্রাণের স্রোতবতীকে রুদ্ধশ্বাস করার জন্য আজ রাষ্ট্রীয় কারসাজি; সাতকোটি মানসহত্যার হীনতম আয়োজন। কিন্তু এই প্রাণ-ভাগীরথী ইতিহাসের নিয়মে আবার প্লাবনছন্দে মেতে উঠেছে; আর একবার তন্ত্রসাধকের অগ্নিনেত্রের মত জ্বলে উঠেছে, আর একবার দানব দলনা চামুণ্ডার মত নির্ম্মম হ'য়ে উঠেছে।

আর ভয় নেই। আমরা এসেছি—আমরা সাতকোটি সমর্পিত-প্রাণ

মানুষ, নতুন কালের ইতিহাসের অগ্রগামী কীর্ত্তিপুরুষ; আমরা এসেছি নিশ্চিত পদসঞ্চারে, আমরা এসেছি বীর্যবান প্রতিজ্ঞায় উদ্ভাসিত হ'য়ে, আমরা এসেছি অতীতের মারীমৃত্যুর, শ্মশান-কবরের, গ্লানি-বেদনার ওপর দিয়ে; প্রাণগঙ্গার সাতকোটি ভগীরথ আমরা; হাতে আমাদের পাঞ্চজন্য, আমরা এসেছি অন্ধ তমসা অতিক্রম ক'রে আমাদের দাবীর ক্রান্তিসূর্যকে মধ্যাহ্ন-দীপ্ত ক'রে তুল্‌তে। আমরা সাতকোটি প্রতিজ্ঞা-গ্রথিত মানুষ এসেছি ॥

নতুন দিন

এক

দীর্ঘশ্বাসের মত হু হু করে মাতলা বাতাস বয়ে আসছে কালীয় নাগের রঙের মত উত্তরঙ্গ মেঘ্‌না থেকে। প্রেতলোকের একটা অতিকায় বাদুড় যেন পাখার প্রচণ্ড ঝাপ্‌টায় নিশ্চিত মৃত্যু বয়ে এনেছে। আজ মেঘ্‌না একেবারে ক্ষেপে উঠেছে; ঢেউএর ফণাগুলো উন্মত্ত হিংস্রতায় শঙ্খচূড় সাপের মত আছড়ে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে, আর চক্ররেখা পর্যন্ত তরঙ্গবিস্তারের ওপর দিয়ে সৃষ্টির আদিনতম দানবটা অন্ধ জিঘাংসায় ঘনগর্জ্জন করে চলেছে একটানা, অবারিত।

পারের ভূখণ্ডের ছোট্ট হৃৎপিণ্ডটা ভীতস্পন্দিত হয়ে উঠছে, ঘনপত্র বউন্যা আর হিজল গাছের সারিগুলোকে অবিন্যস্ত করে ভৈরবী মেঘ্‌না থেকে ক্ষ্যাপা সিন্ধুবাতাস বয়ে আসছে। চৌচালা আর দোচালাগুলো বাতাসের নাগরদোলায় দুলতে দুলতে আর্ত্তনাদ করে উঠছে বার বার। কুটোর মত নগণ্য অবজ্ঞায় উড়ে যাচ্ছে নিকারীদের ছাউনি, ধাওয়াদের টিনের চাল।

মেঘ্‌নার দিগন্ত-বিস্তার থেকে একটা সোঁতা খাল অজগরের গহন কালো পিঠের মত বিসর্পিত রেখায় এই রয়ানপুরের বুকের ওপর হাঁসুলির বেড় পড়িয়েছে। লোকে বলে রয়নাবিবির খাল। এখন রাশি রাশি মল্লিকাফুলের মত সফেন তরঙ্গ খালটার মধ্য দিয়ে ফুলে ফুলে মাতন তুলে এগিয়ে আসছে।

ক্ষিপ্ত ঝড়ের সঙ্গে সন্ধি পাতিয়ে একসময় ধারাবর্ষণ সুরু হ'ল।

আকাশের পটভূমিতে কালিঢালা নিঃসীম অন্ধকার; তারার আকাশ-প্রদীপ জ্বলেনি একটিও।

পশ্চিমের ঘরের আয়তন থেকে আজিজুল ভৌতিক গলায় ডাকল, "রমিনা ও রমিনা"—

"যাই চাচা"।

একটা কর্কশ দাঁতখিচানির অমানবিক আওয়াজ পাওয়া গেল, "যাই চাচা! হারামজাদী গাব-দেওয়া ভেসাল জলটা তুলছিস খালের পার থিকা? বিষ্টিতে ভিজা কাই হইয়া গেল। ভাত আসে কোথা থিকা? হারামজাদী"—

এ পাশের ছোট্ট দোচালাটায় বসে একটা প্রাগৈতিহাসিক জরাজীর্ণ কাঁথার বাতায়নগুলো সেলাই কোরে রুদ্ধ করছিল রমিনা। কাঁথাটা গায়ে দিয়ে শুলে পেছনের মানকচুর জঙ্গল থেকে কয়েক হালি মেঠো ইঁদুর উঠে এসে ঐ ফাঁকগুলোর তোরণপথ দিয়ে নির্ব্বিবাদে ঢুকে পড়ে।

আজিজুলের গলার পাশবিক হুঙ্কার শুনে কাঁথা আর হুঁচসুতো একপাশে সরিয়ে উঠানে এসে নামল রমিনা।

ঝম ঝম বাজনা বাজিয়ে তীরের ফলার মত বৃষ্টির রেখাগুলো ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে উঠানে আর ঢেউখেলানো অনেকদিনের পুরাতন টিনের চালে। উঠানের একপাশে একটা বাতাবী লেবুর গাছ; নিষ্ঠুর বাতাসের আঘাতে দুটো ডাল ভেঙে ছত্রখান হ'য়ে পড়ে রয়েছে। একটা প্রেতকবন্ধ যেন ঘাড় মুচড়ে রক্তপান করে গিয়েছে গাছটার।

বাতাবী লেবুগাছটার পাশ দিয়ে মধুটুকুরি আমগাছটার ঘনপত্র আচ্ছাদনের নীচ দিয়ে একটা পথ রয়নাবিবির খালের দিকে চলে গিয়েছে। দু পাশে লাটার জঙ্গল, আটকিরার ঝোপ, নাম-না-জানা বুনো ফুলের ওপর বর্ষণরাত্রির অন্ধকার পাথরের মত জমাট হ'য়ে রয়েছে।

উঠানে ঝপ্ করে নেমে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে প'ড়ল রমিনা, বুকের ভেতরটা ধক্ করে কেঁপে উঠল একবার ; স্নায়ুগুলোর মধ্যে দিয়ে থর থর করে একটা আতঙ্কের বিদ্যুৎস্পর্শ বয়ে গেল।

পূবদিকের ঐ পথটা ধরে মানুষটা একেবারে টলতে টলতে উঠানের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। বৃষ্টিমন্দ্রিত এই অন্ধতম অন্ধকারের পরিবেশে লোকটাকে জিনলোকের প্রেতদূতের মত মনে হ'ল। চীৎকারই করে উঠত রমিনা। কিন্তু ততক্ষণে লোকটা বলতে সুরু করেছে, গলার স্বরটা কি এক অপরিসীম ক্লান্তিতে জড়িয়ে জড়িয়ে আসছে ; "আমারে এট্টু আশ্রয় দিবেন, এই রাইতটার লেইগ্যা। মেঘ্‌নার কাইতানে (ঝড়ে) আমাগো নাও ডুইব্যা গেছে।"

ইতিমধ্যে আবার আজিজুল ছোট্ট ঘরটা কাঁপিয়ে, বৃষ্টির অবারিত ঝমঝমানিকে চকিত করে চেঁচিয়ে উঠল; "কানে বুঝি বাতাস গেল না হারামজাদীর ? শয়তানী যেন একেবারে বাদ্‌শাজাদী বইন্যা গেছে ! আমি কই কি ? উঠলে কিন্তু সেইদিনের মত পিঠের বাক্‌লা তুইল্যা ফেলামু।"

এবার রমিনার গলায় উগ্র বিরক্তি টগবগ করে ফুটে উঠল ; "বলদের লাখান না চিল্লাইয়া এট্টু বাইরে আস। একজন মানুষ আইছে—তাগো নাও ডুইব্যা গেছে মেঘ্‌নার কাইতানে। শিগ্‌গীর বাইর হও চাচা।"

শ্রাবণ রাত্রির বৃষ্টিতে ইতিমধ্যে স্নানপর্ব্ব সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে রমিনার।

এতক্ষণ ছোট্ট দোচালাটায় মাছের চাঙাড়ির তখত্-এ-তাউসে আসীন থেকে একখানা ধর্ম্মজাল বুনতে বুনতে সম্রাট আলমগীরের মত হুঙ্কার ছাড়ছিল আজিজুল ; এবার একেবারে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সে। বনবিড়ালের মত কুৎসিত মুখটা থেকে আর একঝলক মধুবর্ষণ হ'ল, "শয়তানের ছাও আমারে কয় কিনা বলদ ! মেঘ্‌নায় নাও ডুবছে তো আমার কি হইচে ? অতই যদি মব্বৎ তো তোর ঘরে নিয়া শোয়া।"

উঠানের অন্ধকার থেকে অস্পষ্ট মানুষটা বলল কাঁপা-কাঁপা গলায় ; "না, না আমার জন্য আপনেরা কাজিয়া বিবাদ কইরেন না। আমি অন্যখানে যাইতে আছি গিয়া।"

বিশৃঙ্খল পদসঞ্চারে পেছন ফিরতেই মধুটুকুরি আমগাছটার কাছে গিয়ে টলে পড়ে গেল মানুষটি। চম্‌কে আর্ত্ত গলায় চীৎকার করে উঠল রমিনা; "তুমি চাচা মানুষ না আর কি। মানুষটা তোমার ঘরের দুয়ারে পইড়্যা রইল। শ্যাষে ভাল মন্দ একটা কিছু হইয়া গেলে চৌকিদারে তো তোমার হাতেই আইস্যা দড়ি বান্‌বো (বাঁধবে)।"

চৌকিদারের নামে এইবার চকিত হয়ে উঠল আজিজুল, শরীরের সমস্ত খিলানগুলোতে একটা ক্ষ্যাপা কাঁপুনির আবেগ সঞ্চারিত হয়ে গেল এক-মুহূর্ত্তে। 'থানা' কথাটাও পরিষ্কার জানে আজিজুল। থানা আর চৌকিদার এই দু'টি নামের সঙ্গে কল্পনা রাজ্যের বেহেস্তের কোন সবিশেষ সম্পর্ক যে নেই, আর দারোগা সাহেবের ব্যাটনটা যে বড় বেশী মেহেরবান নয় এটুকু পার্থিব জ্ঞান্ অন্তত তার আছে। অতএব আর একটি মুহূর্ত্তও নয়, একরকম লাফিয়েই উঠানে নেমে পড়ল সে। তারপর শ্রাবণের ধারাবর্ষণে ভিজতে ভিজতে রমিনার সঙ্গে ধারাধরি করে মানুষটির দেহটা দোচালা ঘরের ভেতর নিয়ে এলো। আজিজুলের শরীর থেকে কাঁপুনির তরঙ্গটা তখনও অন্তর্হিত হয় নি ; দোলন-লাগা গলায় সে বলল, "তুই ঐ কিনারে কাথা দিয়া একটা বিছনা পাইত্যা দে রমিনা, আমি ওরে কাপড় ছাড়াইয়া, মুছাইয়া দি। ওর বোধ হয় জ্ঞান নাই এখন।"

চারপাশে স্তূপাকার মাছের চাঙাড়ি, চূড়াগুলো গিয়ে ঘরের আড়ায় ঠেকেছে, মাঝখানে আজিজুলের সেই স্পর্দ্ধিত রাজাসন আর অসমাপ্ত ধর্ম্মজালটা নিষ্করুণ অবহেলায় পড়ে রয়েছে। মাছের চাঙাড়ি থেকে একটা উগ্র আঁশটে গন্ধ উন্মত্ত হ'য়ে ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

আধনিভন্ত কেরাসিনের কুপীটায় আর একটু তেলের প্রাণসঞ্চার করে একপাশে নিপুণহাতে একটা পরিপাটী বিছানা পেতে দিল রমিনা; আজিজুল লোকটির চেতনাহীন দেহটায় একটা শুকনো কাপড় জড়িয়ে শুইয়ে দিতে দিতে বলল ; "ইস্ সাই জ্বর আইছে। গা যেন আগুন, ধান দিলে খৈ ফুটতে লাগব একেবারে। তুই এট্টু ওর কাছে বস রমিনা, আমি আইতে আছি।"

শঙ্কিত ভঙ্গিতে বাইরের কালিঢালা অন্ধকারের অতলান্তে নেমে গেল আজিজুল ; আর ভিজে হাতটা মুছে মানুষটার কপালে চন্দনপ্রলেপের মত বিছিয়ে দিল রমিনা। বৃষ্টির নহবতে একটানা বাজনা বেজে চলল —ঝম্ ঝম্—ঝম্ ঝম্—বাদুড়ের বিশালকায় ডানার মত আকাশটা চিরে থর-থড়োর মত বিদ্যুৎ সরীসৃপ তির্যকতায় শিউরে গেল ; ঘরের ভেতর একটা অগ্নিচম্পার মত কুপীর শিখাটা থর থর করে উঠল ; দেওয়ালে দেওয়ালে তাদের চঞ্চল ছায়া নেচে বেড়াতে লাগল।

খানিকটা পর একটা আগুনের মালসা নিয়ে এ ঘরে এলো আজিজুল। এর মধ্যে শাড়ীটা বদলে নিয়েছে রমিনা।

আজিজুল বলল ; "এই আগুনের তাওয়াটা রাখ, আর মানুষটারে একটু দেখিস। আমার শরীর একেবারে ভাইঙ্গা আসতে আছে—সারাটা দিন 'ভেসাল' থিকা আইস্যা খালি বৃষ্টিতে ভিজলাম—জ্বর জ্বর লাগতে আছে। কাইল দুফারে কিন্তুক তোর চাচী আবার আসব হাসাড়া থিকা। মনে আছে তো।"

নির্ব্বাপিত গলায় রমিনা বলল ; "হ হ, তুমি এখন বড় ঘরে গিয়া শোও। আর বৃষ্টিতে ভিজো না চাচা—অসুখ বিসুখ হইলে আর উপায় থাকব না। চাচী যে আসব, সে আমি জানি ; তার আসনের আগেই পাক কইর‍্যা রাখমু।"

ফিস ফিস করে অস্পষ্ট-পাণ্ডুর গলায় বলল আজিজুল ; "চৌকিদার আবার কিছু করব না তো! আমার বড় ডর করে। তোরে আমি কত ভালবাসি জানস তো রমিনা!"

"না না চৌকিদার আসবো ক্যান ? তুমি আমারে পরাণের মণির থিকা বেশী ভালবাস, সেই কি আমি আর জানি না ?"

কেমন একটা বিষণ্ণ হাসির আভাস চিহ্নিত হতে হতেই মিলিয়ে গেল রমিনার মুখের ওপর থেকে, আর অবিশ্বাসী দৃষ্টিটা একবার দুলিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো আজিজুল।

একসময় মদালসা বৃষ্টির কঙ্কন ঝঙ্কার থেমে গেল। লাটার জঙ্গলে একটানা ঝিঁঝিঁদের ঐকতান স্থুরু হয়েছে, পেছনের বর্ষাসমৃদ্ধ মানকচুর ঝোপটার মধ্য থেকে ব্যাঙেদের সংসারের সমবেত কণ্ঠে শ্রাবণের অকৃত্রিম জলসার সংবাদ বয়ে আন্‌ছে। পেছনের খাল থেকে ঝপ্‌ ঝপ্‌ নৌকা বাওয়ার শব্দ ভেসে আসে। দূরের কাহার পাড়া থেকে একটা মিষ্টি গলা বাতাসের পাখ্‌নায় চেপে এই ছোট্ট চৌচালা ঘরের আয়তনে এসে ছড়িয়ে পড়ছে। কে যেন ললিত ঝঙ্কারে সুর করে বিষহরির ছড়া পড়ছে—

জন্মে জন্মে কত আমি ভগ্নব্রত করি,
তাহাতে কুপিতা কিবা দেবী বিষহরি
না জানি দেবীর ঠাঁই হইল কোন পাপে,
রজনীতে মোর নাথে বিনাশিল সাপে—

বাইরের কালি-লেপা রাত্রির ওপর আরো কয়েক আস্তর অন্ধকারের স্রোত গড়িয়ে যাচ্ছে। ঝম ঝম করছে নিথর ত্রিযামা।

রমিনা মানুষটার কপালে জলপটীটা চাপিয়ে কুপীটা সামনে নিয়ে এলো। কুপীর কনকচাঁপা রঙের আলোটা তার মুখের ওপর বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে, লালাভ শিখাটা থর থর করে কাঁপছে ঘনপক্ষ্ম চোখের

পল্লবে। আর সঙ্গে সঙ্গেই তার আঠারো বছরের নিভৃত যৌবনটা দেহের প্রতিটি মধুমান স্নেহকোষে সারেঙ্গীর সুরের মত ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। তবে কি, তবে কি—

একসময় মানুষটার কপালে মুক্তার মত বিন্দু বিন্দু ঘামের আভাষ ফুটে বেরুল। শরীরের উগ্র উত্তাপ শীতল প্রসন্নতায় নির্ব্বাপিত হয়ে আসতে সুরু করেছে।

আরো অনেকটা ঘনীভূত সময় কেটে গেল। বিহ্বল অবসন্নতায় কুপীটা হাতের মুঠোয় ধরে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল রমিনা। আর চোখের মেঘনার মত কজ্জলিত আয়নায় জ্বরতপ্ত মানুষটির মুখ স্থিরবিম্বিত হয়ে রয়েছে।

মাছের চাঙাড়ি থেকে উগ্র আঁশটে গন্ধ, দূর থেকে বাতাসের ডানায় বয়ে-আসা বিষহরীর ললিত পদমূর্চ্ছনা, বৃষ্টির রাত্রির গন্ধ, ভিজে মাটীর আচ্ছন্ন গন্ধ, বুনোফুলের বৃষ্টিধৌত গন্ধ, অগ্নি-চম্পার মত কুপীর শিখা, মানুষটির অবসাদ-শিথিল আঁখিরেখা—সব মিলিয়ে একমুহূর্ত্তে রমিনার সমস্ত আঠারো বছরের ঘুমন্ত ইন্দ্রিয়গুলো ইঙ্গিতময় মুখরতায় সমাকুল হয়ে উঠল; শতদলের মত প্রথম সুরভিত হওয়ার কম্পিত আবেগে বিস্মিত হয়ে রইল।

আর এমনি একটা সুবাসিত মুহূর্ত্তে রক্তকমলের মত লাল দুটো জ্বরদগ্ধ চোখ মেলে তাকালো মানুষটি; মৃদু আর্তনাদের গলায় সে বলল; "এট্টু জল খামু।"

চকিত হ'য়ে মানুষটির মুখের ওপর থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে উঠে পড়ল রমিনা। তারপর মাটির কলসী থেকে জল নিয়ে আবার সামনে এসে দাঁড়ালো; "এই যে জল আনছি।"

কাঁথা কাপড়ের স্তূপাকৃতি পর্ব্বত সরিয়ে উঠে বসল মানুষটি। শঙ্কিত গলায় রমিনা বলে উঠল, "এই কি আপনে উঠলেন যে, এট্টু আগে বেহুস হইয়া আছিলেন জ্বরের ঘোরে! শিগ্গীর শুইয়্যা পড়েন।"

একটু পাণ্ডুর হাসির রেখা কেঁপে গেল মানুষটির ঠোঁটের ওপর দিয়ে, "জ্বর তো এখন আর নাই-ই। উইঠ্যা বসলে আর ক্ষেতি কি ?"

রমিনার হাত থেকে জলের গ্লাসটা নিজের মুঠোতে টেনে নিল মানুষটি।

আবিষ্ট গলায়, কেমন একটা ঘোর ঘোর লাগা চোখ তুলে রমিনা বলল ; "আপনেরে আমি দেখছি বৈশাখ মাসে ; নিধি বারুইর বাড়ীত্ পালা গাইতে আইছিলেন না আপনে ?"

জ্বরদগ্ধ স্নায়ুগুলোর মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা জল শীতল প্রসন্নতার মত সঞ্চারিত হয়ে গেল।

মানুষটি বলল; "ঠিকই ধরছেন, আমি ঢপের দলের কৃষ্ণ; দল ভাইঙ্গা গেছে দাঙ্গার সময়। তারপর থিকা একা একা গান গাইয়া বেড়াই এইখানে সেইখানে। আইজ গেরামে ফিরতে আছিলাম। মেঘ্নার কাইতানে 'গয়নার নাও' ডুবি হইছে। কে কোনখানে যে ভাইস্যা গেছে কে জানে। আমার নাম আজম—মাইন্ষে কয় আজম কবিদার। আপনে আমারে বাচাইলেন এইবার।"

রমিনার চোখ দুটি কি আশ্চর্য নীল ; কে যেন ঐ দু'টি চোখের পেছনে প্রথম সন্ধ্যায়-ফোটা দূর আকাশের দু'টি ঘননীলিম তারার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেই অনেকদূরের গভীর দৃষ্টি শান্ত স্নিগ্ধতায় আজমের মুখের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে মন্থর গলায় রমিনা বলল ; "আপনের মা বইন্ থাকলে এই রকমই করত। আমি আর বেশী কি এমুন করছি?"

বালির কণার মত কয়েক বিন্দু অশ্রু আজমের চোখের কোলে এই রক্তচম্পা কুপীর শিখাতে চিকমিক করে উঠল ; "বাজান আমার আছে, কিন্তুক আম্মা নাই। যত্ন করণের কেউ নাই। সেই দশবছর বয়সে ঢপের দলে পলাইয়া গেছিলাম।"

অনেকটা সময়ের বিরতিচিহ্ন; মাছের চাঙাড়ির উগ্র গন্ধ, ভিজে মাটির

সমাকুল গন্ধ, বর্ষার গন্ধ, পেছনের জঙ্গল থেকে উঠে আসা ভাঁট ফুলের সজীব গন্ধ দুজনের মাঝখানে একটা সংকেতময় নীরবতায় স্থির হয়ে রইল।

আচমকা রাধিকা চক্রবর্ত্তীর ছেড়ে-যাওয়া বাড়ীটা থেকে এক ঝাঁক শিয়াল তারস্বরে প্রহর ঘোষণা করে চলল।

এক জোড়া নীলিম তারার প্রদীপজ্বালা চোখ আর দুটো জ্বরলাল চোখের মণিতে নিষ্পলক হয়ে ছিল। চোখের ওপর ঘন পল্লবের আবরণ নামিয়ে রমিনা বলল; "আপনে এইবার শুইয়্যা পড়েন, রাইত অনেক হইয়া গেছে। আর একটা কথা—"

"কি কথা ?"

আজমের সমস্ত মুখের বিবর্ণ পটভূমিতে কোমল উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠল।

মৃদু গলায় রমিনা বলল; যেন একরাশ পেঁজা তুলো শ্রাবণের উল্লসিত বাতাসে কোথায় কোনদিকে ভেসে গেল; "আমারও কেউ নাই এই সংসারে—এই দূর সম্পর্কের চাচার কাছে আছি।"

একসময় বাইরের অতলগর্ভ অন্ধকারে বেরিয়ে গেল রমিনা।

সীসের পাতের মত শ্রাবণী সকাল স্তব্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে পূবালি দিকচক্রে—সূর্যের রক্তাভাস কোথাও একটু ছড়িয়ে নেই। কাল রাত্রিতে মেঘনাপারের এই ছোট্ট পৃথিবীটার ওপর দিয়ে একটা অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক মৃত্যুদানব প্রলয়পর্ব্ব শেষ করে গিয়েছে। বনঝোপ, হিজল অর্জ্জুনের সারিকে দলিত করে জিনলোকের সেই কবন্ধটা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়েছে আজ এই ঝিম ঝিম করে বেজে চলা ভারমন্থর সকালে।

কিশোরীর অকলঙ্ক প্রেমের মত বিছানার নিবিড় মধুর উত্তাপটুকু নিরুপায় আক্রোশে ছুঁড়ে ফেলে চেঁচামেচি করে উঠল আজিজুল; "রমিনা, রমিনা—আমি 'ভোসাল' বাইতে যাই। ঐ ছ্যামরার (ছেলেটার) জ্বর

কমলে খেদাইয়া দিস ; ঐ সব গাজী সাহেবের নাতিন জামাইএর লাখান (মত) এইখানে থাকলে চলব না। তোর চাচী আইব দুফারে। মনে থাকে যেন।"

বাতাবী লেবু গাছটার শাখা প্রশাখা ভেঙে-চুরে ছত্রখান হ'য়ে পড়েছিল উঠানে ; সেগুলো একপাশে স্তূপাকার করতে করতে মাধবীলতার মত দেহটা তুলে দাঁড়াল রমিনা ; "আইজ তুমি 'ভেসাল' বাইতে যাইও না চাচা। চাচী আইবো—"

বুনো খাটাসের মত মুখটার ওপর একটা বিকৃত ভঙ্গিমার সঞ্চার করে আজিজুল বলল ; "'ভেসাল' বাইয়া মাছ মাইর‍্যা হাটে না গেলে গুষ্ঠীশুদ্ধ খাইয়া আমার ত্যাল (তেল) মজাইব্যা ক্যামনে ?"

কাঁঠাল কাঠের বৈঠাটা হাতে তুলে রয়নাবিবির খালের দিকে সদর্প পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলল আজিজুল ; একটা ভয়ঙ্কর সমর যাত্রার স্থিরসিদ্ধান্ত সেনাপতির মত। হাতে সঘন গর্জ্জিত রাইফেলের বদলে কেবল অহিংস কাঁঠাল কাঠের বৈঠাটাই যা ধরা রয়েছে।

সীসার পাতের কপাটটা খুলে সূর্যের শ্রান্ত কুণ্ঠিত আলো এসে পড়েছে মেঘনাপারের মেঘচন্দন মাটিতে। রোদে আগুনের খরদীপ্তি নেই, তার বদলে এসেছে কোমল স্নেহের কমনীয়তা আকাশে এখনও খণ্ড ছিন্ন মেঘের পাণ্ডুলিপি ভেসে বেড়াচ্ছে। তার ওপর রোদের আলো চুনীপান্নার মত ঝিক মিক করছে।

আজমের সমস্ত শরীর থেকে কাল রাত্রির জ্বরের দাবদাহ মুছে গিয়েছে। কাঁথা কাপড় জড়িয়ে মাছের ঘরের দাওয়ায় জবুথবু হয়ে বসেছিল আজম। এ পাশে মাটির স্বপ্নকামনার মূর্ত্তি ধ'রে ফুটে উঠেছে রাটিলা ফুলের রাঙাগুচ্ছ, আগুনের শিখার মত পাপড়ির রূপ মেলে ধরেছে ইন্দ্রধনুরঙা একটা প্রজাপতির দিকে' আর রাটিলা ফুলের পত্রগুচ্ছের নীচেই একটা জলদাঁড়াস সাপ

লিকলিকে জিভ আন্দোলিত করতে করতে ক্রুর আনন্দে তাকিয়ে রয়েছে এক মুদ্রিতচক্ষু কোলা ব্যাঙের দিকে, কিন্তু যোগমগ্ন ব্যাঙের সেদিকে খেয়াল নেই।

দাওয়া থেকে একটুক্রো বাঁশ তুলে সাপটার দিকে ছুঁড়ে মারল আজম। যোগীবর একলাফে একটা গর্ত্তের গর্ভাশ্রয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর সাপটা বিদ্যুতের মত সাঁ করে ওপাশের লাটা ঝোপের ভেতর মিলিয়ে গেল। তারপর আজমের দৃষ্টিটা রয়নাবিবির খালের দ্রুতচঞ্চল ঢেউগুলোর ওপর দিয়ে নেচে চলল অনেক দুরের দিগন্ত রেখায়।

সূর্যজ্বলা দিনের আলোতেও সেই ঘননীলিম সন্ধ্যা তারা। জ্বরের ঘোরে কাল রাতটা তবে অবাস্তব স্বপ্নই নয়। পাকের ঘর থেকে রমিনা ভাতের মাড়ে কাগজীলেবু আর নুন জারিয়ে এনেছে। ঘরে এক কণা সাগু বার্লির অস্তিত্ব নেই, তাই এই দুর্বিপাক। মাড়ের সানকটা তার সামনে কুণ্ঠিত হাতে এগিয়ে দিয়ে, হীরকশুভ্র দাঁতের হাসি বিচ্ছুরণ করে অভ্যর্থনা জানালো রমিনা ; "এইটুক খাইয়া নেন।"

রয়নাবিবির খালের ওপর সেই অর্থহীন উদাস দৃষ্টিতে এবার একটা তীক্ষ্ণতম আতঙ্ক কেঁপে গেল ; "আমি বার্লি খামু না—বমি আসে। আমি এখন যামু গুদারা (খেয়া) ধরতে।"

গলাটা কেমন যেন চমকিত হয়ে উঠল রমিনার ; কি একটা অর্থময় বেদনায় হীরকশুভ্র দাঁত গুলো থেকে হাসির আলো নিভে গেল ; "কাইল বেহুস হইয়া আছিলেন জ্বরে, আর এখনই যাইতে চান।"

"দুফারে যে আপনের চাচী আসব।"

চমকটা এবার আরো বিস্তৃত হ'ল ; "আপনে জানলেন কি কইর‍্যা আমার চাচীরে ? কেমনে জানলেন শয়তানীরে ?"

ঘননীলিম সন্ধ্যাতারার ওপর কোথায় যেন বরফ গলে গেল ; "আমারে বড় মারে। দুইবেলা ঠিকমত খাইতে দেয় না। আপনে কেমনে জানলেন তারে?"

"জানলাম—আমি যে কবিদার। কিন্তুক্ চাচী মারে তোমারে।"

আজমের স্বর পিষ্ট যন্ত্রণায় কেঁপে গেল একবার।

"যাউক ঐ কথা শুইন্যা আর কাম কী? বরাতে আমার যা আছে তাতো আর ডইল্যা তুইল্যা ফেলান যাইবো না। আপনে তো চইল্যাই যাইবেন এখন, এক রাইতের অতিথ আপনে; আপনার মনেও থাকব না আমার মত কালমুখীর কথা। কাইলই ভুইল্যা যাইবেন।"

বুকের ভেতরটা বিদীর্ণ করে দীর্ঘশ্বাসের নিষ্করুণ ছদ্মবেশে আঠারো বছরের সঞ্চিত কান্না হু হু করে বেরিয়ে এলো রমিনার।

"আমি যদি থাকি অনেকদিন!"

"না, না; আপনে যান গিয়া। আপনে চাচীরে চিনেন না। দাতে আর জিভে বড় ধার তার। তার লগে দেখা না হওনই ভালো।"

রমিনার গলায় তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল।

"বেশ আমি এখনই যামু।"

রমিনার নিটোল হাতের সেই মাড়ের সানকটা নিয়ে একটা চুমুক দিল আজম। খানিকটা স্বাস্থ্যের সঞ্জীবনী সমস্ত রক্তকোষ গুলির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেল তার।

রোদের দীপ্তি একটু একটু করে উজ্জ্বলন্ত হয়ে উঠতে সুরু করেছে। বৃষ্টি-ধোয়া বাতাবী গাছের নিষ্কলুষ সবুজ পাতায় সূর্যটা প্রসন্ন রোদের প্রেম ছড়াচ্ছে।

এক সময় লাটা ঝোপের পাশ দিয়ে, সেই চন্দনমাটির পথ ধরে রয়না বিবির খালের খেয়াঘাটের দিকে চলে গেল আজম; মধুটুকুরি আম গাছটা পেরিয়ে এসে একবার ফিরে তাকাতেই চোখে পড়ল; একজোড়া ঘননীলিম সন্ধ্যাতারা বাতাবী লেবুগাছের ধ্বংসশেষ পটভূমিতে নির্ণিমেষ হয়ে রয়েছে, হীরকশুভ্র দাঁতগুলো থেকে সকালের সেই ঝর্ণাধারার মত হাসির কলছন্দিত ঝঙ্কার থেমে কেমন একটা ক্লান্ত অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে।

দুই

মেঘ্‌নার খরধারায় আবার 'গয়নার নাও'।

বিগত রাত্রিতে দানা-পাওয়া নদীটা খড়্গধার বিদ্যুতের চকিত দীপ্তিতে একটা অতিকায় সোনালী অজগরের মত পাক খাচ্ছিল, আজ বেলাশেষের প্রশান্ত কোমলতায় একটা মসৃণ কালো কাচের পাতের মত পরম বিশ্রান্তির অতলতায় হারিয়ে গিয়েছে। বৃষ্টির ঘোড়সওয়ারগুলো সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিকচক্রের পরপারে অদৃশ্য হয়েছে, বজ্রগর্ভ আকাশের গর্জ্জন থেমে গিয়েছে। তালবীথি-চিহ্নিত দিগন্তের ওপর দিয়ে বকের পাখার প্রতিধ্বনিত বিধুনন ক্ষীণ হ'তে হ'তে মিলিয়ে যেতে সুরু করেছে।

অবারিত মেঘ্‌নার হু হু বাতাসের আকুলতায়, বকের ছায়া-অাঁকা কালো কাচের মত জলের পটভূমিতে আচম্‌কা কাল রাত্রিটা প্রতিটি রক্তকোষে কেমন যেন রিমঝিম করে উঠল। কড়া নেশার পর আধ-সজাগ স্তিমিত স্বপ্নের মত দুটো ঘননীলিম সন্ধ্যাতারার মত চোখ ভারী মায়াময় আর ভারী অবাস্তব বলে মনে হ'ল আজমের। কাল রাত্রিটা তার জীবনে একটা মস্ত বড় ব্যতিক্রম।

একবার ঢপের দলের তেড়েল রাধিকা এক হাঁড়ি গাঁজলা তাড়ি দিয়ে তার মানভঞ্জন করিয়েছিল। কয়েক চুমুক দেবার পরই বৈশাখের সেই খরজ্বলন্ত রোদের মধ্যেও প্রাকৃতিক নিয়মেই ফেনিল স্বপ্নের বিভ্রান্তিতে অবলীন হয়ে গিয়েছিল আজম। আর তখন সামনের কচুরি-পচা খালটাকে মনে হয়েছিল পদ্মসায়র, অগ্নিবর্ষি সূর্যটাকে কোন মেঘ-মতী রাজকন্যার কপালে চন্দ্রলেখা বলে ভ্রম হয়েছিল, কিছুদূরের বাজ-দগ্ধ তালগাছটাই বোধ হয় সেই মেঘকন্যা। একটু পরেই নেশার ঘোর কেটে গিয়েছিল, ভ্রান্তিমগ্ন স্বপ্নমায়া শরতের লঘুপক্ষ মেঘের মত ভেসে গেল

কোনদিকে, আর সেই জাগ্রৎ চেতনায় বৈশাখী রোদের রেখাগুলো পিঠের ওপর নির্ম্মম চাবুকের মত কেটে কেটে বসেছিল, কাণের ভেতর আর শূণ্যগর্ভ মগজে ঝাঁ ঝাঁ করে তারই ব্যঙ্গভরা প্রতিধ্বনি। বাজদগ্ধ তালগাছটা কুৎসিতভাবে ভেঙ্‌চাচ্ছিল। ইন্দ্রিয়গুলো আরো একটু সতর্ক হতেই নিজেকে সেই স্বপ্নে-আঁকা পদ্মবিল বলে ভ্রম-করা কচুরি-পচা খালটায় আবিষ্কার করেছিল আজম। অদূরে দাঁড়িয়ে গেঁজেল কংস করাত-চেরা হাসি হাসছিল। তাকে এই খালে টেনে নিয়ে-আসা তবে সেই পুরুষোত্তমেরই লীলা। সেই থেকে মনে মনে মাপা সাত হাত নাক খত খেয়েছে আজম। জীবনে আর ঐ পরম বস্তু স্পর্শই করবে না সে। তাড়ির নেশা বড় কদর্য নেশা, বড় সর্ব্বনাশা।

কিন্তু কাল রাত্রে 'গয়নার নাও' ডুবি হবার পর সেই জ্বরের উগ্র নেশালাগা চেতনায় এ কোন ঘননিলীম সন্ধ্যাতারার স্বপ্ন দেখল আজম। তাড়ির নেশার মেঘমতী কন্যাকুমারীর কল্পনা ভঙ্গুর কাচের বাসনের মত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু নীলিমা-সঞ্চারিত তারা দুটো কেন এখনও মৃদুসুরভিত হয়ে স্নায়ুগুলোকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে!

সূর্যপতনের রক্তাভায় আর এক ঝাঁক বালিহাঁস সোনালী পতঙ্গের মত উড়ে গেল; দৃষ্টিটা আবীর-লাগা মেঘ্‌নার ওপর দিয়ে তর তর করে এগিয়ে রক্তছড়ানো সূর্যের মধ্যে কেন্দ্রিত হ'ল আজমের। পশ্চিম আকাশের হৃৎপিণ্ডে কে যেন অতিকায় একটা ছোরার আমূল অজগর ফলা বসিয়ে দিয়েছে। রক্তজবার মালার মত দেখাচ্ছে ঝলক লাগা ক্রান্তিরেখা। স্মরণের নেপথ্যলোকে একটা রাত্রি"আচম্‌কা চমকে উঠল আজমের। নোয়াখালির এক বারুই বাড়ীর পালাগানের কলমন্দ্রিত আসরে, চারদিকের ঘনায়মান কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর নীরন্ধ্র অন্ধকারে, প্যাট্রোম্যাক্সের উজ্জ্বল আলোতে

অধিকারী নন্দ ভূঁইমালীর ফুসফুস-ফাটা তাজা রক্তটাই কি কেউ পশ্চিমের আকাশে চাপ চাপ ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে এই মুহূর্ত্তে। একটা ইন্দ্রধনুরঙা চন্দ্রবোড়া সাপের মতই সে রাত্রিটা স্নায়ুগুলোর মধ্যে শির শির করে মৃত্যুর তুহিনস্পর্শ দিয়ে যাচ্ছে।

আসরটা সবে মাত্র জমে উঠেছিল। চারপাশে বিস্মিত মানুষগুলোর মন্ত্রমুগ্ধ চোখের মণিতে মায়ালোকের চন্দ্রাবলী মূর্ত্তি ধরে এসে গাইতে সুরু করেছে—

'এই পথে নিতি কর গতাগতি,
নূপুরের ধ্বনি শুনি হে বন্ধু শুনি—'

ঢপের দলের অধিকারী নন্দ ভূঁইমালী। সুন্দর, অমৃতকণ্ঠ। চন্দ্রাবলীর ভূমিকায় আশ্চর্য মোহিনী দেখাত তাকে। নন্দ ভূঁইমালীর গলাটা একটা অপূর্ব্ব ছন্দের ঝঙ্কারে যখন কয়েক শ' জোড়া দৃষ্টিতে মোহন মাদকতার স্পর্শ ছড়িয়ে দিচ্ছে, ঠিক তখনই অনেকগুলো প্রেতকণ্ঠ ভৈরব গর্জ্জন ক'রে উঠেছিল; "আল্লা-হো আকবর—"

কবর ফুঁড়ে যেন কতকগুলো অশরীরী প্রেতাত্মা সেই মাত্র দেহ ধারণ করে হত্যার ফরমান নিয়ে উঠে এসেছে। প্যাট্রোম্যাক্সের উজ্জ্বলন্ত আলোতে তাদের বন্য বিশৃঙ্খল চুলের পটভূমিতে, পিঙ্গল চোখগুলোতে নিশ্চিত জিঘাংসা ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল; সড়কির ফলাগুলোতে অজগরের শিকার-ধরা দৃষ্টি জ্বলছিল ধক ধক করে।

"আল্লা-হো-আকবর—"

সমবেত মানুষগুলোর সম্মোহিত বৃত্তে ভীত ব্যস্ততা ঝড়ো সমুদ্রের মত ভেঙে পড়েছিল এক মুহূর্ত্তে। কেয়াঝোপের পাশ দিয়ে রুদ্ধশ্বাস দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল মানুষগুলো।

"নূপুরের ধ্বনি শুনি হে বন্ধু শুনি—ই-ই-ই—" নন্দ ভূঁইমালীর

মধুবর্ষি গলার স্বরটা বিকৃতিতে প্রলম্বিত হয়ে আকাশফাটানো আর্তনাদের মত পৈশাচিক শুনিয়েছিল। ততক্ষণে সড়কির আধ হাত লম্বা ফলাটা তার ফানুসের মত ফুসফুসটায় পুরোপুরি ঢুকে গিয়েছে। একটা করকরে প্রেতস্বর শোনা গিয়েছিল; "সুমুন্দির পুত কাফেরের গান গাও—"

"আল্লা-হো-আকবর—"

দীন-ছুনিয়ার অধীশ্বরের অকলঙ্ক নামে একরাশ কালি ছিটিয়ে আবার হত্যার জিগির উঠেছিল।

পেছনের সাজ-ঘর থেকে শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেশেই কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর ক্রূর-পিঙ্গল অন্ধকারে খেয়াঘাটের দিকে পালিয়ে এসেছিল আজম। মৃদঙ্গের বোলের মত হাঁটু ছুটো অশ্রান্তভাবে ঠক ঠক করে বেজে চলেছিল।

'গয়নার নাও'টা একটা অতিকায় বনহংসীর মত চঞ্চল ছন্দে এগিয়ে চলেছে।

আর একবার পশ্চিমাকাশের দিকে তাকালো আজম; নন্দ ভূঁইমালীর ফুসফুসফাটানো রক্তে দীপিত পটভূমিতে নীলিম অপরাজিতার মত কাল রাত্রির সেই ছু'টি সন্ধ্যাতারা কি আশ্চর্য্যভাবে ফুটে উঠেছে।

ঢপের দল সেই কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর শোণিত-মগ্ন রাত্রিতেই ভেঙে গিয়েছিল। নন্দেরই নয় শুধু, সমস্ত দলটার ফুসফুস বিদীর্ণ করে সেই আধ হাত লম্বা সড়কির ফলাটা পুরোপুরি বসেছিল। তারপর এই ক'টা বছর চৈত্রের ঘূর্ণিবৃত্তে ঝরাপাতার মত আবর্ত্তিত হ'তে হ'তে এলোমেলো ছন্দোপতনের মত ঘুরে বেড়িয়েছে আজম।

দশ বছর বয়সে সৎ-মার সানকির আঘাতের সোহাগে কপাল-ফাটানো জয়টীকা নিয়ে ঢপের দলে পালিয়ে গিয়েছিল। এখন সুবাসিত যৌবনের বাসন্তীরাঙা মুহূর্ত্তগুলোর সে বাদ্‌শাজাদা; বাইশবছরের স্পর্দ্ধিত সম্রাট। তবু এই বারোটা বছর ধরে ঢপের দলের নোঙরহীন নৌকায়

যাযাবরের মত ভাসতে ভাসতে কোন বন্দরের সংবাদ তার কাছে আসেনি, কোন বনস্পতির নিভৃত ছায়ায় সুখনীড়ের কোন চকিত আবেদন সে শোনে নি। কিন্তু কাল 'গয়নার নাও' ডুবির পর জ্বরমগ্ন স্নায়ুগুলোর ওপর সেই নীল সন্ধ্যাতারা কি এক আকুলতায় ভেঙে পড়েছিল; বাইশ বছরের সমস্ত চেতনাকে ভাসিয়ে দিয়ে হীরকশুভ্র দাঁত থেকে জ্যোতির্ম্ময় হাসির কি এক সমুদ্রস্রোত এসেছিল! সে কি অলীক? জ্বরের ঘোরে অমূল একটা আকাশী কল্পনা?

এর মধ্যে কোন অবসরে নন্দ ভূঁইমালীর ফুসফুস-ফাটা রক্তে রাঙানো সূর্যটা মেঘনার কজ্জলিত আয়নার অতলতায় ডুবে গিয়েছে। একটা সূক্ষ্ম মস্‌লিনের মত অন্ধকারের পর্দা ফর ফর করে উড়ে চলেছে বাতাসে। চন্দ্রমল্লিকার মত আকাশের বাসর-জাগা তারা ফুটতে সুরু করেছে একটা একটা করে। কাল রাত্রিতে নিশিতে পাওয়া মেঘনার ওপর থেকে ঘন মেঘের কৃষ্ণ যবনিকা আজ কার মায়ামন্ত্রে যেন মিলিয়ে গিয়েছে। মৃদু মৃদু ঢেউএ তারার জ্যোতির্ম্ময় বিন্দুগুলো দোল খেয়ে চলেছে দূরে, আরো দূরে।

ভাবনাটা বার বার বিকেন্দ্রিত হয়ে যাচ্ছে আজমের। কোন একটা সিদ্ধান্তের মধ্যবিন্দুতে স্থির হওয়ার আগেই দোলা লেগে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে মনটা; বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে স্নায়ুগুলো।

একসময় সোনারঙের ঘাটে 'গয়নার নাও'টা ভিড়ল। আকাশের চন্দ্রমল্লিকাগুলো মালার মত গ্রন্থিত হয়ে রয়েছে।

চারবছর পর সোনারঙের মাটির স্পর্শ লাগল আজমের পদসঞ্চারে; সর্ব্বাঙ্গে মেঘ্‌নাসোহাগী বাতাস অতসী ফুলের মত ঝরে পড়ল প্রসন্ন অভ্যর্থনায়।

ইল্‌সা মাঝিদের ঘাট থেকে উচ্চকিত কলরব ভেসে আসে; ডে-লাইটের

উগ্র আলোয় চাঁদের মত রূপালী ইলিস আসমান-সমান স্তূপাকার হয়ে রয়েছে। মহাজনী নৌকাগুলো থেকে একটা অদৃশ্য গলার বেদনাগর্ভ গানের সুর শোনা যায়—

'ওগো, আমার আহ্লাদের স্বামী,
শ্বশুরবাড়ী যাইতে চাই গো নাইয়র দিবা নি—
এই ধর গো তুমি আমার চাবীর ছোরানি,
দুইদিন পরে অস্তুম ফির্যা, কাইন্দো না তুমি;
তুমি আমার টাকা পয়সা, সিকি দুয়ানি;
ওগো, আমার আহ্লাদের স্বামী'—

একটা তারস্বরে কর্কশ রসিকতা যেন তাড়া করে আসে সঙ্গে সঙ্গে; "কে রে, কফিলদ্দি না কি রে! ঘরের জরুর লেইগ্যা মনটা বুঝি ফাকুর ফুকুর করে! তা শুধা শুধা ক্যান গঞ্জে আইছিস্; বিবির কাপড়ের তলে বইস্যা থাক গিয়া।"

কফিলদ্দির নির্জীব আত্ম-সমর্থন কতকগুলো বজ্রসঞ্চারী হাসিতে এলমেলো হয়ে নিরাভরণ মেঘ্‌নার কোন দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে যায়; "আমি আমার কথা কই না কী! বউর কথা কই।"

আবার সেই নির্ম্মম হাসির কর্কশ ছন্দ মেঘ্‌নার হু হু বাতাসের ছন্দিত আকুলতায় ছন্দোপতনের মত ভেঙে পড়ে; "ঐ হইল, বউর কথা কইয়া নিজের মনের পোড়ানি কমাস। তোর শয়তানি আমাগো জানতে বাকি আছে!"

নির্ভুল পদসঞ্চারে এগিয়ে চলেছে আজম। 'গয়নার নাও'এর ঘাট, তারপর ইলসা মাঝির ঘাট, মহাজনী নৌকার ঘাট পেরিয়ে, সুজন শিক-দারের কাটা কাপড়ের দোকান পেছনে ফেলে, পাহাড়ী গাঙের মত হঠাৎ-বাঁক-নেওয়া পথটা কেরায়া মাঝিদের আসরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে।

চারবছর পরেও এতটুকু অসুবিধা নেই, পদবিক্ষেপে এতটুকু অপরিচয়ের বিভ্রান্তি নেই।

চন্দ্রমল্লিকার মালা-গাঁথা আকাশ একটা মসলিন মেঘের মায়াবরণের নীচে রহস্যময় মোহ ছড়াচ্ছে। পেছনের ইলসামাঝি ঘাটের শব্দগুলো দূরাগত কলগুঞ্জনের মত অস্পষ্ট হ'য়ে এসেছে, মহাজনী নৌকা থেকে কোন এক কফিলদ্দির গলায় বিরহার্ত গানের বেদনা নির্ম্মম রসিকতার বল্লমে বিদ্ধ হওয়ার নিষ্ঠুরতাও থেমে গিয়েছে।

হিজল গাছগুলোর শান্ত আচ্ছাদনের আশ্রয়ে, এখন এই পদ্ম-কোরকের মত তারা-জ্বালা রাত্রির প্রথম যামে দূর দূরান্তের চর-গঞ্জ-জনপদে বিক্ষিপ্ত কেরায়া নৌকাগুলো আবার পাশা পাশি কেন্দ্রিত হয়েছে।

সুজন শিকদারের কাটা কাপড়ের দোকানটার কাছে আসতেই দৃষ্টিটা একটা আকস্মিক চমকে কেঁপে গেল আজমের। হিজলছায়ার কোমল আচ্ছাদনের পাশেই একটা পুরাতন বংশীবটের ঘনপত্র শাখা প্রশাখার সুদীর্ঘ-বিস্তার। আর তারই নীচে কয়েকটা কাপড়ের মশাল জ্বলছে, শিখার পিঙ্গল আভা সমবেত মানুষ গুলোর বন্য কঠিন মুখে পিছলে পিছলে খেলা করে যাচ্ছে। প্রথমটা একটা অলীক-অবাস্তব স্বপ্নের ভ্রান্তি বলে মনে হ'ল আজমের; আর সেই ভ্রান্তিমগ্ন চেতনার মধ্য দিয়ে আবর্ত্তিত হ'তে হ'তে, কয়েকবছর আগের কতকগুলো পরিষ্কার ছবি ফর ফর করে উড়ে এসে শৃঙ্খলিত হ'য়ে দৃষ্টির সাম্‌নে ইতস্ততঃ দুলতে লাগলো।

কয়েক বছর আগেও এই বংশীবটের পত্রপুটে খেলা-করে-যাওয়া শ্রাবণ রাত্রির এমন ভৌতিক জ্যোৎস্নাতেও রসিক ঢালির কেরায়া নৌকায় আসর বসত। অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতায় নিবিড় হ'য়ে চারপাশের নৌকাগুলোতে ব'সে ব'সে নিরুদ্ধ বিস্ময়ে অনেকবারের শোনা সতর্ক রক্তকোষের মধ্যে ধরে-রাখা বিষহরির গানের প্রতিটি পদ বার বার নতুন শ্রদ্ধায় শুনত মানুষগুলো।

পারের ভাগ চাষী, বর্গাকৃষাণ, কামলা-মজুর এসে আসর জমাত ছোট ছোট এক মাল্লাই নৌকাগুলোতে। রসিক ঢালির ছন্দিত কণ্ঠ তখন সমবেত মানুষের বৃত্তে বেহুলার জন্য মর্ম্মিল সমবেদনার অশ্রুধারা প্রবাহিত করে দিয়েছে—

কান্দিতে কান্দিতে ক'ন বেহুলা যুবতী,
ভুবনে আমার সম নাই ভাইগ্যবতী,
বিবাহ করিয়া নাথ লইঞা আইল মোরে,
প্রভুর সঙ্গেতে ছিলাম লোহার বাসরে।

কয়েকটা মাত্র মুহূর্ত্ত। তারপরই মগ্ন চেতনার অতলগর্ভতা থেকে আচ্ছন্ন চোখ দুটো যেন উঠে এলো আজমের। আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা তীব্র চমকের মধ্যে সে আবিষ্কার করল, কখন যেন বংশীবটের নীচে সমবেত মানুষগুলোর নিবিড়তায় একটা বিন্দুর মত সেও মিশে গিয়েছে। তার মুখের ওপর দিয়েও মশালের পিঙ্গল শিখার বন্য বিশৃঙ্খল রেখাগুলো চঞ্চল ভঙ্গিতে নেচে নেচে যাচ্ছে।

একটা বজ্রগর্ভ গলা; সামনের জলচৌকিটার ওপর ঋজু ছন্দে বসে রয়েছে মানুষটা। চোখ দুটো দু টুকরো হীরকখণ্ডে প্রতিফলিত সূর্যের মত জ্বলছে ধক ধক করে, আর সেই সূর্যজ্বলন্ত দৃষ্টি থেকে একটা অপূর্ব্ব সম্মোহন যেন মানুষগুলোকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে একমুহূর্ত্তে। বজ্রমন্দ্রিত গলাটা এবার পরিষ্কার শোনা গেল।

"মিঞা সাহেবরা, আজ ক'বছর পাকিস্তান হয়েছে। এর মধ্যে কী পেয়েছেন আপনারা? সুখ? না। স্বস্তি? শান্তি? না। মান-ইজ্জৎ? তবে আল্লারসুলের নামে এ আজাদের প্রয়োজন কী?"

একটা অর্থভরা নিস্তব্ধতা থম থম করতে লাগল। সমস্তগুলো হৃৎপিণ্ডের

বাজনা, সমস্ত নিঃশ্বাসের শব্দ কোন একটা ইন্দ্রজালের কুহকে থেমে গিয়েছে। জলচৌকির ওপর ঋজু মানুষটার চারপাশে কেবল কতকগুলো আতসকাচের মত দৃষ্টি নির্নিমেষ হয়ে রয়েছে। কী একটা দুরধিগম্য সম্ভাবনার ইঙ্গিতে রক্তকণাগুলো উদগ্র হয়ে রয়েছে সকলের।

আবহুলাপুরের জনাবালি শঙ্কিত গলায় বলে উঠল; দুঃসহ নিস্তব্ধতার যবনিকাটা ভেঙে ছত্রখান হয়ে গেল; "কিছুই পাই নাই ছোট ভূইঞা সাহেব, কিন্তুক্ আমরা কী করতে পারি?"

অনেকগুলো কণ্ঠে কলগুঞ্জন চকিত হল; "ঠিক, ঠিক, কী করণ?"

জলচৌকির ওপর সূর্যজলন্ত হীরক দৃষ্টি থেকে একটা প্রচণ্ড খরদীপ্তি তরঙ্গে তরঙ্গে ছড়িয়ে চলল মানুষগুলোর ওপর। আবার সেই সমস্ত কিছু চেতনাকে নির্ব্বাক-করে দেওয়া স্বর থেকে বিচ্ছুরিত হ'ল; "আমাকে আপনারা ভূইঞা বলবেন না; আমি আজ থেকে আর ভূইঞা নই। আমার চাচাজান আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। যাক ওকথা। আমাকে ভাই সাহেব বলেই ডাকবেন।

চারবছর পাকিস্তান হয়েছে। হিন্দুরা ঘর বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছে; আজ আপনাদের নৌকার সওয়ারী মেলে না, কামলার কাজ মেলে না। পাকিস্তান হবার আগে আপনারা শুনেছিলেন, বাদশাজাদা হবেন। অথচ আজ এক সানক ভাতই মেলে না। এতকাল ক্ষেতে ধান ফলিয়েছেন—কেড়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ভূইঞা-জমিদারে, ঘরের বিবি-বিটি, তাও নিয়েছে তারা। আপনারাই পাকিস্তান বানিয়েছেন, তাও ছিনিয়ে নিয়েছে ভূইঞারা। আর কতদিন এ সহ্য করবেন?"

একটা সমুদ্র গর্জ্জন কলঝঙ্কারে প্রমত্ত হয়ে উঠল; "ঠিক, ঠিক, কিন্তুক কী করণ? না আর সহ্য করুম না।"

"কী করুম, তাই ক'ন ভাই সাহেব।"

"যা কইবেন তাই করুম। তিন দিন কাউফল খাইয়া রইছি জরু-বিটি লইয়া। আর যে পারি না।"

"সেই বছর বড় ভূইঞার মানুষে আন্ধার রাইতে আমার পোয়াতি বিটিটারে চুরি কইর‍্যা লইয়্যা গেল।" আর্তনাদের মত শোনালো একটা ক্লান্ত করুণ গলা।

জলচৌকির ওপর সেই বজ্রজ্বলা গলাটা মানুষগুলোর বুকের ভেতরকার নিরুপায় বন্দী কান্নাগুলোর কাছে মুক্তির বাতায়ন খুলে দিয়েছে সর্ব্বপ্রথম; দুরাগত সমুদ্র-বাতাস এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পঞ্জরাস্থির খাঁচায় আবদ্ধ মুমূর্ষু সত্তার ওপর। মানুষগুলো যেন কথা বলছে না, বুকের অতলান্ত পাতালে বিদ্রোহের কঙ্কালগুলো আত্মপ্রকাশের রন্ধ্রপথ পেয়ে দুর্ব্বার বেগে বেরিয়ে এসেছে।

আচম্‌কা কী একটা বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে গেল মনের ওপর; পেছন থেকে আজম দানা-পাওয়া মানুষের মত চীৎকার করে উঠল্; "আমি জানি, মাসখানেক আগে চর ইসমাইলে ধানের বাটারা (বাটোয়ারা) লইয়া ফরিদপুরের একটা মহাজনের লগে কাজিয়া হইয়া গেছে।"

সাঁ করে তলোয়ারের মত এক শ' জোড়া চোখ ঘুরে গেল আজমের দিকে। সূর্যজ্বলন্ত দৃষ্টিটা তার ওপরেই নিবদ্ধ হয়েছে এবার; "কে তুমি?"

থতমত খেয়ে গেল কণ্ঠ, বিশৃঙ্খল গলায় আজম বলল; "আমি ঢপের দলের আজম; সোনারঙের জিগিরালির পোলা।"

অনেকগুলো গলা এবার ঘনিষ্ঠ শোনালো; "আজমা না কী? কবে আইলি?"

"ঢপের দল বুঝি ভাইঙ্গ্যা গেছে?"

"নন্দ ভূইমালীরে বলে খুন করছে?"

সবগুলো গলা স্তব্ধ করে গর্জ্জন উঠল আবদুল্লাপুরের ইত্তিমালির

"সুমুন্দির পুতেরা, যা শুনতে আইছিস তাই শোন। পরে পীরিত করণের সময় পাবি সারা জনম।"

জলচৌকির ওপর থেকে আবার শোনা গেল স্বরটা ; যেন এখান থেকে নয়, অনেকদূরের কোন রহস্যভরা নীহারিকা থেকে বায়ুতরঙ্গ আশ্রয় করে ভেসে আসছে ; "আজমের কথা আপনারা শুনলেন মিঞা সাহেবরা। আরও অনেক জায়গা থেকে এমনি খবর এসেছে আমার কাছে। আপনারা জানতে চাইছিলেন, আমাদের কী করতে হবে ? যুদ্ধ করতে হবে। সংগ্রাম করতে হবে। ওরা আপনাদের শত্রু, পাকিস্তানের শত্রু, ওরা ইবলিশ্।"

আজমের রক্তদীপিত সংবাদটা এক মুহূর্তে একটা ভয়ঙ্কর দিগন্তের সংবাদ নিয়ে এসেছে। কিন্তু জলচৌকির ঐ অনেকদূরের বায়ু-আশ্রিত কথাগুলোর অর্থ তারা পরিষ্কার বোঝে না, একটা কুয়াশার আবরণ থেকে যায় বরাবর। আরো কয়েকবার তারা এমনি এই বংশীবটের ঘনপত্র আচ্ছাদনের নীচে, রহস্যময় মশালের আলোতে জমায়েত হয়েছে ; কিন্তু ভাই সাহেবের ঝকমকে কথাগুলোর যাদুমন্ত্রে বিমুগ্ধ হয়ে থাকলেও সুস্পষ্ট কর্ত্তব্য তাদের সাম্‌নে এখনও জ্যোতির্ম্ময় হয়ে ওঠে নি।

কে যেন বলে ; "যুদ্ধ করুম কার লগে ? ভূইঞার লগে ? ঘরের টুয়ায় আগুন লাগব আমাগোই। বীজ ধান কর্জ্জ বন্ধ কইর‍্যা দিব মহাজনে। তখন ?"

"ঠিক, ঠিক, ঠিক কথা। তখন ?"

বনবেতসের ঝোপের মত একশ'টা মাথা নড়ে উঠল।

হীরকখণ্ডের মত উজ্জ্বলন্ত চোখে খানিকটা তাজা আগুন সঞ্চারিত হয়ে গেল, স্বরটা কেমন যেন বিচলিত শোনালো এবার ; "মিঞা সাহেবরা, আপনারা হয়ত সন্দেহ করতে পারেন আমাকে, কিন্তু এটা বুঝছেন তো

আপানাদের ভালোর কথাই বলছি আমি। আপনারা একটা বড় কাজ করতে যাচ্ছেন। এর জন্য দরকার একতা।”

“সবই বুঝলাম ভাই সাহেব, কিন্তুক সন্দ কী আর সাধে যায় না! আপনেই তো কইলেন সেই পাকিস্তান হওনের আগের কথা। মোল্লামুছুল্লিগো কথায় পইড়্যা দাঙ্গা বাধাইয়্যা খেদাইলাম হিন্দুগো, এখন ভাতের বদলে চুকা (টক) কাউ ফল খাইয়া মরি। এইবার আপনেগো শহরের মানুষের মিঠা কথা শুইন্যা ভূইঞা-মহাজনের পিছনে লাইগ্যা আবার মরতে ক’ন না কী?”

সুস্পষ্ট অবিশ্বাস, তীক্ষ্ণ অসন্তোষের স্ফুলিঙ্গ রয়েছে কথাগুলোতে; যে কোন মুহূর্তে দাবদাহে খরজ্বলন্ত হয়ে উঠতে পারে। এই মানুষগুলোর মধ্যে কাজ করতে আসা সব চেয়ে কঠিনতম অগ্নি পরীক্ষা। মাটির খুব কাছাকাছি বলেই, মাটির মতই সহজ; এদের জীবনে কোন কুটিল বক্ররেখা নেই। কিন্তু বহুকাল ধরে বহু মধুবর্ষিত আশ্বাসে প্রবঞ্চিত হ’তে হ’তে বিশ্বাসের সীমান্ত বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে তারা। অনেক কথা তারা শুনেছে। অনেক বিগলিত স্বপ্নের মোহ ভঙ্গুর কাচের বাসনের মত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে; তারপর উপকারের সোনালী ছদ্মবেশের অন্তরালে একদিন জাগুয়ারের মত থাবা পেতে বসে থাকা শয়তানটাকে আবিষ্কার করার পর থেকেই তাদের চোখে যাচাই-করা তীক্ষ্ণতা এসেছে।

সূর্যজ্বলন্ত দৃষ্টিটা সকলের মুখের ওপর দিয়ে একবার সন্ধানী আলোর মত ঘুরে গেল। পরিশ্রমী মানুষগুলোর অবরুদ্ধ দেহের উদ্ধত রেখায় রেখায় বহ্নিপিঙ্গল দৃষ্টিতে, বজ্রবাহী পেশীতে পেশীতে আকাশের চলবিদ্যুৎ বন্দী হ’য়ে রয়েছে যেন। ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে সব চেয়ে বিস্ময়কর অসম্ভবও সম্ভব হবে, আর অনিপুণ হাতে ঐ অপরিমিত শক্তি প্রলয়পর্ব ঘটিয়ে পৃথিবী ছারখার ক’রে দেবে।

কেমন একটা অব্যক্ত ভয়ের শিহরণ তরঙ্গায়িত হচ্ছে বুকের ভেতর। কোন তোরণপথ দিয়ে এদের মর্ম্মগ্রন্থির দিকে সতর্ক পদসঞ্চারে অগ্রসর হতে হবে—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একটু ইতস্ততঃ করল ভাই সাহেব। আর এমনি সময় ঘটে গেল ঘটনাটা। পেছন দিকে একটা নিশ্চিহ্ন বিন্দুর মত বসে ছিল আজম, আচমকা একটা জ্যা-মুক্ত তীরের মত তীব্র বেগে জলচৌকিটার কাছে এসে দাঁড়াল। আর তার পরেই মেঘ্‌নার হু হু বাতাসের আকুলিত আবেদনকে ছিন্ন করে চীৎকার করে উঠল; "মেঞা ভাইরা আমি এ্যাদ্দিন এই গেরামে আছিলাম না, কিন্তুক দূরের গেরামে শুনছি জমির ধান লইয়া ভূইঞার লগে কাজিয়া বিবাদ হইছে। মারামারি খুনাখুনি সবই হইছে। ভাই-সাহেব ঠিক কথাই কইছে। কমলাঘাটে ভাগীদার চাষীরা একজোট হইছে, রামসিদ্ধিতে কেরায়া মাঝিরাও একজোট আমাগোও একলগে খাড়াইতে (দাঁড়াতে) হইব। সব একজোট। তবে মারামারি না; তারা বুঝমান মানুষ। আমাগো দুঃখুর কথা কমু। বুঝাইলে পাখীতে বোঝে। আর ভূইঞা মহাজনও তো মানুষ! উপকার করলে তারাই করতে পারে, আর কেউ না।"

"ঠিক কথাই কইছিস্ আজমা। আমাগো কাম আমরাই করুম। মারামারি না, খুনাখুনি না। সব বুঝাইয়া ক'মু। সব ভূইঞাই কি খারাপ! আমাগো হকেরটা চাইয়া নিমু।"

এক শ' টা কঠিন গলায় কবোষ্ণ সমর্থন।

আজমের গলা থেকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে অমার্জ্জিত দৃষ্টিগুলোতে।

কাল রাত্রির জ্বরটা শরীরের প্রতিটি পেশীতে পেশীতে একটা খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছিল, এখন বিধ্বস্ত স্নায়ুগুলো কেমন যেন নির্জীব হয়ে আসতে সুরু করেছে। উত্তেজনার মুহূর্ত্তে পেছন থেকে উঠে এসেছিল, কথাগুলোকে দ্রুত মুক্তি দিয়ে বিলম্বিত নিঃশ্বাস টানতে টানতে বসে পড়ল আজম।

ভাই সাহেবের চোখের সেই জ্বলন্ত হীরকখণ্ডের মত মণিদুটো থেকে এখন বিমুগ্ধ শ্রদ্ধা করছে। এই সহজতম কথা ক'টিই বলতে সে এসেছিল। মৃদুগলায় সে বলল; "চমৎকার, এই কথাই আমি বলতে চাই। সব একজোট হতে হবে। ধানের ক্ষেতে, নৌকার ঘাটে, সব জায়গাতেই। আপনারা মুসলমান, আর এও পাকিস্তান কিন্তু আজও আপনারা গোরে কবর দিতে পারেন না, আজও আপনাদের মস্জিদে ঢুকতে দেয় না মোল্লারা। সব কিছু আদায় করে নিতে হবে।"

বার বার উচ্ছ্বাস এসে যাচ্ছে; কথা বলতে গেলেই সব কিছু ছন্দিত কবিত্বময় হয়ে যায়; বইয়ে-পড়া সেই আশ্চর্য পৃথিবীটা, যেখানে সকলের সমান প্রতিষ্ঠা, সমান অধিকার, যে পৃথিবীটাকে একটা মায়ালোকের অবাস্তব ইন্দ্রজাল বলে মনে হয়, তাকে লালসা-ক্লিন্ন পৃথিবীর কোন একজায়গায় কল্পনা করতে চেতনা ঠিক সায় দেয় না। একটা নিবিড় সুখানুভূতির মত তাকে কোন চাঁদের বাসরজাগা স্বপ্নে বন্দী করে রাখতেই ভালো লাগে। সেই পৃথিবীর সংবাদ দিতে দিতে মাটির ভাষা হারিয়ে যায়, মেঘলোকের মায়াছন্দ কোমল আবেগে রণিত হয়ে ওঠে। আর তখনই সবচেয়ে বড় সমস্যা। মানুষগুলো নির্ব্বোধ দৃষ্টি নিয়ে ব'সে থাকে, ঐ মিষ্টি কথাকাব্যের নীচে কোন কুমতলবের গন্ধ খুঁজে বার ক'রে অবিশ্বাসে সন্দিগ্ধ হ'য়ে ওঠে।

একশ'টা গলা শোনা গেল; "ঠিক কথা, কিন্তুক্ মারামারি করুম না আমরা। শান্তিতে বেবাক চাই। না পাইলে দেরী করুম। একদিন পামুই সব।"

আচমকা আবার বলতে সুরু করল ভাই-সাহেব; "যে কথা বলতে এসেছি, সহর থেকে খবর পেলাম, সকলকে বাঙ্লা ভুলে উর্দ্দু শিখতে হবে। মিঞা সাহেবরা বাঙ্লা ভাষা আমাদের বাজান-নানার ভাষা; সেই ভাষা ছাড়তে হবে! আপনারা কী বলেন?"

প্রথমে একটা দুর্যোগগর্ভ স্তব্ধতা, তারপরেই বংশীবটের উদার-প্রসারিত শাখা-প্রশাখার নীচে একসঙ্গে একশ'টা কণ্ঠে বজ্র ঘোষণা শোনা গেল।

"কোন সুমুন্দির পুতে কইছে, একেবারে শ্যাষ কইর‍্যা ফেলামু না শালারে। অনেক সইছি, এইবার বুকের কথা লইয়া টান দ্যায়।"

"ধান নিছে—সইছি, জান নিছে—সইছি, মান-ইজ্জৎ নিছে—সইছি। এইবার বাজান-নানার কথা ধইর‍্যা টান দ্যায়। ঘাড়ে কয়টা মাথা দেখুম না একবার।"

মশালের পিঙ্গলাভ শিখার চারপাশে আবর্ত্তিত হতে হতে ভৈরব গর্জ্জনটা মেঘ্‌নার ঝড়ো বাতাসে সওয়ার হয়ে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল।

আকাশের কোণায় কোণায় চন্দ্রমল্লিকার মালার ওপর একখণ্ড করাল মেঘের ছায়া সঞ্চার হয়েছে। আসন্ন একটা দুর্যোগে, একটা প্রলয় দুর্ঘটনার ইঙ্গিতে থম থম করছে মেঘ্‌নাপারের মাটি।

একসময় মশাল নিভে গেল; আসন্ন দুর্যোগের ঝড়ো সংকেত মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল মানুষগুলো।

সকলের অলক্ষ্যে জেলাবোর্ডের সড়কটার ওপর উঠে এলো আজম; পাকে পাকে অজগরের মত আঁকা বাঁকা পথ ধরে পাকা দু'টি মাইল হেঁটে যেতে হবে এখনও। মাথাটা টলছে, সারাদিনে এক সানক মাড় ছাড়া আর কিছুই পেটে পড়েনি। ঝাঁ ঝাঁ করে জলে-যাওয়া মগজের ওপর একটু আগের বংশী বটের তলার আসরটা কেমন যেন নিরবয়ব শূন্যতায় মিলিয়ে যাচ্ছে। হীরকখণ্ডের ওপর প্রতিফলিত সূর্যের মত দুটি চোখ; বজ্রগর্ভ কণ্ঠ; মশালের চারপাশে জলবাঙ্‌লার দৃঢ়পণ পরিশ্রমী মানুষগুলোর কোন সুস্পষ্ট ছবি উত্তেজিত স্নায়ুগুলোর ওপর ঠিকমত ধরতে পারছে না আজম। অনেক দিন আগের আধা-বিস্মৃত কোন কাহিনীর মত একটু একটু

দোলা দিয়ে যাচ্ছে একটু আগের ঘটনাটা। ঘনকৃষ্ণ অবগুণ্ঠণের অন্তরাল থেকে উঁকি দিচ্ছে কোন একটা রহস্যময় অতীত স্বপ্ন।

আটপাড়ার বাঁকে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আজম। পেছন থেকে একটা আশ্চর্য কোমল ডাক ভেসে আসছে তারই দিকে। একটু পরেই মানুষটা পরিষ্কার হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। সেই সূর্যজ্বলা দৃষ্টি এখন রেশমের মত নরম, সেই বজ্রডাকা স্বর এখন অপূর্ব্ব শান্ত। চারপাশে ঘনীভূত অন্ধকার, বেনা ঝোপ থেকে আটকিরার দীর্ঘ ডাঁটাগুলো ভৌতিক মাথা তুলেছে আকাশে। কোথায় ঝিঁঝিঁর কান্না চলেছে একটানা, আর এরই পটভূমিতে বিহ্বলের মত তাকিয়ে রইল আজম।

ভাইসাহেব বলল ; "কোথায় যাবে তুমি ?"

"সোনারঙ।"

"চল তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি ; আমি যাবো ইদিলপুর।"

দুজনে পাশাপাশি চলতে সুরু করল। মাঝখানে একটা সংকেতময় নীরবতা সঙ্কুচিত হয়ে রয়েছে। একসময় আবার সেই কণ্ঠ ; "তোমাকে তো আর দেখি নি।"

"আমি ঢপের দলে আছিলাম ; দল ভাইঙ্গা গেল। তারপরও কয়েকবছর এখানে-সেখানে গান বাইন্ধ্যা গাইয়া বেড়াইছি। মাইন্ষে কবিদার বইল্যা খাতির করে।"

"তুমি কবি !"

বিমুগ্ধ বিস্ময় বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হ'তে সুরু করল সেই কণ্ঠ থেকে। "তবে তুমিই বুঝবে, তুমিই বুঝেছ। তোমার ওপর অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব। ঐ মানুষগুলো আমার কথা বোঝে না। ওদের বুঝিয়ে দেবার ভার তোমার।"

আবার সেই কণ্ঠটা অনেকদূর থেকে বায়ুকে আশ্রয় করে যেন্ ভেসে আসছে। ভারী অস্বাভাবিক ঠেকছে স্বরটা, তবু সেই সম্মোহন-করা

কথাগুলোর মগ্নতায় তলিয়ে গেল আজম। শ্রাবণ রাত্রির ইতস্ততঃ রূপালী ছোপ-লাগা অন্ধকারে ভাই-সাহেবের দৃষ্টিটা আবার কেন যেন জ্বলতে সুরু করেছে।

তিন

"আল্লা-হো-আকবর।"

মেঘ্‌নার কালনাগিনী রঙের ফেনাগর্জ্জিত ঢেউগুলোর ওপর ভৈরব হুঙ্কার তুলে ওপারের দিকে ভেসে গেল আওয়াজটা; আর চমকে উঠল এপারের এই ছোট্ট জনপদের আরো ছোট্ট হৃৎপিণ্ডটা।

"আল্লা-হো-আকবর।"

নিদ্রাবতীর খালের সাঁকোটা পেরিয়ে আসতে আসতে একটা তীব্র আতঙ্ক বিদ্যুতের মত সঞ্চারিত হয়ে গেল সন্নিহিত গ্রাম, বাসাইলের মাধব বাড়োরীর রক্তধারায়; হাঁটু দুটো ঠক ঠক করে বাস্তুপূজোর ঢাকের মত বাজতে সুরু করেছে ইতিমধ্যে।

"আল্লা-হো-আকবর—"

বয়রা বাঁশের সাঁকোটা পেরিয়ে এসে শুভ্র মঞ্জরীতে ছেয়ে-যাওয়া দেশী গাব গাছটার নীচে পা দুটো আচম্‌কা স্তব্ধ হয়ে গেল মাধব বাড়োরীর। স্নায়ুগুলোর মধ্যে একটা বিপর্যয় ঘটে গেল যেন সহসা; কী একটা অন্ধকার আশঙ্কার অতলান্তে সমস্ত মনটা পাক খেতে খেতে তলিয়ে যেতে সুরু করল। তবে কি, তবে কি—চিঠির কথামত তার মেয়েটার জন্যই ওরা আসছে—

শেষ শ্রাবণের আকাশ থেকে এতক্ষণে বিকালের সোনালী ঐশ্বর্য মুছে গিয়েছে একসময়; আর তারই ফাঁকে ফাঁকে বর্ষাপাণ্ডুর সন্ধ্যার বিবর্ণ ছায়া নেমে এসেছে ধূসর প্রেতমিছিলের মত।

সংবাদটা তবে মিথ্যে নয়! ঐ ফেনায় ফেনায় গর্জ্জমান মেঘ্‌নার ঢেউগুলোর ওপর দিয়ে কিংবা আরো দূরে যেখানে চিহ্নহীন দিগন্তে ঘননীল আকাশটা একটা অর্দ্ধবৃত্তের আকারে নেমে গিয়েছে, যেখান থেকে পদ্মার চন্দনরঙা উৎক্ষিপ্ত জলতরঙ্গ মেঘ্‌নার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, সেখান থেকেই কি একটা অশুভ ঘোষণার মত কয়েক বছর আগের রক্তাক্ত সংবাদটা অতি দ্রুত আবর্ত্তিত হ'তে হ'তে ছুটে এসেছিল এই মেঘ্‌নাপারের নগণ্য সোনারঙ্ গ্রামখানায়। দাঙ্গা! আজ এতদিন পরে আজাদ পাকিস্তানে আবার এ কোন নির্ম্মম জিগির উঠল। বুকের পকেটে হাত দিয়ে চিঠিটা স্পর্শ করে নিল মাধব বাড়োরী; যেন ঘটনার সত্যতা আর একবার অনুভব করল। আজ সকাল বেলাতেই চিঠি এসেছে। তবে কি, তবে কি তার মেয়েটার জন্যই—

"আল্লা-হো-আকবর—আল্লা-হো-আকবর—"

শব্দ ক'টা জ্বলন্ত তীরের মত হৃৎপিণ্ডের ওপর এসে বিঁধছে যেন।

দক্ষিণদিকের পথটা মেঘমতী রাজকন্যার সীঁথির মত ঋজু রেখায় কতকগুলো ঢেউখেলানো টিনের বাড়ীর বিন্দুতে ফুরিয়ে গিয়েছে। ওপরে মকরমুখী চাল, নীচে শালতক্তার খিলান-করা পাটাতন। কাঁঠাল কাঠের দরজার ওপারে হ্যারিকেনের মৃদু-আভাসিত আলোটা ছড়িয়ে পড়েছে। ঘরটার সামনে একমুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করল মাধব বাড়োরী, তারপর পাণ্ডুর গলায় ডাকল, "ভূইঞা সাহেব—অ—ভূইঞা সাহেব—"

"কে?" পঁচিশের বন্দের ঘরখানার ভেতর থেকে একটা চকিত প্রশ্ন ভেসে এলো সঙ্গে সঙ্গে।

"আমি মাধব বাড়োরী।"

একটু পরেই চৌকাঠের ওপর উন্নত লম্বের মত দীর্ঘ-কঠিন একটা বাদশাহী চেহারার আবির্ভাব হ'ল। ঘরের ভেতরকার অবগুন্ঠিত আলোর

ক্ষীণাভাস আর বাইরের বর্ষাবিবর্ণ আর কুয়াশা-জড়ানো অস্পষ্টতায়ও বড় ভূইঞা জলিলউদ্দিন চৌধুরীকে পরিষ্কার চিনতে এতটুকু অসুবিধা হচ্ছে না। জলিলউদ্দিন বলল; "আসুন, আসুন বাড়োরী মশায়। তা কি মনে করে?"

শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বমুহূর্তে একটা অতিকায় গণ্ডার যেমন করে পর্যবেক্ষণ করে, সেই দৃষ্টি বড়ভূইঞার চোখে ক্রূর খুশীতে ঝকমক করে উঠল।

"আজ্ঞে, একটা কাজের কথা আছে।"

ঘরের ভেতর চলে এলো মাধব বাড়োরী আর জলিলউদ্দিন। শাল-তক্তার পাটাতনের ওপর একটা জীর্ণ গালিচা প্রলম্বিত রয়েছে। এবার উদার অভ্যর্থনার মত শোনালো জলিলউদ্দিনের গলাটা; "বসুন, বসুন বাড়োরী মশায়। খোদার ফজলে আজ আমার পরম সৌভাগ্য—আপনার পায়ের ধুলো পড়ল। বলুন এবার আপনার কাজের কথা।"

দাড়ি-আকীর্ণ মুখটার মধ্যে হ্যারিকেনের ইতস্ততঃ আলোয় দাঁতগুলো ছুরির ফলার মত ঝক ঝক করে জ্বলে উঠল জলিলউদ্দিনের। নিরুত্তাপ দৃষ্টিটা একবার বড় ভূইঞার মুখের ওপর স্থির বিন্দুর মত নির্দিষ্ট রেখে মাধব বাড়োরী কম্পিত গলায় বলল; "বড় খারাপ খবর শুনলাম ভূইঞা সাহেব। আবার না কী দাঙ্গা আসছে। পাকিস্তান হওয়ার পরও আজ সকালে বেনামী চিঠি এসেছে, এই দেখুন। আমার মেয়েকে উদ্দেশ করে—"

বুক পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে হ্যারিকেনের অনুজ্জ্বল আলোতে মেলে ধরল মাধব বাড়োরী।

এবার দৃষ্টিটা নিরাসক্ত দার্শনিকের মত উদাস হয়ে গেল জলিলউদ্দিনের; যে কোন সময় এখন সে হাব্‌সী উচ্চারণ করতে পারে—এমনি একটা ভয়াবহ সন্ধিমুহূর্ত্ত এসে দাঁড়িয়েছে।

"দাঙ্গা ! এই পাকিস্তানে আবার দাঙ্গা কিসের ? যত আল্‌গা ভয় হিন্দুদের !"

জলিলউদ্দিন চৌধুরীর ঘনবিন্যস্ত দাড়ির অরণ্যে একটা রহস্যময় হাসির দোলা লাগল আচম্‌কা। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ দু'টো কেঁপে উঠল মাধব বাড়োরীর। হাতের মুঠোতে সকালের বেনামী চিঠিটা দমকা বাতাসে জয়পতাকার মত ফর ফর করছে।

দৃষ্টিটা এতক্ষণ টিনের চালের কোন ছিদ্রতোরণের মধ্য দিয়ে বেহেস্তের দিকে বিচরণ করছিল, এবার তাকে পরম আয়াসে মাটীর পৃথিবীতে নামিয়ে নিয়ে এলো জলিলউদ্দিন ; তারপর উচ্চকিত গলায় ডাকল ; "এই রমিনা, এই বান্দী—এই জানোয়ারের বাচ্চা।"

"যাই ভূইঞা সাহেব।"

একটা ত্রস্ত-বিবর্ণ কণ্ঠ ভেসে এলো ওপাশের একটা তরঙ্গময় টিনের চালার পাশ থেকে।

একটু পরেই পেছনের দরজাটা ঠেলে এই ঘরটার ভেতর চলে এলো রমিনা। আঠারো বছর বয়স—বনবেতসের সরস লতার মত সমস্ত দেহটায় এই পদ্মামেঘনার দেশের কি একটা সজীব স্পর্শ রয়েছে। কিন্তু আজমের দেখা সেই সন্ধ্যাতারার মত ঘননীলিম দুটো চোখের মণিতে একটা বোবা আর্ত্তনাদ যেন কোন মৃত্যুযন্ত্রণায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

জলিলউদ্দিন মুখচোখের একটা পাশবিক ভঙ্গি করল। ছুরির ফলার মত ঝকমকে দাঁতগুলো ঘন দাড়ির যবনিকা সরিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে ; "হারামজাদী থাকিস্ কোথায় ? বাড়োরী মশায়কে পান তামাক দে।"

"এই তো এইখানেই আছিলাম।"

মৃদু গলার ক্ষীণতম একটু প্রতিবাদ, চকমকি থেকে প্রথম ফুলকি ঝরল মাটিতে।

"বান্দীর গলায় আবার আওয়াজ! কাছিমের ছাও শূওর। তোকে বিশ পয়জার।" ঘন দাড়ির অরণ্যে দাঁত-ঘষার বজ্রপতন হ'ল যেন। পায়ের একপাসারী ওজনের একটা কাঁচা চামড়ার জুতো খুলে লাফিয়ে উঠল জলিলউদ্দিন।

জবাই-আসন্ন একটা নির্ব্বোধ প্রাণীর মত মৃত দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে মাথাটা নামিয়ে নিল রমিনা।

মাধব বাড়োরীর গলায় ঘন-স্পন্দিত উদ্বেগ; "আহা-হা ওকে মারবেন না ভূইঞা সাহেব; ছেলে মানুষ।"

"আচ্ছা, আপনার কথাটা রাখলাম বাড়োরী মশাই; কিন্তু আপনি জানেন না কি শয়তান এই বান্দীটা। মুখে মুখে জবাব দেওয়া চাই সব কথার।"

লক্ষ-ছিন্ন ডুরে শাড়ীটা আর মেঘের মত তরঙ্গায়িত একরাশ চুলের ললিত প্রচ্ছদপটে রমিনার শ্বেতকমলের মত মুখটা একবার বিদ্রোহী কাঠিণ্যে ঝকমক করে উঠল; তার পরেই পেছনের দরজাটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে গেল সে।

"আল্লা-হো-আকবর"—

হিংস্র উল্লাসে টিনের বেড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আওয়াজটা। আর সঙ্গে সঙ্গেই হৃৎপিণ্ডটা প্রায় ঠোঁটের ওপর লাফিয়ে উঠল মাধব বাড়োরীর। ভীতি-পাণ্ডুর গলায় সে বলল; "ভূইঞা সাহেব, বড় ভয় করছে। আজ শুনলাম; নোয়াখালির দিকে আবার দাঙ্গা হয়েছে। সকালে এই বেনামী চিঠি পেয়েছি। আপনি বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট; আপনি গ্রামে থাকতে"—

ঘন চাপ দাড়ির বিভাসিত অরণ্যে একটা কুটিল অর্থময় ভঙ্গির সঞ্চার করে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এবং সমস্ত তল্লাটের অদ্বিতীয় শাহেন-

শাহ জলিলউদ্দিন তার ইব্‌লিশের মত মুখটায় একেবারে পবিত্র বেহেস্ত থেকে পয়গম্বরী ভঙ্গিমা নামিয়ে আনলো ; "না না ঐ সব কথায় কান দেবেন না বাড়োরী মশায়! তবে যোয়ান ছেলে পিলে আছে গ্রামে—আনন্দে একটু তোলপাড় করে আর কি!"

"হাঁ–হাঁ আমিও সেই কথাই বলি—"

উৎসাহিত গলায় বলতে বলতে কোমরের গোপন গ্রন্থি খুলে একশ' টাকা বের করল মাধব বাড়োরী ; "এই টাকাটা রাখুন ভূইঞা সাহেব। এ দিয়ে ছেলেদের একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দেবেন। আমরা এতকাল একসঙ্গে আছি। রাত পোহালে হিন্দুরা মুসলমানদের মুখ দেখে সকলের আগে, মুসলমানেরা দেখে হিন্দুদের। আমরা আপনারা ভাই ভাই—"

"ভাই ভাই ক্যামন?"

বর্ষায় গর্জমান মেঘনার মত মাতাল হাসি হেসে উঠল জলিলউদ্দিন। আর একটা নিশ্চিত অবিশ্বাসে বুকের ভেতরকার হৃৎপিণ্ডের বাজনায় কেন যেন বার বার ছন্দোপতন হতে লাগল মাধব বাড়োরীর।

ইতিমধ্যে রমিনা তামাক সেজে নিয়ে এসেছে।

তামাকের বাদশাহি মৌতাতও কেমন যেন বিস্বাদ হয়ে গেল মাধব বাড়োরীর স্নায়ুগুলোতে। ডোরা-কাটা সিল্কের লুঙ্গিটা জলিলউদ্দিনের শরীরে অমার্জ্জিত বন্য পৃথিবীর ইঙ্গিত ধারণ করে রয়েছে ; চাপদাড়ি আর শৃঙ্খলিত চুলের পটভূমিতে, নেকড়ের দৃষ্টির মত চোখের মণিতে খানিকটা তরল আগুন যেন চঞ্চলভাবে নড়ে চলেছে তার। সে দিকে তাকিয়ে তামাকের চিতা নিভিয়ে ফেলল মাধব। ভারী অস্বস্তি লাগছে, দৃষ্টিটা যেন তুরপুনের মত হাড়মাংস ভেদ করে মর্ম্মগ্রন্থিকে স্পর্শ করেছে।

মাধব বাড়োরী বলল, "আমাদের দিকে কৃপাদৃষ্টি রাখবেন ভূইঞা সাহেব। আপনার হাতের তলায় আমাদের মাথা।"

"আচ্ছা, আপনি এখন যান। পরে আপনাকে দরকার হতে পারে। ডাকা মাত্রই চলে আসবেন।"

মাথা দুলিয়ে একসময় বাইরের কালির মত অন্ধকারে বেরিয়ে গেল বাসাইলের মাধব বাড়োরী।

জলিলউদ্দিন চৌধুরীর হাতের মুঠোতে মাধব বাড়োরীর দেওয়া একশ' টাকার একটা উত্তপ্ত অনুভূতি; ধীরে ধীরে তার মেজাজটা টিনের চাল ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করল। বিচিত্র যোগাযোগ। দৃষ্টিটা থমকে গেল ঘরের এক কিনারায় চেতনাহীন একপিণ্ড জড়ত্বের মত দাঁড়িয়ে-থাকা রমিনার শুভ্রপদ্ম কমনীয় মুখখানার প্রচ্ছদপটে।

গত বছরের আউশ ধান এবার বর্ষায় তেজী দামে বেচে একশ'কুড়ি টাকা দিয়ে ক'দিন আগে বিবি কিনেছে জলিলউদ্দিন। ধান কি পাট বেচার দিন এলেই তার সমস্ত রক্তকণিকাগুলোতে একসঙ্গে নতুন বিবির নেশা রিমঝিম করে সারিন্দার সুরের মত বেজে ওঠে। এবারে নতুন বিবি ফুলবানুর সঙ্গে রক্তমাংসের জীবন্ত যৌতুক হয়ে এসেছে এই বাঁদীটা—রমিনা।

আচমকা কি একটা মনে পড়ে গেল জলিলউদ্দিনের; "মনসুর বাড়িতে এসেছে আর?"

"না ভূইঞা সাহেব; পরশুদিন একবার আইস্যা বই টই বেবাক লইয়া গেছে গিয়া ভাই সাহেব।"

"আচ্ছা। দেখা যাবে—ঐ সব বই পড়ে মানুষকে চালাক করার শয়তানী কি করে ভাঙতে হয় তা আমার জানা আছে। আমিও জলিলউদ্দিন।"

স্বগত-ভাষণে কিছুটা আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় করে নিল জলিলউদ্দিন। তার পরেই দৃষ্টিটা আবার কেন্দ্রিত হ'ল রমিনার মুখের ওপর।

এ কদিন নানা ধান্দার ঘূর্ণিবৃত্তে পাক খেতে খেতে রমিনার মুখের দিকে অর্থঘন নজর ছড়াবার অবসর হয় নি, কিন্তু শেষ শ্রাবণের এই বর্ষাবিবর্ণ রাত্রে ঘরের ভেতর অনুজ্জ্বল হ্যারিকেনের নেশাময় আলোতে রমিনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুকের ভেতর কেমন যেন মাতন লাগল জলিলউদ্দিনের।

লাল লাল গাবের দানার মত দন্তরুচি বিকশিত করে বুনো ভামের প্রেতায়িত গলায় একবার হেসে উঠল জলিলউদ্দিন ; তারপর বিশৃঙ্খল গলায় বলল ; "হে—হে পেত্নীর ঘরে হুরী হয়ে জন্মেছিস দেখি। বান্দীর ছুরাৎ দেখি খালের শাপলা ফুলের মত—হে—হে। আয় তোর সঙ্গে শা-নজর (শুভদৃষ্টি) করি।"

এ হাসির অর্থ তিমিরাবৃত রহস্য নয় রমিনার ইন্দ্রিয়গুলোর কাছে ; জলিলউদ্দিনের ঐ কুৎসিত কথাগুলো শুনতে শুনতে তার আঠার বছরের যৌবনটা একটা হিংস্রতম দুর্ঘটনার আতঙ্কে শিশু-কবুতরের বুকের মত শিউরে উঠল ; একবার অসহায় করুণ চোখে জলিলউদ্দিনের মুখের দিকে তাকালো সে।

"হে—হে ভয় পাচ্ছিস না কি ! কেউ নেই এই বাইরের ঘরে ; কাছে আয়। সরম লাগে না কি ! বান্দীর আবার হারেমের বিবির মত সরম আছে না কি ?"

রমিনার ডুরে শাড়ীটার নেপথ্যলোকে একটা পদ্মতনুর কল্পনায় মগজের মধ্যে কেমন যেন বিপর্যয় বেধে গিয়েছে জলিলউদ্দিনের ; কেমন নিশিতে পাওয়ার মত ঘোর ঘোর লাগছে চেতনাটা।

নিশ্চিত পদক্ষেপে খানিকটা এগিয়ে এলো জলিলউদ্দিন।

"ভূইঞা সাহেব আমার বড় ডর করে, এইটা ভাল কাম না।"

রমিনার গলায় একটা তীব্র আর্তনাদ দোলায়িত হয়ে উঠল।

"ডর ! ভাল কাম না !"

জলিলউদ্দিনের গলায় কুটিল প্রতিধ্বনি ; বুনো ভামের মত ইতর হাসিটা অনার্য মুখখানার ওপর আরো খানিকটা প্রলম্বিত করে দিল সে ; "ভাল কাজ না এইটা ! একেবারে পয়গম্বর হয়ে গেলি দেখি বান্দী। এর পর দোজখের নাম করে, গুণাহ্‌র ভয় দেখিয়ে এখনই নামাজ পড়াতে বসাবি না কি ?"

একেবারে নিঃশ্বাসের সীমানায় এসে পড়েছে জলিলউদ্দিন। রমিনার কাঁধের ওপর হাত দুটো বিস্তার করে আকর্ষণ করার চেষ্টা করল সে। তার কলঙ্কিত স্পর্শের মধ্য দিয়ে একটা হিমতরঙ্গ যেন রমিনার রক্তের মধ্যে বিদ্যুতের মত শির শির করে ছড়িয়ে পড়ল। আরো একটু বুকের কাছে টেনে আনল জলিলউদ্দিন। তার কৌমার্যের সুদৃঢ় বন্দরে একটা উন্মত্ত পশুত্বের ক্ষ্যাপা সমুদ্র ঝড়ের মত আছড়ে পড়বার মুহূর্তে আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠল। রমিনার ঘননীলিম সন্ধ্যাতারার মত দুটো চোখের মণিতে হ্যারিকেনের নিরুচ্ছ্বাস আলোটা কেমন যেন স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল।

আচম্‌কা শ্রাবণ রাত্রির মেঘবিমুক্ত আকাশ থেকে এই পঁচিশের বন্দের ঘরখানায় একটা বজ্র নেমে এলো। আর একটা তীব্র চমকে জলিলউদ্দিনের বুকের সমুদ্র থেকে ব্যাত্যাপ্রহত একমাল্লাই নৌকার মত রমিনার দেহটা ছিট্‌কে পড়ল ঢেউটিনের বেড়ার ওপর।

পেছনের দরজা দিয়ে কখন যেন নতুন বিবি ফুলবানু বিড়ালের মত মখমল মসৃণ পদসঞ্চারে এই ঘরটার ভেতর চলে এসেছে। একটা আকার-বিহীন মাতলা পৃথিবীর আচ্ছন্নতায় তলিয়ে যেতে যেতে জলিলউদ্দিন কি রমিনার একটুও অবকাশ হয় নি সেদিকে তাকাবার।

"তাই বলি, বান্দী হারামজাদীটা গেল কোথায় ? সারা অন্দর মহল্লা মুরগীর মত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলাটা ফাটিয়ে ফেললাম ; কুত্তার বাচ্চা একটুও জবাব দেয় না।"

ধারালো তলোয়ারের লিকলিকে ইস্পাতী ফলাটার মত ফুলবানুর গলা ঝকমক করে উঠল।

ইতিমধ্যে দুটো হাতের বোরখা-গুণ্ঠণে সমস্ত মুখটা লুকিয়ে গুমরে গুমরে কেঁদে উঠেছে রমিনা—সমস্ত দেহটা দমকে দমকে ফুলে উঠছে।

ফুলবানুর শরীরে এতক্ষণ রাঙা লঙ্কার অসহ ঝাঁঝ মিশে ছিল, এবার মেজাজের বারুদে কোথা থেকে একটা মশালের শিখা এসে লাগলো; "হারামজাদী বান্দীর বাচ্চা বান্দী; তোর মনে এত। মুরগীর বদলে তোকেই আজ জবাই করব। সোহাগ কত? আবার কাঁদতে বসেছে?"

অন্তর্নিহিত বীররসের প্রেরণায় ফুলবানু পবিত্র বেগমী লাথির ফুলবর্ষণ সুরু করল রমিনার পাঁজরে। ইতিমধ্যে নদীর ঢেউএর মত একটানা কান্নাটা গলার ওপর থেকে মুছে গিয়েছে, মাঝে মাঝে ফুলবানুর মেহেদীরাঙানো পদচম্পার আদর-স্পর্শে হৃৎপিণ্ডটা কোঁং করে আর্তধ্বনি তুলে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

"হারামজাদী বান্দী; গোবরিয়া (গুবরে পোকা) হয়ে আসমানের চাঁদ ধরার মতলব তোর?"

পায়ের সঙ্গে অবশেষে হাতও সন্ধি পাতালো ফুলবানুর; দুটি ছোট ছোট মুষ্টিবদ্ধ হাত, আর দু'টি পা বিক্ষুব্ধ আক্রোশে রমিনার দেহটাকে কাদার মত ছান্‌তে লাগলো। এই মুহূর্ত্তে ফুলবানু একটা ভয়াবহ প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলতে পারে, স্বাভাবিক নিয়মে এমনি চিন্তা মনে আসতে পারে। অবশেষে একসময় এই পবিত্র বীরকর্ম করতে করতে ফুলবানুর কপালের প্রান্তরে এই শ্রাবণশেষের হিমলাগা রাত্রেও বিন্দু বিন্দু ঘামের মুক্তা ফুটে বেরুল; হাত আর পায়ের গ্রন্থিগুলো শ্রান্ত আচ্ছন্নতায় অবশ হয়ে আসতে সুরু করল। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা ঝড়-লাগা বাবুই পাখীর বাসার মত দোল খেয়ে চলেছে—হাঁপাতে হাঁপাতে কাঠের পাটাতনে বসে পড়ল ফুলবানু।

এতক্ষণ একপাশে এই বীররসাত্মক নাটকটার নীরব দর্শকের ভূমিকায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জলিলউদ্দিন। নির্জন ঘরের রহস্যময় আলোতে রমিনার পদ্মতনুর কল্পনায় লোভাতুর ইন্দ্রিয়গুলোর ছুরিতে এতক্ষণ যে শান পড়েছিল, ফুলবানুকে দেখতে দেখতে সেই ধারের ওপর যেন একমুহূর্তে জঙ্ ধরে গেল। স্নায়ুগুলোর ফলকে ফলকে কণায় কণায় যে কামনার রস জমেছিল—সব বাষ্প হয়ে উড়ে গেল।

ফুলবানুকে এই সেদিন সাদি করে এনেছে। এর মধ্যেই মেজাজের যে ভয়াবহ পরিচয় সে দিয়েছে তা মোটেই স্বস্তিকর নয় জলিলউদ্দিনের পক্ষে। সে দিন কি একটা কারণে পাঁজরার ওপর থেকে এক নখ মাংস খাবলে নিয়েছিল; এখনও ঘা টা জ্বালাময়ী একটা স্মৃতি নিয়ে সগৌরবে বিরাজ করছে।

রমিনাকে বিধ্বস্ত করতে করতে যেই মাত্র ফুলবানু ধরাশায়ী হয়ে পড়ল, অমনই সে তৎপর হয়ে উঠল; "ওঠ্ ওঠ্ বান্দী, বিবিজান পড়ে গিয়েছে। বাতাস কর, জল আন, বিছানা পাত্।"

বিস্রস্ত শরীরটা গুছিয়ে ধীরে ধীরে উঠে পড়ল রমিনা; তার নাক-মুখের সুশুভ্র পটভূমিতে কতকগুলো রক্তের চিহ্ন ফুটে বেরিয়েছে।

পাখা এলো, জল এলো। সরষের তেল গরম করে ফুলবানুর অবসন্ন হাত আর পায়ে মর্দন করতে করতে নতুন শক্তির সঞ্চার করতে লাগল রমিনা। আর এরই ফাঁকে ফাঁকে রমিনার স্পর্দ্ধিত বুকের উদ্ধত যৌবনের তরঙ্গ-কম্পনটা সন্ধানী দৃষ্টিতে কদর্যতা মাখিয়ে দেখতে দেখতে চনমন করে উঠতে লাগল জলিলউদ্দিন।

ফুলবানুর বিধ্বস্ত পেশীতে আবার নতুন উৎসাহের প্রবাহ এসেছে। তড়াক করে পাটাতনের ওপরকার রঙজ্বলা গালিচাটা থেকে লাফিয়ে উঠে খেউড়ের মধুবর্ষণ সুরু করল সে; "হারামজাদী বান্দী; এখনই, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যা।"

পাশ থেকে একটা মাটির সানকি হাতের ওপর তুলে নিয়ে নিভুর্ল তাক করল ফুলবানু।

একটা আর্ত চীৎকার করে উঠল রমিনা; "আমারে মাইরেন না বিবিজান, মাইরেন না। আমি আপনেগো কি করছি? তার থিকা আমারে আমার চাচাজানের কাছে পাঠাইয়া দ্যান?"

এই মুহূর্ত্তে পায়ের নীচের পাটাতনটা সরে গিয়ে সকলে যদি একসঙ্গে হুড়মুড় করে দোজখের অতলান্তে তলিয়ে যেত, তবু এতটা বিস্ময়ের কারণ থাকত না। বলে কি রমিনা! বান্দীর বোবা গলায় এ কোন তীক্ষ্ণতার শান পড়েছে!

"হারামজাদী; চাঁচাজানের কাছে যেতে চাও! কেনা বান্দীর আবার জিভের আগায় কথার খৈ ফুটেছে? তোকে আজ খুনই করব।"

ফুলবানুর শিরা উপশিরার তুর্কী রক্তে আদিম হত্যা ঝিলিক দিয়ে উঠবার আগেই একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। কোমরের ফিক ব্যাথাটা এমন বীররসের মুহূর্ত্তে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল। পাটাতনের ওপর একটা ছিন্ন সিঞ্জিনা লতার মত আছড়ে পড়ল ফুলবানু।

*   *   *   *   *   *

টক্ টক্ টক্। ভেজানো দরজার ওপর অভ্যস্ত পরিচয়ের টোকা পড়ল। নিভুর্ল সংকেত।

হ্যারিকেনটার চারপাশে একটা দম-দেওয়া লাট্টুর মত বৃত্তাকারে ঘুরপাক খেতে খেতে থমকে দাঁড়াল জলিলউদ্দিন। অস্থির মগজের মধ্যবিন্দুতে আহত অজগর ফণা আছড়াচ্ছে—ফুলবানু, রমিনা—একটু আগের ঘটনাটা বার বার ভাবনার কক্ষরেখা থেকে উল্কাপিণ্ডের মত ছিটকে ছিটকে পড়ছে কোথায় একদিকে।

টক্ টক্ টক্। দরজার ওপর করাঘাতটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে এবার। জলিলউদ্দিন চাপা গলায় বলল ; "আসুন আপনারা।"

জিনলোকের প্রেতদূতের মত কবর ফুঁড়ে যেন চারটে মানুষ উঠে এলো ঘরের ভেতর। উন্মুক্ত কপাটের তোরণপথে শ্রাবণী বাতাস হু হু উল্লাসের অধীরতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। এতক্ষণ রুদ্ধ কপাটের ওপর মাথা কুটে কুটে রক্তাক্ত হ'য়ে ফিরে গিয়েছিল তারা।

বাইরে তিমিরগর্ভ রাত্রি দিকচিহ্নহীন সমুদ্রের মত বিসারিত হয়ে রয়েছে। ঘরের ভেতর চুণীর দ্বীপের মত হ্যারিকেনের রক্তলাল শিখা।

জলিলউদ্দিন মুখ তুলল ; "তবে আপনারা এসেছেন।"

চারটে গলাই এতক্ষণ ওত পেতে ছিল। এই সুবর্ণসুযোগে একসঙ্গে সব ঝাঁপিয়ে পড়ল ; "আসবো না মানে ; আসার খবরই তো দিয়েছিলেন।"

"বেশ।"

চাপ দাড়ির ওপর বাৎসল্য প্রেমে হাত বুলাতে লাগল জলিলউদ্দিন।

চারজন। প্রথমজন আফজল হক, ইদিলপুরের নতুন মস্‌জিদের ইমাম সাহেব। দ্বিতীয়জন একাব্বর শিকদার, চিটাগাঙের বাজারে ধানের পাইকার। তৃতীয় ব্যক্তি আবদুল গণি, মক্তবের মৌলবী ; আর চতুর্থ জন কেরামত আলী, সোনারঙ আনসার পার্টির একনায়ক।

ইমাম সাহেব মাথার ওপর থেকে উদ্ধত কিরীটের মত লাল ফেজটা খুললেন ; সঙ্কুচিত সরীসৃপ ভ্রূ দুটোকে উদার-প্রসারিত করলেন ; "ভূইঞা সাহেব, ইস্‌লামের এই বেহেস্তে এখনও কাফের রয়েছে। এতে আল্লা রসুলের নামের অপমান হয়। পাকিস্তান হওয়ার তবে অর্থ কি ?"

হাবসী উচ্চারণের মত পরম পবিত্র শোনালো ইমাম সাহেবের আজান-দেওয়া কণ্ঠ।

"হুঁ।"

একটা গম্ভীর আওয়াজ ; যেন নাদধ্বনিটা নাভিমূল থেকে বেরিয়ে এলো জলিলউদ্দিনের। কাফেরের রক্তসমুদ্রে একদা ময়ূরপঙ্খী চালিয়ে বাইচ খেলার স্বর্গীয় বাসনা ছিল তার ; কিন্তু ইস্‌লামের পবিত্রতম ক্রোড়ভূমি থেকে তাদের একেবারে নির্মূল করা যায় নি এখনও। তা ছাড়া কয়েকদিন থেকে একটা স্বর্ণময় সম্ভাবনার বীজ উদ্ভাবনার স্নেহকোষে সযত্ন লালিত হ'য়ে সবে মাত্র অঙ্কুরিত হয়েছে। সকলের মুখের দিকে পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি বুলিয়ে নিল জলিলউদ্দিন।

"'হুঁ' নয় ভূইঞা সাহেব—ঠিক কথাই বলেছেন ইমাম সাহেব। বহুদিন আমরা কাফেরদের অত্যাচার সহ্য করেছি। এবার আমাদের পালা এসেছে—কোন বাড়তি লোক এখানে রাখবার ইচ্ছা নেই।"

বন্য ঘোড়ার মত তাজা জোয়ান কেরামত ; শিরায় শিরায় ফুটন্ত রক্তের উন্মাদনা। নবজাত পাকিস্তানের প্রথম সারির স্থিরব্রত সৈনিক। গলাটা তার প্রচণ্ড বিরক্তিতে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। আজাদের উদ্দীপনা লাভা-তরঙ্গের মত সরীসৃপ গতিতে শির শির করছে শরীরে। একটা কিছু করতে হবে। এতদিন নানা নিষেধের অবরোধে দুর্বার আত্মপ্রকাশটা দানবের মত বন্দী হয়েছিল, এবার সেটা মুক্তি পেয়েছে একটা অনাবৃত দিগন্তের দিকে।

কেরামত বললে; "আপনার কথামতই কাজ করছি ভূইঞা সাহেব। দাঙ্গার জন্য তৈরী হয়ে গিয়েছে সব ছেলে। এখন আর আট্‌কানো যাবে না এদের। একটা কিছু বেধে যেতে পারে যখন তখন।"

চোখ দুটো কক্ষবিচ্যুত নীহারিকার মত ধক ধক করে সকলের মুখের ওপর দিয়ে সরে গেল। হাতের মুঠো পাকিয়ে গেল। এই মুহূর্ত্তে একটা ভয়ানক কিছু করে ফেলতে পারে কেরামত ; তারই ইঙ্গিত বয়ে চলেছে কঠিন পেশী-তরঙ্গের নেপথ্যে।

অহিংস গলায় জলিলউদ্দিন বললে ; "না, না ঐ দাঙ্গা একেবারে বাধানো

ঠিক হবে না। পাকিস্তানের অর্থ তা নয় কেরামত। তবে দাঙ্গার ভয়টা রাখতে হবে ; যাতে এখানে কাফেররা নাদিনশাহী না চালাতে পারে।”

দুর্বিনীত বিস্ময়ে চোখের মণি দুটো যেন ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইল কেরামতের ; “কিন্তু আপনার কথা মত আমরা আজ সকালেই চিঠি দিয়েছি মাধব বাড়োরীকে।”

একটু চকিত হয়ে নড়ে চড়ে বসল বড় ভূইঞা জলিল উদ্দিন চৌধুরী; গেঁজের গোপনতম গ্রন্থি থেকে মাধব বাড়োরীর দেওয়া একশ’টা টাকা কোমরের অতি সতর্ক চামড়ার ওপর তীব্র স্পর্শের চমক সঞ্চারিত করছে। সকালের ঐ চিঠি, আর সন্ধ্যায় মাধব বাড়োরীর আশঙ্কিত আবির্ভাব—এই দুইয়ের আশ্চর্য যোগফল ঐ একশ’টা টাকা। না, এই নেপথ্যের স্বর্ণময় সম্ভাবনার সংবাদ মোটেই বলা যাবে না এদের সম্মুখে।

জিতেন্দ্রিয় পীরের গম্ভীর গলায় জলিলউদ্দিন বলল ; “হাঁ হাঁ—ঐ চিঠিই দিও; মাধব বাড়োরীকে দিয়েছ, এবার রসিক মুখুটিকে দাও, তবে দাঙ্গা-টাঙ্গা বড় খারাপ ব্যাপার।একেই তো আমাদের কেমন বদনাম কাফেরদের হিন্দুস্থানে।”

এর মধ্যে জটিলতম অঙ্কের নিভু́লতম সমাধান করে ফেলেছে জলিল-উদ্দিন। কেরামতদের ঐ চিঠির উদ্যত বল্লম প্রতিদিন তার বৈঠকখানায় অজস্র মাধব বাড়োরীদের আবির্ভাবকে নিশ্চিত করবে। আর মসৃণতম নিয়মে এদের অজগর দৃষ্টির সুদূর অন্তরালে তার গেঁজেতে প্রসন্ন নোটগুলো মোহন স্বপ্নের সৌরভ ছড়াতে থাকবে।

জবাব দিল না কেরামত ; শুধু দাঁতের ওপর দাঁতকে বিতৃষ্ণ কাঠিন্যে নামিয়ে দিয়ে একমনে দেওয়ালের গায় দৃষ্টিটাকে স্থির বিস্মিত করতে লাগল সে।

শ্রাবণরাত্রির তিমিরগর্ভ পটভূমিতে প্রলয় শব্দে একটা আগ্নেয়গিরি

বিদীর্ণ হ'ল যেন সহসা; ধানের পাইকার একাব্বর শিকদার এতক্ষণ একটা নির্লিপ্ত গো সাপের মত ঢুলছিল, মাঝে মাঝে হ্যারিকেনের ওপর মাথাটা মৃদু আনন্দে এসে এসে পড়ছিল তার। এই সর্ব্বপ্রথম শঙ্খচিলের মত কর্কশ গলার ওপর থেকে তোরণপথ উন্মুক্ত করল সে; "সবই তো শুনলাম মেঞা সাহেবরা, কিন্তুক এইদিকে কি সর্ব্বনাইশ্যা ব্যাপার হইতে আছে, সেই খেয়াল আছে কারো? সোনারঙের ঘাটে সেইদিন বড় ভূইঞার বিপক্ষে তার ভাইস্তা (ভাইপো) সব মাঝি চাষী খেপাইতে আছে। মহাজন আর বড় ভূইঞার বিপক্ষে জোট বান্‌তে (বাঁধতে) আছে শয়তানের ছাওরা। এইর বিহিত করেন আগে।"

"হুঁ।" এক অক্ষরের একটি হুঙ্কার বুদ্‌বুদের মত কোন অতলান্ত থেকে যেন উঠে এলো জলিলউদ্দিনের গলায়।

আবার সেই শঙ্খচিল-ডাকা কণ্ঠ; "খালি সেই কথা না। উর্দ্দুর বিপক্ষে ক্ষেপাইয়া তুলছে সকলটিরে। এইর ফল বড় মন্দো মেঞা সাহেবরা।"

এবার বজ্রগর্জন শোনা গেল জলিলউদ্দিনের গলায়; "মৌলবী সাহেব সহর থেকে খবর এসেছে উর্দ্দু ভাষা রাষ্ট্রভাষা হচ্ছে। মক্তবে উর্দ্দু ভাষা শেখাতে সুরু করবেন কাল থেকেই। বাঙ্‌লা ভাষা কাফেরের ভাষা; খাঁটি মুসলমানের বাচ্চা ও ভাষা বরদাস্ত করতে পারে না—ইমাম সাহেব এই কথাগুলো আজান দেওয়ার সময় বুঝিয়ে দেবেন আল্লা করিমের নামে। উর্দ্দু এলেই এ সব লোক-ক্ষ্যাপানো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। মনে থাকে যেন নমিনেশন্ পেতে হবে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের।"

এতক্ষণ একটা রোমশ কৃষ্ণ ভাল্লুকের মত থাবা পেতে বসে ছিল মৌলবী আবদুল গণি; এবার কৃতকৃতার্থ গলায় বলল; "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। সে কথা আর বলতে।"

এবার প্রসন্ন দৃষ্টিটা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কেরামতের ওপর; জলিল-

উদ্দিন বলে চলল ; "কেরামত তুমি জমায়েৎ ডেকে এই কথাটা বুঝিয়ে দাও ; ওরা যখন একজোট, তখন উর্দ্দু দিয়েই ভাঙতে হবে সব কিছু ; লড়াই সুরু এই উর্দ্দু দিয়েই।"

"কিন্তু বাঙলা ভাষা তো আমাদের বাপ-নানার ভাষা"—

একটু দ্বিধা। এই ঘরে যেখানে বড় ভূইঞার সমস্ত প্রস্তাবে মসৃণ স্বীকৃতিই নিয়ম, সেখানে এই প্রথম প্রতিবাদের কণ্ঠ ; এই প্রথম আপত্তির মৃদুগুঞ্জন। এই আপত্তি, এই প্রতিবাদের প্রথম প্রাণিত অঙ্কুরকে একটা কর্কশ থাবায় নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। অবলীন করে দিতে হবে মৃত্যুর যবনিকায়।

গম্ভীর গলা গম্ভীরতর হলো জলিলউদ্দিনের ; " 'কিন্তু' নয়। এ কায়েদে আজমের হুকুম। মনে রেখো তিনি পাকিস্তানের জন্মদাতা।"

কায়েদ—এ—আজম। মন্ত্রের মত একটি নাম। মুসলমানদের কবোষ্ণ রক্তে তারই কুহক বিস্তার। মন্ত্রের মতই কাজ করল কথা ক'টা। এক মুহূর্ত্তের দ্বিধা ; সমুদ্রবাতাসের প্রচণ্ড অভিঘাতে মসলিনের সূক্ষ্মতম পর্দ্দার মত মেঘটা খণ্ডবিচ্ছিন্ন হয়ে কোথায় একদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঋজু প্রতিজ্ঞা নেমে এসেছে পেশীতে ; অগ্নিগর্ভ শপথ জ্বলছে চোখে। কায়েদ-এ-আজমের আদেশ ; যাঁর একটি নির্দ্দেশে তুষারকবরী হিমালয়ের পাদপীঠ থেকে শ্বেতকমলের মত ফুটে ওঠা সিংহলের তরঙ্গমন্দ্রিত পটভূমি পর্যন্ত দশকোটি উদ্বেল ধমণীতে মৃত্যুশপথ সমুদ্রের মত গর্জ্জন করে ওঠে। কায়েদ-এ-আজম; দীন দুনিয়ার ইসলাম মিলনের একক প্রাণপুরুষ। যেন একটা অভ্রবিলেহী মূর্ত্তি, চারপাশে তাঁর অপরূপ জ্যোতির্বলয় নিয়ে দৃষ্টির সামনে দুলতে লাগলেন কেরামতের। নিশিতে পাওয়া মানুষের মত সম্মোহিত গলায় চীৎকার করে উঠল কেরামত; "ঠিক, ঠিক, কায়েদ-এ-আজমের হুকুম। আমি কাল থেকেই সুরু করবো কাজ। যারা এর বিরুদ্ধে, তারা পাকিস্তানের দুশ্‌মন। উর্দ্দু দিয়েই আমাদের কাজ আরম্ভ হবে।"

শ্রাবণের তিমিরাকাশ ইঙ্গিতময় মেঘে মেঘে ছেয়ে গিয়েছে। একটা নির্ভুল সংকেতে আগামী দুর্যোগের পূর্ব্বাভাষ কে যেন লিখে দিয়ে যাচ্ছে দিকচিহ্নহীন আকাশের শ্লেটে।

ঘরের ভেতর পাঁচ জোড়া চোখে হ্যারিকেনের শিখাটা প্রতিফলিত হয়ে চক্ চক্ করছে।

চার

ছোট চাষার ছেলে—কোথায় সাতপুরুষের আবাদী জমিতে শক্ত থাবায় ধারালো লাঙ্গলের ফলা চেপে ধরবে ; কি ফসলের প্রার্থনায় ঘাম ঝরানো পবিত্র পরিশ্রমে বীজধান ছড়িয়ে আসবে শ্বেতচন্দনের মত নরম মাটিতে। তা নয়, কোমল মুঠোয় খাগের কলম ধরে, সেই মক্তবে পড়ার দিনগুলো থেকেই মোরগডাকা প্রসন্ন সকাল থেকে শিয়ালডাকা নিস্তব্ধ ত্রিযামা পর্যন্ত অবিরাম কি যে লেখে আজম, সেই জানে। হিরণ্যশীর্ষ ধানের ক্ষেতে, দীঘাবাইল ধানের গুচ্ছে কাঁচির পোচ দিতে দিতে নিকারীদের রায়েবালি অবশ্য বলল; "তোমার পোলাটায় বড় গুণীন্ হইছে হে জিগিরালি চাচু ; ভারী মিঠা মিঠা কবির গান বান্ধে। সেই দিন নাপিত বাড়ীর কার্ত্তিক কইতে আছিল। কবে আইল দ্যাশে ? গেরামে বড় নাম করব হে।"

আরও কয়েকজন পুলকিত উৎসাহে সমর্থন জানালো সঙ্গে সঙ্গে; "ঠিক ঠিক। আমরাও শুনছি আজমের গান। সেইদিন কেরায়া ঘাটে গাইতে আছিল। ভারী মিঠা, ভারী সোন্দর।"

জিগিরালির গলায় তীব্র বিরক্তির উত্তাপটা আর চাপা রইল না। অনেকদিন ধরেই বুকের কোন একটা পরিষ্কার পটভূমিতে ক্ষোভটা টগ্‌বগ্‌

করছিল। বিকৃত একটা মুখভঙ্গি করে উঠল জিগিরালি; "আরে রাখ রাখ। তোমারেই জিগাই সানকিতে ভাত আসে কোথা থিকা? চাষার পোলা, ঐ সব সুখী ব্যারামে ধরলে খাইব কি? গান আর কিতাব কি আমাগো পোষায়? আমি আর কয়দিন বাচুম? তখন ঠ্যালাটা পাইব। থুইয়্যা দ্যাও অমুন গুণীন্ সিন্দুকে ভইর‍্যা।"

গজ্ গজ্ করতে করতে কোষ ডিঙিটার ওপর দীঘাবাইল ধানের স্বর্ণমঞ্জরি নির্ম্মমভাবে আছড়ে ফেলল জিগিরালি।

শ্রাবণ মাসের দুপুর। রৌদ্রঝকিত আউশের দিগন্তটার ওপর কনক-চাঁপা রঙের আলো দোল খেয়ে পড়েছে। দূরের ক্লান্তিবাতাস ঢেউ খেলে যাচ্ছে অরঘজ ধানের স্বর্ণমঞ্জরিতে, দোল খাচ্ছে খালের পারে নারকেল পাতার মর্ম্মরিত পুলকে। ধানের ক্ষেতের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া মরাল মিথুনের শুভ্র পাখায় ভেসে যাচ্ছে উল্লসিত বাতাসের সঙ্গীত।

কোমর সমান জলে দাঁড়িয়ে বুক সমান ধানবনে কাস্তে চালাতে চালাতে জিগিরালির ভাজা ভাজা তামাটে দেহটায় অজস্র ধারায় ঘামের ফোয়ারা নেমে এসেছে।

জিগিরালি বলল; "এইবার বাড়ীমুখি চল রায়েবালি, প্যাট্টা জ্বলতে আছে ক্ষিদায়; দেখ গিয়া তোমার গুণীনে এখন কবির গান বান্‌তে (বাঁধতে) আছে। ক্যান্, এট্টু ক্ষ্যাতের কাম করলে সোম্মানটা খোয়া যায় না কি? এট্টু লাঙ্গল কি কাচিটা ধরলে আমার কতখানি কামের আয় হয়, কও তো রায়েবালি। তুমিই কও, চাষার পোলার যত নবাবী রোগ।"

নিঃশব্দে মাথাটা একবার সামনে পেছনে দোলালো রায়েবালি।

শ্রাবণের কনকচাঁপা রঙের রোদ-লাগা আউশের প্রান্তরটা যাকে নিয়ে এতক্ষণ নানা ক্ষোভে আর অভিনন্দনে মুখর হয়ে ছিল, সে কিন্তু সে সময়

পরম নির্ব্বিকার। বাড়ীর পেছনে ঘন গাছগাছালির অরণ্যছায়ায় তখন ঘুঘুর নরম ডাকে শ্রাবণী দুপুর মেদুর হয়ে উঠেছে; মাথার ওপর বিন্যস্ত পত্র পুটের আচ্ছাদনে কোথায় যেন একটা তিতির পাখী অহেতুক আনন্দে ঘুঘুর গানের তালে তালে নেচে চলেছে।

সেখানে একটা ছেঁড়া পাটি বিছিয়ে আজম স্বপ্নাতুর দুটো তন্ময় চোখ ছড়িয়ে দিয়েছে একখানা পুরোনো মনসামঙ্গলের জীর্ণ পত্রশয্যায়। আজ সন্ধ্যায় সোনারঙের ঘাটে কেরায়া মাঝিরা ভাসানের গান শুনতে চেয়েছে, তার জন্যই এই একাগ্র প্রস্তুতিপর্ব্ব।

মাদারগাছের রক্তমঞ্জরী সামনের সুনীল অরণ্যশীর্ষে কুঙ্কুমচিহ্নের মত ফুটে রয়েছে; তার নীচে ক্ষুধার্ত্ত দেহটা একরকম তাড়িয়ে এনে আছড়ে ফেলল জিগিরালি। আজমের দিকে নজর পড়তেই চন্ করে রক্তটা একেবারে ব্রহ্মতালুতে লাফিয়ে উঠলো; "নবাবের ছাও বইস্যা বইস্যা কিতাব পইড়্যা আর কাগজ লেইখ্যা ভুর করলেই দিন যাইব আর কি? আমি আর কয়দিন বাচুম, ঠেলা কারে কয়, শিগ্গীরই টের পাইব্যা। কয়দিন ঠোটের আগায় এই গান থাকে তখন দেখব গেরামের মাইন্ষে।"

পাকের ঘরে মাটির পাতিলে লঙ্কারসুনের ঝাঁঝালো ছালুনে সম্বরা দিয়ে সে গুলো থেকে খানিকটা তেজ সংগ্রহ করে বাইরে বেরিয়ে এলো আজমের সৎ-মা। সেই তেজ বিস্ফোরণের মত প্রচণ্ড শব্দে বিদীর্ণ হয়ে বেরুল; "এত-কাল বাড়িত্ আছিল না বান্দীর ছাও, এখন আবার আইছে। মাগ্না এইখানে খাওন মিলবো না। ক্যান্, ঢপের দলের নন্দভূইমালী, তোর আর কোন নানায় এখন আসে না খাওয়াইতে? নটীর বাচ্চা শুওর।"

যাকে লক্ষ্য করে একটার পর একটা এতগুলো শব্দভেদী বাণ ছোঁড়া হ'ল সে কিন্তু পরম নিশ্চিন্তে মনসামঙ্গলের অতলতায় দৃষ্টিটাকে ডুবুরীর মত নামিয়ে দিয়েছে; কোনদিকে একবিন্দু বিচলিত ভ্রূক্ষেপ নেই।

আপাততঃ পেটের ভেতর ক্ষুধার ফণা হিংস্রভাবে আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে পড়ছে জিগিরালির ; মাথার ওপর সামান্য একটু সরষের তেল চাপিয়ে গজ্‌ গজ্‌ করতে করতে সোনারঙের খালের দিকে পা চালিয়ে দিল সে।

ভারী আহাম্মকি করে ফেলেছে জিগিরালি ; তার সমস্ত হিসেবী জীবনে একটা প্রচণ্ড বেহিসাবী ভুল হয়েছিল আজমকে দস্তখৎ শেখাবার জন্য মক্তবে পাঠিয়ে। তখন আজমের মা অর্থাৎ প্রথম পক্ষের জরুই ছিল তার ছোট পৃথিবীর বাদ্‌শাজাদী। কিন্তু চাষার ছেলে—দস্তখৎ করা, আর চিঠি লেখার বিদ্যাকে ছাপিয়ে এতখানি উজান বেয়ে এগিয়ে এসেছে, যে দিনরাত্রি বই কাগজে মুখ দিয়ে সংসারের বিরলশ্রী অভাবের দিকে চোখ তুলবার অবকাশই পায় না! মক্তবগুলো শুধু দস্তখৎ করতেই শেখায় না, আরো ভয়ঙ্কর কি যেন শেখায় ; যাতে চাষার ছেলে সংসার বিবাগী হয়ে কিনা কেতাবের মধ্যে সমুদ্রস্নান করে অষ্টপ্রহর। মোলবীরা কি মায়ামন্ত্রই গুঞ্জিত করেছে কানে, আজমই জানে ভালো। আপাততঃ এই ভয়াবহ সত্যটা আবিষ্কার করতে করতে অসংলগ্ন পদসঞ্চারে এগিয়ে চলল জিগিরালি।

জিগিরালি অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে সগৌরবে এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল রোশেনা—সৎ-মা। বারো বছর আগে এরই সান্‌কির আঘাতে কপালের ওপর জয়টীকা এঁকে ঢপের দলে পালিয়ে গিয়েছিল আজম। লঙ্কারসুনের বাঘা তেজ গলার ওপর কুণ্ডলিত হয়ে উঠল একসঙ্গে ; "হারামজাদা, পেত্নীর ছাও—ক্যান্ একমাল্লাই একখান নাও আছে। তাই লইয়া সোয়ারী বাইলেও তো দুইটা ট্যাকা ঘরে আসে। সেইবার সান্‌কি মাইর‍্যা খেদাইছিলাম, এইবার ছেন্ দা দিয়া কোপাইয়া খেদামু।"

পাকা জাফ্‌রাণী রঙের হলুদ পেষা হাতটা ঘন ঘন আন্দোলিত হতে লাগল রোশেনার। চোখদুটো লাল টক টকে—মতিহারী তামাকের আধিদৈবিক রসে রঙ্‌টা একেবারে চিরস্থায়ী করে নিয়েছে সে। আর সেই

দৃষ্টিতে একটা আসন্ন বিপর্যয় ঘনিয়ে আসতে সুরু করল। মুখ থেকে ভক্ ভক্ করে তামাকের একটি সৌরভ বেরিয়ে আসছে। পেটের ব্যারামের জন্য দশ বছর বয়স থেকেই রোশেনার একটা অপত্যস্নেহ জন্মেছে এর ওপর। সব সময় তামাক খাওয়া চাই।

ইন্দ্রিয়গুলো সহ্যের সীমান্তশেষে এসে এবার মৃদু বিদ্রোহ করে উঠল আজমের; "চুপ মার আম্মা, তুফার বেলায় চিল্লাচিল্লি কইরো না বুড়া খাসীটার লাখান (মত)। আমি কাইল থিকাই কেরায়া বামু।"

দৃষ্টিটা থেকে আর একঝলক তাজা অগ্নিবর্ষণ করে পাকের ঘরের দিকে চলে গেল রোশেনা।

প্রথম সেই জ্যোতির্ময় জগৎটার সন্ধান দিয়েছিল মনসুর—ভাইসাহেব। সোনারঙের কেরায়া ঘাটের আসরটা থেকে ফিরবার পথে অনেকদিন আগের সেই প্রথম রাত্রিটা রক্তের মধ্যে আজও বাঁশীর আচ্ছন্ন সুরের মত বেজে ওঠে আজমের। চার বছর পর বন্দরের মাটিতে প্রথম পদপাতের রাত্রিতে একটা আশ্চর্য আবেগের মায়াস্বাক্ষর আবিষ্ট স্নায়ুগুলোর ওপর আঁকা হয়েছিল। ভাইসাহেব, কেরায়া ঘাটে রহস্যময় সেই আসর, মশালের পিঙ্গল শিখার ওপর থেকে উড়ে যাওয়া কুণ্ডলিত ধোঁয়া, বাংলা ভাষার স্বপক্ষে অজস্র কণ্ঠে ভৈরব সিন্ধুগর্জ্জন—সবগুলোর অর্থ সেদিন বিশেষ পরিষ্কার ছিল না জ্বরদগ্ধ ইন্দ্রিয়গুলোর কাছে। কিন্তু একটু একটু করে অনেকগুলো রহস্যের সিংহদ্বার অতিক্রম করে দূরে একটা জ্যোতির্ময় আলোকমূর্ত্তির দেখা পেয়েছে আজম।

সেদিনের সেই কুহকভরা রাত্রিটার পর আরো অনেকবার দেখা হয়েছে মনসুরের সঙ্গে। স্বপ্নভরা উদাত্ত গলায় কথাগুলো উচ্চারণ করতে করতে সহসা কেমন যেন ভারী হয়ে আসত মনসুরের স্বরটা; "আমাদের সাহিত্য

পড় আজম। তুমি কবি। আমাদের বাঙ্‌লা ভাষা আমাদের সব চেয়ে বড় সম্পদ ; আমাদের বুকের রক্ত দিয়ে কত কাল ধরে এ ভাষার, এ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। কত কবি এসেছেন, কত কবি আসবেন। কত সাহিত্যিক কত নীরব সাধনায় একে উপচার দিয়ে গিয়েছেন। তুমি বুঝবে আজম, তুমি কবি। বাঙ্‌লা ভাষাটা শুধু হিন্দুদের ভাষা নয়, হিন্দু মুসলমান দুজনের রক্ত সমান লেগেছে এ ভাষা তৈরী হ'তে।"

ছন্দোময় অমৃতকণ্ঠ। চেতনার ওপর দিয়ে ছল ছল করে ঢেউএর মতো দোলা দিয়ে যায় এখনও। মনসুরের কথাগুলো সেই অস্পষ্ট সন্ধ্যার মতো কেমন যেন অজানা নেশার স্পন্দন ছড়িয়ে দিয়েছিল উচ্ছলিত রক্তের প্লাবনছন্দে।

দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে আজম। আজ ভাসানের গান শুনতে চেয়েছে কেরায়া মাঝিরা। আসর বসবে সেই ঘনপত্র বটগাছের স্নেহাচ্ছাদনের নীচে।

পথের দুপাশে আকাশু আর আকন্দঝোপের মাথায় মাথায় আবছায়া অন্ধকার নামতে সুরু করেছে। শ্রাবণ সন্ধ্যার আকাশগঙ্গায় তারার চন্দ্রমল্লিকাগুলো বাসরশয্যা রচনা করেছে। কাল রাত্রিতে বর্ষণক্লান্তির পর আজ বিষণ্ণ মেঘের ছায়াভাস নেই কোথাও একটু। লাটার ঝোপে ঝিঁ ঝিঁর নূপুর বেজে চলেছে একটানা ; একটা অদৃশ্য একতারার মীড়ে রিণ রিণ করে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে মায়াবী শ্রাবণ-সন্ধ্যা।

মনসুরের কথাগুলো এখনও ঝম্ ঝম্ করছে বুকের ভেতর ঘূর্ণিত রক্তের ছন্দে ; "কিন্তু যারা এই ভাষার গলা টিপতে চাইছে, হত্যা করতে চাইছে আমাদের আবহমানকাল থেকে এই পূর্ব্বপুরুষের পবিত্র সাধনাকে, তাদের আমরা কিছুতেই ক্ষমা করবো না। সেদিন যদি আমাদের প্রাণও দিতে

হয়, তার জন্য প্রস্তুত থাকবো। এই কথা ক'টা মানুষগুলোকে বুঝিয়ে দাও আজম। আমার ভাষা ওরা বোঝে না আজম, সন্দেহ করে। এ ভার তুমি নাও—তুমি ওদের কবিদার আজম, এদিনে যেন তোমরা পিছিয়ে থেকো না।"

মনস্থরের শেষ কথাগুলো দুর্বোধ্য হয়ে এসেছিল আজমের কাছে। প্রাণ দিতে হবে কেন? কেন এই মৃত্যুর অকুণ্ঠিত সংকেত? কী একটা কুহেলিভরা বিপদের ছায়াসঞ্চার যেন কেন্দ্রিত হয়ে রয়েছে মনস্থরের কথাগুলোর মধ্যে।

সেই রহস্যময় মানুষটার অনেক পরিচয় জানা হয়ে গিয়েছে। মনস্থর আলি—তাদের সকলের ভাইসাহেব। বড়ভূইঞা জলিলউদ্দিন চৌধুরীর ভাইএর ছেলে। মস্ত বড় পণ্ডিত মানুষ। সোনারঙের খেয়া পেরিয়ে রোজ ঢাকায় চলে যায় পড়াশুনা করতে। মক্তব, তারও পর হাই স্কুল, কলেজের নামটাও পরিষ্কার শুনেছে আজম; সে সব মন্থন করে সমস্ত বিদ্যার অমৃত তুলে নিয়েছে মনস্থর। এখন কোথায় পড়তে যায়, তা অবশ্য বলতে পারবে না আজম। অতবড় বিদ্বান মানুষটা তাকে বার বার শ্রদ্ধা জানিয়েছে, কবি বলে সম্বোধন করেছে; পাশা পাশি চলতে চলতে স্নায়ুগুলো কেমন যেন সঙ্কুচিত হ'য়ে আসছিল আজমের।

মনস্থরকে দেখলেই একটা স্নিগ্ধ শ্রদ্ধায় মনটা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে চেতনার সমুদ্রে রক্তসূর্যের ঝলক দিয়ে ওঠে নোয়াখালির সেই রাত্রিটা। নন্দ ভূঁইমালীর ঢপের দলে কৃষ্ণের পালা গাইত আজম—একদিন সেই দলটাই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল।

চন্দ্রাবলীর ভূমিকায় সবে মাত্র নন্দ ভূঁইমালীর ললিত কণ্ঠটা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে, আর তখনই একটা শাণিত বল্লমের ফলা কোথা থেকে যেন বুক বিদীর্ণ করে সমস্ত আসরটাকে রক্তস্নান করিয়ে দিয়েছিল। নন্দ ভূঁইমালীর

আকাশ-ফাটানো চীৎকারের মধ্যে সব চেয়ে বীভৎস সত্যটা প্রকটিত হয়ে উঠেছিল ; "দাঙ্গা বান্‌ছে (বেঁধেছে) ।"

বার বার মনে পড়ে, শ্রোতারা উঠানে প্রসারিত হোগ্‌লার ওপর বসে তন্ময় হয়ে গান শুনছিল, কোন এক জলধর বারুইর ছোট শালা বার বার হুঁকোটা ঠেকাচ্ছিল ইদ্রিস মিঞার নাতিটার মুখে ; পাশা পাশি ঘুমভরা চোখ নিয়ে ঢুলছিল ফারুক আর রসময় নাপিত। সকলের বিক্ষিপ্ত পলায়ন ; তারপর বারুইদের ময়ূরমুখী টিনের চালে হিস্ হিস্ করে উঠেছিল একটা লেলিহ আগুনের ফণা, আর তারই আলোতে অনেকগুলো প্রেতমূর্ত্তির মত মানুষের মুঠোতে রক্তপায়ী বল্লমগুলো রক্ততৃষ্ণায় ঝক্‌মক্ করে উঠেছিল।

ঢপের আসর থেকে কৃষ্ণের মোহন সজ্জায় খেয়াঘাটের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে টের পেয়েছিল আজম ; বুকের কোন একটা কোমলতম পটভূমি রক্তনখের আঁচড়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে তার। নন্দ ভূঁইমালীই তাকে দিয়েছিল গানের গলা, দিয়েছিল অভিনয়ের মাদকতা-ভরা শিল্প। বল্লমটা তার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে আজমকেও যেন স্পর্শ করেছিল এক মুহূর্ত্তে।

নোয়াখালির বারুই বাড়ীর আগুন অনুকূল বাতাসে প্রক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল জলবাঙ্‌লার সহস্র সহস্র গ্রাম-জনপদে, হেউলিফুলে আলো করা রূপালী বালুচরে। কিন্তু তাদের এই ছোট্ট নগণ্য সোনারঙের ওপর শান্তির বিরাটতম পক্ষপুট বিস্তার করে রেখেছিল মনসুর ; অন্য গ্রামের দোজখ থেকে কোন কলঙ্কিত রক্তস্পর্শ কি আগুনের উত্তাপ এতটুকু লাগতে দেয় নি এখানকার শ্বেতচন্দন ভূমিতে। দাঙ্গা এই সামান্য জনপদটা এড়িয়ে ক্রুদ্ধ আক্রোশে আছড়ে পড়েছিল সাভারে—হাসাড়ায়—দেলভোগে; আরো কত গঞ্জ-বন্দরে। সেই মানুষ মনসুর, তাকে কবির স্বীকৃতি দিয়েছে। আড়ষ্ট গলায় ফিস্ ফিস্ করে উঠেছিল আজম ; "আমি যে লিখা পড়া কিছু জানি না ভাইসাহেব।"

একটু আগের উত্তেজিত কণ্ঠটা একটা উদার কোমলতায় ভরে গিয়েছিল মনস্থরের, মিষ্টি করে হেসে বলেছিল; "তুমি তো গান বাঁধ, আমি শুনেছি সব। দেশের কথা, মানুষের কথা মানুষের কাছে বলতে পার না? গান বেঁধে বেঁধে তাদের না খাওয়ার কথা, তাদের গলায় দড়ি দিয়ে মরার কথা লিখতে পার না? সবার ওপরে রয়েছে বাঙ্‌লাভাষা, যা দিয়ে গান বাঁধবে, তাকেই হত্যা করতে চাইছে বখিলেরা। তুমি কবিদার, গান গেয়ে দেশে আগুন জ্বালিয়ে দাও, পাকিস্তান থেকে সব আবর্জ্জনা পুড়ে যাক ছারখার হয়ে। পাকিস্তানকে সুন্দর করে তুলতে হবে—তার দায়িত্ব তোমাদের হাতে।"

গান সে বাঁধে বৈ কি! পদ্মপুরাণের ঢঙে কি ময়নাবিবির ছড়ার ছন্দে গান রচনা করেছে; তারপর ঢপের দলে জলবাঙ্‌লার অবারিত দিগন্তে দিগন্তে পরিক্রমা করতে করতে বাতাস ঢেউএর আকুলিত বাজ্‌নার সঙ্গে উদাত্ত গলায় গান ধরেছে। পাশ দিয়ে চলে যাওয়া ইল্‌সাডিঙি থেকে জেলেমাঝির প্রসন্ন অভিনন্দন এসেছে সঙ্গে সঙ্গে; "ভাল কইর‍্যা ধর দেখি ভাই গান, খাড়াও তামুক (তামাক) ধরাইয়্যা লই এক ছিলুম। ভারী মিঠা, গলায় এতও মধু আল্লায় দিছিল তোমারে কবিদার!"

মাঝে মাঝে দেশে এসে বাড়োরী বাড়ীর ঠাইনর্দিদি কি সোনারঙের কেরায়া ঘাটে যখন শান্ত আচ্ছন্ন সন্ধ্যা নামতো তখন সুর করে করে কৃষ্ণ-লীলার পালা গাইত। খ্যাতির একটা বিচিত্র মহাদেশ তার জন্য পরিপ্লাবিত হয়ে রয়েছে এই পদ্মা মেঘ্‌নার পারে পারে।

ঐ গান গুলো লিখতে লিখতে কি ময়নামতীর ছড়া পড়তে পড়তে ঘন নেশায় মনটা যেন মাতাল হয়ে ওঠে আজমের। তবু, তবু মনস্থরের কথাগুলো শুনতে শুনতে মাথাটা নীচের দিকে নেমে গিয়েছিল। একটা রক্তিম লজ্জার আবরণ যেন একরাশ ঝক্‌ঝকে সূর্যের নগ্ন আলোর সাম্‌নে একটানে সরিয়ে দিয়েছে মনস্থর। সে কবিদার—বলে কি মনস্থর!

মনসুর আরও বলেছিল, একটা বেদনার জলতরঙ্গ যেন আশ্চর্য স্পন্দনের মীড়ে মীড়ে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল তার কণ্ঠে ; "ওরা গরীব মানুষের ঘর থেকে তো ভাত সরিয়ে নিয়েছেই, এবার এতদিনের সেই বাজান নানার ভাষাটাও কেড়ে নিতে চাইছে ঠোঁট থেকে। কিন্তু শরীরে শেষ রক্তকণাটা থাকা পর্যন্ত তা আমরা হ'তে দেব না। আজম—তুমি কবিদার, তুমি পার না দেশের লোককে জানিয়ে দিতে যে, তাদের মুখের ভাষা, তাদের পরিচয় ছিঁড়ে নিতে চাইছে ইব্‌লিশেরা ! পাকিস্তানকে ভেঙে চুরমার করতে চাইছে।"

মনসুরের কথাগুলো শুনতে শুনতে সোনারঙের খালের ওপাশে ছোট টিলাটার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আজমের হৃৎপিণ্ডটা অনেকবারই বিচিত্রভাবে নাড়া খেয়ে উঠেছিল।

চার'পাশের অন্ধকার তরল কালির মত ছড়িয়ে পড়েছে। মাথার ওপর অর্জ্জুন গাছের অস্পষ্ট প্রশাখা থেকে একটা কাল পেঁচা কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল। চমকে হন্ হন্ করে এগিয়ে চলল আজম। এক প্রহর রাত্রির পরমায়ু এতক্ষণে সমাপ্ত হয়েছে—এতক্ষণ সাগ্রহ প্রতীক্ষার পর সোনারঙের কেরায়া মাঝিরা নিশ্চয়ই অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে।

তবু সেই জ্বরমগ্ন অস্বাভাবিক চেতনার রাত্রিটা থেকে তার সমস্ত স্নেহকোষে মাধুরীমান অনুভূতির মত মনসুর যেন জড়িয়ে গিয়েছে, তার কথাগুলো শুনতে শুনতে একটা পরম পবিত্র সমুদ্রস্নানের আস্বাদ পায় আজম। সে কবিদার, বাণীর বরপুত্রের কাছ থেকে সেই প্রথম স্বীকৃতি পেয়েছিল সে ; স্বীকৃতি পেয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দিগন্তটার কাছ থেকে। বাজানের বিরক্তিকর গজরানিকে সেই রাত্রি থেকে আর পরোয়া নেই আজমের। হাঁ সে গান বাঁধবে, পালা রচনা করবে।

সেদিন রাত্রির সেই রহস্যময় পথটা ধীরে ধীরে একটা আলোকময় জগতের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছে আজমকে। আজ অনেক পরিষ্কার হ'য়ে

সাম্‌নে এসে স্থির হয়েছে মনস্থরের কুয়াশাভরা কথাগুলো। মনস্থর এর মধ্যে তাকে অনেকগুলো বই পড়তে দিয়েছিল—পদ্মপুরাণ, চণ্ডীমঙ্গল, ময়মনসিংহ-গীতিকা, তার ওপর মেঘনাদবধ, রৈবতক, পলাশীর যুদ্ধ। ধীরে ধীরে অপূর্ব্ব রহস্যের কুয়াশাঘেরা জগৎটা দরজা খুলে দিয়েছে আজমের দৃষ্টিদীপের সম্মুখে।

আজম সোনারঙের খালটা বাঁয়ে রেখে ফসলপ্লাবিত প্রান্তরটার পাশে পাশে এগিয়েচলা জেলা বোর্ডের সড়কটা ধরে এগিয়ে চলল কেরায়া ঘাটে। আজ বেহুলার গান গাইবার আমন্ত্রণ রয়েছে সেখানে। ক'টা দিন ধরে রাত জেগে জেগে গানগুলোকে মিষ্টি গলার ওপর তুলে নিয়েছে আজম—বেহুলা-লখাইর কথা পড়তে বড় ভাল লাগে তার, তন্ময় হ'য়ে ললিত বিন্যাসে লীলায়িত পদগুলো আবৃত্তি করতে করতে মাতন লাগে কণ্ঠে। বিজয় গুপ্তের একখানা ছেঁড়া পুঁথি জোগাড় করেছে কোথা থেকে যেন—রোজ কিছুটা পড়বার পর কপালে হাত ঠেকিয়ে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানায় পূর্ব্বসূরীর উদ্দেশে। তার এই জলের দেশকে তারই ঠোঁটের ভাষা দিয়ে কি অপরূপভাবেই না ছন্দিত করে গিয়েছেন কবি; ভাবতে ভাবতে আশ্চর্য হয়ে যায় আজম। তাঁরই অনুসরণে আজ গান রচনা করেছে সে।

সন্ধ্যার আসরে কেরায়া মাঝিরা জমায়েৎ হ'ল; পারের ভাগচাষী, বর্গাকৃষাণ আর পথচল্‌তি হাটুরে মানুষ এসে ঘন হয়ে বসল পাশাপাশি। মানুষগুলোর বৃত্তে কেন্দ্রবিন্দুর মত বসেছে আজম।

একবছর আগেও তার এই সশ্রদ্ধ আসনটা নির্দিষ্ট ছিল রসিক ঢালীর জন্য। স্বাধীনতা পাওয়ার পর একটা নগণ্য পরমাণুর মত কোথায় যেন বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে আজ রসিক। অগ্রপুরুষকে উদ্দেশ করে মনে মনে একটি কম্পিত প্রণাম ভাসিয়ে দিল আজম, উড়িয়ে দিল অনেক দূরের অজানা দিকচক্রে, শ্রাবণী বাতাসের উচ্ছলিত আবেদনে।

সেই পিঙ্গলাভ মশাল, সেই মানুষের বৃত্ত, সেই শ্রদ্ধাবান আগ্রহ; কোন কিছুর বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নি। শুধু নৌকার ওপর থেকে আসরটা উঠে এসেছে বংশীবটের পত্রবিস্তারের নীচে, জলের তরল অস্থিরতা থেকে মাটির শক্তকঠিন আশ্রয়ের ভিত্তিভূমি খুঁজে নিয়েছে।

একসময় মিষ্টি গুঞ্জনের মধ্য দিয়ে আজমের কণ্ঠে নতুন রচনা করা বিষহরির গানটা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল—

'একটুখানি ছিদ্র আছে লোহার বাসর ঘরে,
কাল শঙ্খিনী সূতা হইয়া ভিতরে প্রবেশ করে,
পিরদীমের শইলত্যা খান মাথা কুইট্যা মরে,
রে বিধির কি হইল
পিরদীমের শইলত্যাখান থরথরাইয়্যা কাঁপে,
বেউল্যা সতী কান্দে শোন বিষহরীর শাপে,
রাইত পোহাইলে লখাই শোবে ভেলার পালঙ্কেতে,
রে বিধির কি হইল!'

গান থেমে গিয়েছে অনেকক্ষণ, কিন্তু একটা অদৃশ্য মূর্চ্ছনা ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত পটভূমিটায়। পুরোনো কাহিনী, পুরোনো ভাষা, বহুবার শোনা হয়েছে; তবু শ্রোতাদের দৃষ্টিপ্রদীপগুলোর ওপর বেদনার কুয়াশা নেমে এসেছে।

কী ভাব, কী ছন্দ আর কী অপূর্ব্ব এই মহাভাষা, আর তাকেই কিনা রক্তাক্ত থাবা বসিয়ে হত্যা করতে চাইছে কারা যেন। মনসুর বলেছিল, তাকে ঢাকা সহরে নিয়ে দেখিয়ে দেবে, বুঝিয়ে দেবে এ কাদের কারসাজি; কারা মুখের গ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভাষাকেও নিঙড়ে নিতে চাইছে!

আজম সেই মন্ত্রমুগ্ধ মানুষগুলোর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নিস্তব্ধ হ'য়ে

বসেছিল ; সহসা গভীর গলায় বলে উঠল ; "শোন সব, বাঙ্লা ভাষায় আমাগো আর কথা কইতে দিব না ওরা। এই গানও গাইতে দিব না।"

"সেই দিন ভাইসাহেব কইতে আছিল এই কথা। ক' দেখি কারা দিব না ? হিন্দুরা ?" অনেকগুলো গলা গর্জ্জে উঠল সমস্বরে।

"না।"

"তবে কারা ? নাম কও। আমাগো বাজান নানার ভাষায় কথা কইমু না তো, কইমু কোন্ ভাষায় ? ক্ষিদায় জ্বইল্যা পুইড়্যা মরি তিন দিন, তাও সয়। কিন্তুক্ দুঃখুর কথাটা যদি না কইতে পারি তো তাজাই মইর‍্যা থাকুম ; বাজান নানার ভাষায় হাইস্যা (হেসে) কথা না কইলাম, এট্টু কাঁদতেও যদি না পারি, তবে কি করণ ? গায়ে মাইন্‌ষের রক্ত থাকতে এই অন্যায় সমু (সহ্য করব) না আজম ভাই।"

হিংস্রতম উত্তেজনায় ঝক্‌মক্ করতে থাকে আবদুলাপুরের ইত্তিমালি।

ইল্‌সা ডিঙির মাঝি হাজিরদ্দি বলল ; "কোন শালায় এমুন সব্বনাইশ্যা মস্করা করতে চায়, দেখি এক ফির।"

নামটা জানা নেই আজমের। মনসুর বলেনি এখনও। শুধু একটা অনিবার্য কালবৈশাখীর আভাস দিয়েছে মাত্র। এবার মনসুরের কথাগুলোর নির্ভুল প্রতিধ্বনি করল আজম ; "এর জন্যে প্রেয়োজন হইলে জানও দিতে হইতে পারে ভাইরা। বাঙ্লার বদলা কী একটা বিজাত ভাষা না কী শিখতে লাগবো। ভাইসাহেব কইল।"

"না না, বাজান নানার চৈদ্দ পুরুষের ভাষা থুইয়্যা অন্য কিছুতে আমরা কথা কইতে পারুম না আজম ভাই। বুকের রক্ত দিতে হয়, তাও রাজী। তোমার মুখের সখীসোনার গান, মনসার গান, ময়নামতীর গান না শুইন্যা পারুম না। কী অন্যায় কথা কও দেখি এইটা !" মেঘ্‌নার তরঙ্গক্ষিপ্ত স্রোতের মত বুড়ো মাঝি হাজিরদ্দির গলাটা গর্জন করে উঠল।

আর একটি গলা থেকে বিস্ফোরণ উৎক্ষিপ্ত হ'ল ; "দ্যাশ ভাগ হইতে হিন্দু ভাইরা গেল গিয়া বুকের বল হারাইলাম ; এই বার মুখের ভাষা হারাইয়্যা একেবারে মরুম না কী ? কখনই না। এই কথা আমরা মাঝিরা, জাইলরা (জেলেরা) চরে চরে, গেরামে গেরামে কইয়া আইছি। কেউই বাজান নানার ভাষা ছাড়ব না—সিধা কইয়া দিছে।"

কে যেন বলে ; "ঐ সবে কাম নাই। আমরা সাফ নামটা শোনতে চাই ; কোন সুমুন্দির পুতেরা এমুন তামাসা সুরু করছে ? ভাইসাহেবের কাছ থিকা নামটা খালি জাইন্যা আইসো আজম ভাই। আর কইও আমরা কী করুম ?"

থম্ থম্ করতে লাগল মেঘ্‌নাপারের বীর্যবান পটভূমিটা। একটা অশুভ দুর্যোগের কুটিলগর্ভ অগ্রসূচনা দেখা দিয়েছে এই নিষ্কলঙ্ক মানুষগুলোর এতদিনের শান্তশুভ্র আকাশের অবারিত দিগন্তশীর্ষে।

পাঁচ

মক্তবের সন্ত্রস্ত প্রহরগুলিতে বিজয় গৌরবে রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিল মৌলবী আবদুল গণি। বরিশাল জেলার মানুষ, শায়েস্তাবাদের নদীর পারে দেশ। এখানে কাজ নিয়ে এসেছে মাস আষ্টেক আগে। পাকিস্তানের একজন স্থিরব্রত যোদ্ধা, কায়েদে-এ-আজমের প্রতি নিষ্ঠাবান শ্রদ্ধার মধ্যে আত্ম-প্রেরণার সন্ধান করে।

টিনের চালায় মক্তব বসে। চারপাশে ভাদ্রের খরযৌবন বর্ষা থৈ থৈ করছে ; পদ্মা-মেঘ্‌না-কালাবদর থেকে দুর্ব্বার বেগে হু হু করে জল ছুটে এসেছে ; আবদুলাপুর-আটপাড়া-বজ্রযোগিনীর খাল-বিল আর রেখাগণ্ডির

মানচিত্রে-ভরা আউশ-আমনের প্রান্তর ভাসিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে চক্ররেখার পরপারে ; বেগমগঞ্জ, কমলাঘাটের দিকে।

সবুজ কাচের মত স্বচ্ছ জলে নীল ছায়া ফেলেছে নলখুড়ি ফুল ; বালিহাঁসের ধূসর পাখায় ছেঁড়া ছেঁড়া কাশফুলের মত মেঘ কাঁপে। কুরুবক আর ঝান্টি ফুলে আলো হ'য়ে গিয়েছে আদিগন্ত জলবিস্তার। আকাশের শূন্যতায় চুণীর মালার মত উড়ে যায় 'ইম্‌লি' পাখীর ঝাঁক। হোগলা বনে ফল পেকেছে, হোগলগুড়ি কোটার সময় এখন। বেতঝোপ স্বাস্থ্যের হাসিতে ঝলমল করে, সরস বেতের ডগাগুলো আত্মপ্রসার করে চলেছে। দূরে 'ভেসাল' এর বাঁশে খয়ের রঙের শঙ্খচিল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে ; টিট্টিহি—টিট্টিহি—। ঝুঁকে-পড়া হিজল-বউন্যার ডালে উঠে কালিকচ্ছপ চক্ষু বুজে রোদের ধ্যান সুরু করেছে।

জলের ওপর উদ্ধত মাথা তুলে দিয়েছে মেঘবরণ আমন ধান, মাঝে মাঝে শেষ আউশের ইতস্ততঃ সোনালী ছোপ। এরই মধ্যে একটা শ্বেতকমলের মত ফুটে রয়েছে গণি মৌলবীর মক্তবটা।

এখন থৈ থৈ জলের অবারিত সমুদ্র। অথচ খরদীপ্ত চৈত্র বৈশাখে এই মাঠ প্রান্তর অগ্নিনেত্র বীরাচারীর ক্রোধে ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল ; হল্‌দে রঙের ঘাসের ভস্ম থেকে তৃষিত দীর্ঘশ্বাস কুণ্ডলিত হয়ে উঠে গিয়েছিল আকাশে। মেঘকজ্জলিত বর্ষার জন্য একটা আর্ত প্রার্থনা আকুলিত হয়ে উঠেছিল আগুনজ্বলা বাতাসে বাতাসে। কুঁজিকাঁটা আর গরুর হাড়ে আকীর্ণ রুক্ষডাঙার শবদেহে বসে মরা ফণীমনসার করোটিকঙ্কালে রোদের আসব নিয়ে সেই তান্ত্রিকের ভয়াল তপস্যা শেষ হ'ল। মেঘে মেঘে ছেয়ে-যাওয়া আষাঢ়ের আকাশ থেকে নেমে এলো আশীর্ব্বাণী, নির্বারিত ধারাবর্ষণ। লাঙলের ফালে ফালে আর বৃষ্টির সঞ্জীবনী স্পর্শে পাথরের মত শক্ত মাটির চাঙাড় পাত ক্ষীরের মত নরম হ'য়ে গেল।

ঢেউ খেলে যাওয়া জলগুণ্ঠিত প্রান্তরের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা উদাস হ'য়ে দিকচক্রের নিঃসীমে উধাও হয়েছিল। স্কুলে পড়ার সময় সেই ক'টা কবিতার ললিত চরণ নিজের অজান্তে লঘু চঞ্চল পদক্ষেপে নেচে চলল রক্তে রক্তে। 'পরপারে দেখি আঁকা, তরু ছায়া মসীমাখা, গ্রামখানি মেঘে ঢাকা—।'

একটা প্রচণ্ড ধমক খেয়ে নিজের সতর্ক সত্তায় ফিরে এলো গণি মৌলবী; একটা নিষ্করুণ অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হয়ে গেল সমস্ত মনটা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—দ্বিজশুভ্র কবি। শুধু কাফের নয়; কাফেরদের মধ্যে আবার উত্তম পুরুষ। কোন কোমল ভাবালুতা নয়; দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের শূন্য আত্ম-বিলাসের মুহূর্ত্তও নেই একটি। সামনে একটি কর্ত্তব্য; ধ্রুবতারার মত একটি লক্ষ্য এবং মাত্র একটিই দিশারী। দূরাগত সমুদ্রগর্জ্জনের মত সেই একটি মাত্র শব্দ শোনা যায় সমস্ত অনুভূতিতে—উর্দ্দু ভাষা! কায়েদ-এ-আজমের নির্দ্দেশ। অসীম বিরক্তিতে পরপারের ধূ ধূ নীল মায়া রেখা থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে এলো কামরার ভেতর; কদমফুলের রোঁয়ার মত দাড়িতে ছেয়ে যাওয়া মুখটা থেকে শিয়ালের মত খ্যাঁক খ্যাঁক আওয়াজটা যেন তাড়া করে এলো; "এই কাদের, বাজানের কাছে বলেছিলি নয়া আরবী আর উর্দ্দু বই কিনে দেবার কথা? কি রে?"

"না।" উঠে দাঁড়ালো কাদের; মৃতের মত নিরুত্তাপ শীতলতা নেমে এলো মুখের ওপর।

"কেন?"

পরম উত্তেজনায় হ্রস্ব গলাটা অতিকায় গিন্নি-শকুনের মত বাড়িয়ে দিল আবদুল গণি।

"বাজানে কইছে ঐ বিজাত বই পড়নের কাম নাই। ঐ সব পড়লে আর মক্তবে আসতে দিব না।"

"নাম কি তোর বাজানের ?" অপমানে কালো মুখখানা থেকে গণি মৌলবীর সমস্ত রক্ত যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে, মনে হলো।

"বাজানের নাম হাজিরদ্দি মাঝি। সোনারঙের ঘাটে ইল্‌সা ডিঙ্গি বায়।" একটা জবাই-আসন্ন নির্ব্বোধ পশুর মত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে সুরু করেছে কাদের।

অগ্নিগর্ভ গলায় গর্জ্জন করে উঠল গণি মৌলবী ; "বোস তুই।" দৃষ্টিটা কুটিল সন্দেহের বিষে ছেয়ে গেল একমুহূর্ত্তে।

একে একে অনেকগুলো ছেলের ওপর দিয়ে প্রলয়পর্ব্ব বয়ে গেল। রোস্তম, ওসমান, ইয়াছিন, আবজল, কুট্টি, এমনি অনেক। সকলের অপহৃত কণ্ঠে একই মসৃণ উত্তরের কম্পিত পুনরাবৃত্তি। দৃষ্টিটায় হোগলা বনের ক্ষুধার্ত বাঘের চোখের সবুজ আগুন জ্বলছে গণি মৌলবীর। অনেকগুলো বাজানের নাম জানা হয়েছে—হাজিরদ্দি, ইত্তিমালি, আজাহার, কাসেম আলি। মানুষগুলোর বদলে মুখের মধ্যে কড়মড় করে নামগুলোই চিবাতে লাগল গণি মৌলবী।

বড় ভূঁইঞার বৈঠকখানা ঘরে আগেই খবরটা নিয়ে চিলের মত ছোঁ দিয়ে এসে পড়েছিল ধানের পাইকার একাব্বর শিকদার। নামগুলো নির্ভুল মিলে যাচ্ছে।

মনসুর—বড় ভূইঞা সাহেবের ভাইএর ছেলে। চম্‌কে উঠল গণি মৌলবী। এই নামগুলোর পেছনে সেই-ই নিশ্চয় দাবাগ্নি ছড়াচ্ছে ; ছড়িয়ে দিয়েছে আসন্ন বিস্ফোরণের ভয়াবহ প্রস্তুতি। বাতাসে যেন অগ্নিমুখী বারুদের গন্ধ পাওয়া যেতে সুরু করেছে ইতিমধ্যে। দাঁতের ওপর দাঁত চাপল আবদুল গণি।

শঙ্খচিল-ডাকা দূরের 'ভেসাল' বাঁশের কাছে একটা কালো বিন্দুর

মত ভেসে উঠল কোষ নাওটা। একদৃষ্টিতেই পরিষ্কার চিনে ফেলল গণি মৌলবী। ভূইঞা বাড়ীর বান্দা—হাসেম। ভ্রূদুটো পুলকিত উল্লাসে প্রসারিত হয়ে গেল মৌলবীর।

আউশ-আমনের চকের ওপর মূলি বাঁশের লগি ঠেলতে ঠেলতে একসময় সামনের মান্দার গাছের ডালে নাওটা বেঁধে ওপরে উঠে এলো হাসেম।

"কি রে হাসেম, কী ব্যাপার? বোস বোস।"

একরাশ দাক্ষিণ্য উপচে পড়ল কণ্ঠ থেকে।

গামছা পেতে ভিজে মাটির ওপর বসে পড়ল হাসেম; "মৌলবী সাহেব, ভূইঞা সাহেব একবার আপনেরে যাইতে কইছে আমার লগে। আজাদীর দিন, না কী বলে একটা আছে পরশু দিন। হেই লইয়্যা কথা কইব আপনের লগে। এখন আবার যাইতে হইব ইমাম সাহেবের কাছে।"

গণি মৌলবীর দৃষ্টিটা তীব্রগামী একটা তীরের মত দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের পাতায় এসে বিঁধে গেল। চোদ্দই আগষ্ট—আজাদীর ইতিহাসে একটি রক্ত লাল তারিখ। আগামী পরশুই সেই পবিত্রতম দিন।

চোখের সাম্‌নে দিয়ে ফর্ ফর্ করে উড়ে গেল কতকগুলো হৃতগৌরব দিনের অগ্নিপত্র। অনেক গ্লানি, অনেক অপমান, অনেক অত্যাচারে অগ্নিশুদ্ধ হ'য়ে আজকের এই পাকিস্তান। সংগ্রাম করতে হয়েছে বিদেশী পশুত্বের সঙ্গে; শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে দেশী মানুষের সঙ্গেও। তারপর সেই শপথে শপথে বজ্রগর্ভ দিন; ইতিহাসের সেই লাল তারিখ অগ্নিকমলের মত ফুটে উঠল। চোদ্দই আগষ্ট—উনিশ শ' সাতচল্লিশ। নবজাত পাকিস্তানের গৌরবময় সূতিকাঘর। তৃপ্তির হাসিতে ভরে গেল গণি মৌলবীর দৃষ্টি।

চেতনার অতলান্তে ডুবে গিয়েছিল গণি মৌলবী। চোদ্দই আগষ্টই শেষ নয়; আরও সংগ্রাম আছে, আছে দুর্যোগের করাল ভবিষ্যৎ।

অনেক আগাছা বেছে আগামী পাকিস্তানের উর্ব্বর মাটিতে জীবনের ফসল প্লাবিত করে দিতে হবে। সেই বাছাইর জন্য একটি শক্ত নিড়ানি প্রয়োজন। তারও সন্ধান মিলেছে। কায়েদ এ-আজমের নির্দ্দেশ—উর্দ্দু ভাষা।

"মৌলবী সাহেব।"

হাসেমের ডাক। চম্‌কে নিজের গভীরতা থেকে উঠে এলো গণি মৌলবী। অকারণ ব্যস্ততায় মুখর হ'য়ে উঠল; "পরশুদিন আজাদীর দিন, কাল থেকে তোদের এক সপ্তাহ ছুটি। যা এখন সব।"

প্রথমে কলগুঞ্জন; তারপর আনন্দিত চীৎকারে মক্তবের টিনের চালাটা ঝম্ ঝম্ করে নড়ে উঠল। এতক্ষণ একটা বন্যার স্রোতমুখ যেন বন্ধ করে রাখা হয়েছিল; মুক্তির দুর্ব্বার উল্লাসে হু হু করে ছুটে বেরিয়ে এলো ছোট ছোট মানবকেরা। মক্তববাড়ীর পেছনে হিজলের ডালে বাঁধা ডিঙি আর ভাটি নৌকাগুলো খুলে জামকাঠের বৈঠায় বর্ষার জলে ছন্দিত ঘূর্ণি তুলল সকলে।

দূরের আউশ ক্ষেতের দিকে খুশীর গুঞ্জন, আর বৈঠা বাওয়ার কলশব্দ মিলিয়ে যেতে লাগল। আর একটু পরেই উঠে পড়ল গণি মৌলবী। শরীরটা একটা বখারি পাখীর মত হাল্কা লাগছে এখন। কে যেন দু'টো লঘু পাখা জুড়ে দিয়েছে দেহে। মক্তবের দরজায় তালা লাগিয়ে হাসেমের কোষ নৌকায় উঠে এলো গণি মৌলবী।

ভাদ্র দুপুরের কাঁচাসোনার মত রোদে উঁচু পাড়ি থেকে নাগেশ্বর ফুল ঝরে পড়ল মৃদুতরঙ্গিত বর্ষার জলে।

* * * *

"আল্লাহ্-হো-আল্লাহ্- মহম্মদের রাসুল্লাহ্-হ্-হ্—"

আজানের পবিত্র আহ্বান জানালো আফজল হক্। দু দুবার হজ্জে গিয়েছিল—এখন ইদিলপুরের এই নতুন মস্‌জিদের ইমাম সাহেব।

সুন্দর ছন্দোময় উচ্চারণ শ্রাবণের শিমূলতুলোর মত মেঘভাসা আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। দীনছুনিয়ার অধিপতির নামে আবার মধুর আমন্ত্রণ ; "আল্লাহ্-হো-আল্লাহ্—"

কেরায়া মাঝি, ইল্সাজেলে, বর্গাকৃষাণ—জলবাঙ্লার পরিশ্রমী মানুষেরা সমবেত হলো চক্‌মিলানো মসজিদ দালানের সামনে।

দালানটা কিছুদিন হ'ল তৈরী ক'রে দিয়েছে চিটাগাঙের ধানের পাইকার একাব্বর শিকদার। গতবারের দশহাজার মণ রূপশালি ধান এবার আসমানে চড়া দামে বেচে সঙ্গে সঙ্গেই এই পুণ্যকর্ম্মের জাগ্রৎ প্রেরণা লাভ করেছে।

দুপাশে ঝিকিট ফুলের গাছে বেয়ে ওঠা মাধবীলতা ; শিউলি আর গাঁদাফুলের শুদ্ধ পটভূমি—সামনের দীঘিতে কাকচক্ষু জল। বর্ষার মেঘ্‌নাকে আটকাবার জন্য ধারগুলো উঁচু করে দেওয়া হয়েছে অনেকটা ; সেই পাড়িগুলো আবার সরল রেখার মত ঋজু নারকেল সুপারীর সুবিন্যস্ত বেষ্টনে ঘেরা। দূরের সোঁ সোঁ করে বাতাসের ব্যাকুল প্রার্থনা এসে নারকেল আর সুপারী বীথিতে মন্দ্রিত হতে থাকে সূর্যের সকাল থেকে তমসার রাত্রি প্রভাত পর্যন্ত।

মানুষগুলো দীঘির বাঁধানো ঘাট থেকে হাত মুখ ধুয়ে এলো। ডোরা কাটা লুঙ্গি পরিচ্ছন্ন করে আসন্ন বন্দনার জন্য শরীরের ওপর গুছিয়ে নিল একে একে। তারপর সামনের ঘাসের জাজিম বিছানো জমিটায় কাঁধের গামছা প্রসারিত করে দিল। কয়েক শ' মানুষের একটা শুচিস্মিত ছবি। নিবেদিত হৃদয়কোষ থেকে মিলিত কণ্ঠে গানের মত আকুল প্রার্থনা ভেসে গেল চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারার অধীশ্বরের চরণপদ্মে। "আল্লাহ্-হা আল্লাহ্, মহম্মদের রাসুল্লাহ্-হ্-হ্—"

প্রার্থনা শেষ হলো। ইমাম সাহেব শ্বেতপাথরের চাতাল থেকে গম্ভীর গলায় ডাকল ; "দাঁড়াও সব, তোমাদের সঙ্গে কথা আছে।"

ফিরে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো মানুষগুলো। ইল্‌সা জেলে, বর্গাকৃষাণ, কেরায়া মাঝি—জলমাটির নিষ্কলঙ্ক সন্তানেরা।

ইমাম সাহেবের গম্ভীর গলা গম্ভীরতর হ'ল; "শোন, তোমাদের সব উর্দ্দু শিখতে হবে। বাঙ্‌লা ভাষা কাফেরের ভাষা; উর্দ্দু ভাষা আল্লাহ্‌র মুখ থেকে বেরিয়েছিল। এতদিন কাফেরদের জুলুমদারি সয়েছি, এখন মুসলমানের বেহেস্ত্‌ পাকিস্তানে বাঙ্‌লা ভাষা চলবে না।"

কতকগুলি দুর্বিনীত কণ্ঠ ঝড়ের পূর্ব্বাভাষ বয়ে আনলো মসজিদের শুভ্র সুন্দর পরিবেশে; "উর্দ্দু শিখলে কি ভাত মিলব? জরুরা না খাইয়া গলায় দড়ি দিব না তো?"

"আল্লাতল্লীতে আমাগো গোর দিতে দিবেন তো; এই মজিদে ঢুইক্যা নামাজ পড়তে দিবেন তো! কন দেখি? শিখুম যা কইবেন। কিন্তুক্ যা কই তা পামু তো!"

অসহ্য একটা দুর্দ্দমনীয় ক্রোধে মগজের মধ্যে বিপর্যয় ঘটে গেল যেন ইমাম সাহেবের; "চুপ কর বেতমীজ বখিলেরা। আল্লাতল্লীতে গোর, মসজিদে নামাজ—থামলি কেন শয়তানের বাচ্চারা। বল দিল্লীর বেগম, পেশোয়ারের বান্দা, আর একটা করে আগ্রার তাজমহল চাই।"

দু দুবারের হজ ফেরত হাজী সাহেব। চোখ দুটো যেন মশালের মত জ্বলতে লাগল তার। নেহাৎই ইব্‌লিশের রাজত্ব; নইলে আল্লাহের দোয়ায় ঐ আগুনজ্বালা দৃষ্টি দিয়ে অলৌলিক একটা কিছু করে ফেলা একেবারে অসম্ভব ছিল না তার পক্ষে। খোদা তার ওপর বেশী মেহেরবান না হওয়ায় নিজের ভেতরই পুড়ে পুড়ে ভস্মীভূত হতে লাগলো ইমাম সাহেব।

একটি নির্বিরোধ কণ্ঠ; "তা হইলে আর হইল না ইমাম সাহেব। ঐ সব বে এলেম মতলব ভূইল্যা যান। যেমুন আছি, তেমুনই থাকতে দ্যান।"

ইমাম সাহেবের তির্যক দৃষ্টিটা চাবুকের মত সাঁ করে ঘুরে একটা মুখের ওপর সপাং করে আছড়ে পড়ল ; "কে তুই ?"

" আমি হাজিরদ্দি; ইল্সা ডিঙ্গির নাইয়া।" মৃদু হাসল মানুষটি।

আর একটি কণ্ঠ; "বাজান নানার চৌদ্দ জনমের ভাষা ভুলতে পারুম না কোন মতেই। ভাই সাহেব কইছে, আজম কইছে—"

গলাটা আশ্চর্য চমকে কেঁপে উঠল ইমাম সাহেবের ; "ভাইসাহেবকে তো চিনলাম, কিন্তু আজম কে ?"

"আমাগো আজম কবিদার, সোনারঙের জিগিরালির পোলা। "

"কই গেলিরে আজমা ; ইমাম সাহেবের লগে এট্টু মোলাকাত কর।" উচ্চকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল কেরায়া মাঝি ইত্তিমালী। কয়েকজন মিলে সগৌরবে আজমকে টানতে টানতে সামনের দিকে এগিয়ে দিল ; আসন্ন দুর্যোগের মুহূর্তে সেইই তো পরম বিশ্বস্ত সেনাপতি ; সেইই তো ভাইসাহেবের পরে একটা নতুন ক্রান্তির স্বপ্ন-সংবাদ দিয়েছে তাদের।

এতক্ষণ হাজী সাহেবের পবিত্র ক্রোধটা প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল সকলের দিকে ; এবার সে'টা আজমের দিকে কেন্দ্রিত করল ; "ব্যাপার কি তোমাদের ? কী চাও তোমরা ? "

" যা চাই সে তো এট্টু আগেই কইছে হাজিরদ্দি চাচারা, নয়া কথা কী আর শুনামু ক'ন। বাঙ্লা ভাষা আমরা ছাড়তে পারুম না—সাফ্ কথা। আর এই-ই আমরা চাই আগে।"

তেজোদ্দীপ্ত ঘোষণা। নিজের কানেই কেমন যেন আশ্চর্য শোনাল আজমের। এতখানি শক্তির নির্ভরতা কোথা থেকে সঞ্চয় করল ; ভাবতে বিস্ময় লাগে তার।

মানুষগুলো একে একে সুশৃঙ্খল পদসঞ্চারে নৌকায় উঠে হিজল-ছৈতানের ছায়া-আঁকা ভরাযৌবন খালের ওপর দিয়ে পূবের প্রান্তরে মিলিয়ে

যেতে সুরু করল। আর সেই দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে রক্তাক্ত অপমানে চোখদুটো জ্বালা করে উঠল ইমাম সাহেবের ; "আচ্ছা, দেখা হবে আবার—"

মেঘকজ্জলিত ভাদ্রুই আকাশের নীচে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে নিরুপায় আক্রোশে সড়কির খোঁচা-খাওয়া বাঘের মত ফুলছিল, খেয়াল নেই। দুর্বিনীত জেলে-জোলা-কৃষাণীদের নৌকাগুলো খালের যে বাঁকে অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছিল একসময়, সেখানেই জলের অতলান্ত থেকে যেন ফুটে বেরুল হাসেমের কোষ নৌকাটা। এখান থেকেই স্পষ্ট চিনতে পারল, পাটাতনের ওপর বসে রয়েছে মক্তবের মৌলবী আবদুল গণি, চিটাগাঙের বাজারে ধানের পাইকার একাব্বর শিকদার আর আনসার পার্টির একনায়ক কেরামত।

আগে থেকেই জানা ছিল, চকিতে মনে পড়ে গেল। আগামী পরশু চোদ্দই আগষ্ট—আজাদীর সূর্যস্নান করা দিন। মনে পড়ল, তারই প্রস্তুতির জন্য ভূইঞা সাহেবের সঙ্গে গোপন পরামর্শের প্রয়োজন। ঢাকা থেকে সম্মানিত দেশনেতা আসবেন তিনজন। তাকেই নিয়ে যাবার জন্য হাসেমের কোষ ডিঙির এই প্রসন্ন আবির্ভাব।

ছয়

সারা রাত্রি যতিচিহ্নহীন বর্ষণের পর আকাশের সামিয়ানায় একটা রক্তচক্ষুর মত কালপুরুষ নক্ষত্রটা এখন জ্বল্‌ছে দপ্‌ দপ্‌ করে। হেঁউলি ঝোপ আর কাশের জঙ্গলে জলো কালির মত রাত্রিশেষের

তরল অন্ধকার জড়িয়ে রয়েছে ; দূরের বউন্যাগাছগুলোর মাথায় একটা কালো যবনিকার নির্ম্মম পর্দ্দা নেমে এসেছে, হিজলপাতার ফাঁকে ফাঁকে জোনাকীর দীপান্বিতা নিভে গিয়েছে অনেকক্ষণ আগেই। চিহ্নহীন দিগন্ত পর্যন্ত শুধু একটা নিঃসীম অন্ধকারের অতলান্ত।

আর এমনি সময় বিছানার নিবিড় মধুর উত্তাপটুকু নিরুপায় আক্রোশে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে খাপ্‌রা-ছাওয়া দোচালা ঘরখানায় উঠে দাঁড়ালো আজম। তারপর ক্যাঁচা বাঁশের ঝাঁপ খোলার শব্দ হ'ল ক্যাঁচ্‌-ক্যাঁচ্‌ করে। জীর্ণ ঝাঁপটা একটু প্রতিবাদের মত আর্ত্তনাদ করে উঠল যেন।

ধাওয়া পাড়া থেকে এক ঝাঁক মোরগের গলায় আসন্ন প্রভাতের সূর্য-বন্দনা একটু একটু করে উচ্চকিত হয়ে উঠল ; কঁ-কর-কঁ—কঁ-কর-কঁ—চকিত হয়ে উঠল আজম। ইস্‌, বিছানার সোহাগ ছেড়ে উঠতে উঠতে ভোরের ঘোষণা এসে পড়েছে একেবারে।

কাল ইনামগঞ্জের হাট থেকে ফিরবার পথে মৃদু জ্বরের উত্তাপ এসেছিল শরীরে, সেই উত্তাপটা ধীরে ধীরে উগ্র হয়ে ত্রিযামা রাত্রি অবধি শিরায় পেশীতে নির্ব্বিরোধ রাজত্ব করে গিয়েছে আজমের। তাই কথামত নিশি রাত্তিরে ঠিক উঠতে পারেনি।

পূবের দোচালাটা থেকে মেঘ্‌নার একটানা ঢেউএর মত আর্ত্ত কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে ; ইন্দ্রিয়গুলো উৎকর্ণ করে দাঁড়িয়ে পড়ল আজম। সৎমা রোশেনা বিনিয়ে চলেছে বিরতিহীন। রোজ শেষরাত্রি থেকে এই ক্লান্ত কান্নার পালা চলতে থাকে যতক্ষণ না অন্ধকারের ঘেরাটোপ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে প্রথম সূর্যসঞ্চার হয় পূবালি দিকচক্রে। বিনানির হিংস্র সুরে সুরে রোশেনা কয়েকটা কথা উচ্চারণ করে নির্ভুল নিয়মে। শুনতে শুনতে আজমের মুখস্ত হয়ে গিয়েছে প্রতিটি অভ্যস্ত শব্দ ; "বান্দীর ছাও আইস্যা কিতাব পড়ে! খোদাতাল্লা তোমার মনেও এই আছিল—আমি

রোজ কাউফল খাইয়া মরতে আছি ; আর পোলাপানগুলি ডেফল খাইয়া মরে আর বাদ্‌শাজাদীর বাচ্চার সানকভরা ভাত চাই দুইবেলা।"

কানের সুড়ঙ্গে কে যেন গরম সীসা ঢেলে দিয়েছে একঝলক। এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করল আজম, তার শুনবার অনুভূতি যেন ঝামার খরঘর্ষণে কেউ ভোঁতা করে দিয়েছে। সে নিজেও তো কাউফল খেয়ে রয়েছে দু'দিন। আউশ ধান কেটে ভূইঞার গোলায় তুলে দেওয়ার পর যা তিন পাসারী চাল জিগিরালি পেয়েছিল, তা একটি দু'টি করে ক্ষুধার দিগন্তে পাখ্না মেলে উধাও হয়েছে। তারপর থেকেই সুরু হয়েছে এই নির্ভেজাল অর্দ্ধাশন পর্ব্ব।

একটু পরেই ইকড় ঘাসের জঙ্গলটা দলিত ক'রে সোনারঙের খালে দ্রুত পদসঞ্চারে নেমে গেল আজম। কাল হাটে বড় ভূইঞার পাট বাছার কাজ ঠিক করে এসেছিল, একটাকা রোজ আর একবেলা খোরাকির বিনিময়ে।

আষাঢ় মাসে কাঁচা পাট কেটে খালের জলে জাব দিয়ে রাখা হয়েছিল, শ্রাবণের এই শেষ দিনগুলোতে সেই পাট পচে একটা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পটভূমিতে। আজমের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে অবাধে প্রবেশ করে স্নায়ুগুলোকে যেন অবশ করে আনতে সুরু করেছে পচা পাটের অকৃত্রিম সৌরভ।

জলের মধ্যে ডুবিয়ে ডুবিয়ে ইতিমধ্যে তিন গোছা পাট পারের শ্যামা-ঘাসের জাজিম বিছানো জমিটায় এনে তুলেছে আজম।

আবারও ভুস্ করে খালের জল তরঙ্গায়িত করে ডুব দিল আজম। বেশীক্ষণ নিঃশ্বাস বন্দী করে জলের ভেতর থাকতে থাকতে বুকের মধ্যটায় কেমন যেন হাপানির দোলা লাগে।

আকাশ এখানে নিরাবরণ, উদার বিস্তৃত। আর তারই নীচে এই সোনরঙের খালটায় শ্রাবণমাসের শেষ দিনগুলোতেই পৌষের হিম যেন

সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে। শীতে সমস্ত পেশীগুলো যেন কুঁকড়ে আসতে সুরু করল আজমের। তা ছাড়া বিগত রাত্রের উগ্র জ্বরের রেশটুকু শরীরের মধ্যে কোথায় যেন খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে। কাল ইনামগঞ্জের হাট থেকে ফিরবার পথে বড় ভূইঞা সূঁচের মত তীক্ষ্ণাগ্র দাড়ি পরিপাটি করতে করতে হুকুম দিয়েছিল; "মধ্যি রাতে উঠে খালের পাটগুলি সকাল হবার আগেই পারে তুলবি। কালই পাট আর শোলা ছাড়ানো শেষ করবি আজমা। না হলে মজুরী পাবি না একটা ঘষা আধলাও, মনে থাকে যেন।"

সবশুদ্ধ পাঁচ গোছ পাট পারে তুলেছে আজম, আর সঙ্গে সঙ্গেই পূবের আকাশে ছায়া ছায়া রঙের একটা অস্পষ্ট আলোর ছোপ পড়ল। হিজল গাছগুলোর মাথায় বথারি আর গাঙ্‌শালিকগুলো সমস্বরে প্রভাতের আগমনী সুরু করে দিয়েছে। চম্‌কে উঠে খালটাকে আলোড়িত করে আবার ডুব দিল আজম। আর উঠেই যেন খালের পারে জিন-দর্শন হ'ল তার। ঐ শ্লেটরঙের ছায়াপাণ্ডুর আকাশটা চিরে যেন এইমাত্র ইব্‌লিশের মত মূর্ত্তিটা নেমে এসেছে। এতক্ষণ খালের জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে আজমের চোখ দুটো রক্তাভ হয়ে উঠেছিল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও দৃশ্যটার কোন ব্যতিক্রম ঘটল না আজমের চোখের আয়নায়। নাঃ বড় ভূইঞাই এসে দাঁড়িয়েছে। সেই ডোরাকাটা বাদশাহী লুঙ্গি, চোখের কোলে সুর্ম্মার সেই সতর্ক রেখা, ময়না কাঁটার মত তীক্ষ্ণ দাড়ি; আর সন্ধানী আলোর মত দুটো ছোট ছোট সরীসৃপী চোখ—সব মিলিয়ে একটা জীবন্ত আতঙ্কের মত মূর্ত্তিটা শ্যামা ঘাসের জাজিমে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এতখানি বিস্ময় যে তার জন্য সঞ্চিত ছিল, আগে তো জানা ছিল না। এইমাত্র যেন কোন একটা প্রশান্ত পৃথিবীতে জন্মান্তর ঘটেছে আজমের; যেখানে এতটুকু বিরোধের মালিন্য নেই, এতটুকু অত্যাচারের কলঙ্ক নেই।

এই পাকিস্তানে আবার সেই রামায়ণ মহাভারতে পড়া সত্যযুগ নেমে এলো না কি! অপ্রস্তুত বিস্ময়ে আজম অভিভূত হয়ে গেল। নিয়মিত হুঙ্কারের বদলে বড় ভূইঞার কণ্ঠ থেকে প্রসন্ন জ্যোৎস্না ঝরে পড়তে লাগল; "তুই কবি আজম। তোর পরিচয় আমি পেয়েছি, আজ বিকেলে ঐ মাঠে আসবি। মিটিঙ হবে, ঢাকা থেকে তিনজন নেতা আসবেন। তাঁদের কথা শুনবি; সন্ধ্যায় আতস বাজী পোড়ানো হবে—দেখবি। তোর মেজবান রইল। আজ চোদ্দই আগষ্ট, বড় শুভ দিন।"

সামনের দিকে আঙুলের সংকেত করল বড় ভূইঞা জলিলউদ্দিন চৌধুরী। ভূইঞাদের বাইর বাড়ী থেকে মাঠটা সোনারঙের খাল পর্যন্ত প্রসারিত; চার পাশে আম গাছের সীমাচিহ্ন দিয়ে ঘেরা। তারই ওপর মস্ত বড় একটা মুলি বাঁশের ডগায় পত্ পত্ করে ইদের চাঁদ লাঞ্ছিত সবুজ নিশানটা বিজয় গৌরবে উড়ছে। একটা পবিত্র আহ্বান যেন সমস্ত ইস্লামী দুনিয়ার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এরই নীচে এসে সমবেত হবে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের সশ্রদ্ধ মুসলমান জনতা; একই প্রতিজ্ঞায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে সকল দৃষ্টি, একই বীর্যবান শপথে কেন্দ্রিভূত হবে সকল শক্তি, একই মৃত্যুপণে নিয়ে আসবে দৃঢ়বন্ধন একতা—তারই মহিমময় ঘোষণা বাতাসে-বাজা পতাকা থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে।

সবুজ ঘাসের উদার স্নেহশয্যায় দাঁড়িয়ে ইংরেজী বাজ্না বাজাচ্ছে ঢাকা সহর থেকে আসা একদল বিচিত্র ভূষণ মানুষ।

শান্ত গলায় আজম বলল; "আসুন ভূইঞা সাহেব।"

কণ্ঠ আরো কোমল হ'ল ভূইঞা সাহেবের; "সোনারঙের ঘাটে, ইদিলপুরের মসজিদে তোরা যা করেছিস, তা মোটেও ভালো নয় আজম।"

কি বলতে চায় বড় ভূইঞা? কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে এই কোমলতায়

ভরা কথাগুলোর নেপথ্যলোক থেকে? ঋজু দৃষ্টিটা সোজাসুজি তার মুখের ওপর তুলে ধরল আজম।

বড় ভূইঞা সস্নেহে দাড়ির অরণ্যে হাত বুলাতে বুলাতে মোহিনী হাসি হাসল; "সব বুঝবি আজকের মিটিঙে। সব কথা শুনে যেতে পারবি—বড় গুণাহ্ করছিস তোরা আল্লা করিমের নামে। যা এখন কাজে যা।"

দূরের হেউলি ঝোপটার আড়ালে বড় ভূইঞার বাদশাহী রেশমী লুঙ্গিটা কখন যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল; এতক্ষণ খেয়াল ছিল না আজমের। ঘূর্ণিত চেতনার কেন্দ্রবিন্দু থেকে জ্বলন্ত নীহারিকা-কণার মত ওগুলো কী খসে যাচ্ছে?—সোনারঙের ঘাট, মশালের পিঙ্গল শিখায় অজস্র প্রতিজ্ঞা কঠিন মুখ, ভাইসাহেব, ইদিলপুর মসজিদের ইমাম সাহেব, মনসামঙ্গল, রৈবতক, পলাশীর যুদ্ধ—

সামনের দিকে তাকাতেই বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা ধক্ করে লাফিয়ে উঠল আজমের। লেবুবতী আমগাছটার পেছনে স্থির হয়ে রয়েছে কাইতানের রাত্রে স্বপ্ন-দেখা সেই দু'টি ঘন নীলিম সন্ধ্যাতারা। রমিনা! জ্বরের ঘোর-লাগা নেশায় সেই ভ্রমর-কালো চুলের প্রচ্ছদপটে শ্বেতপদ্মের মত কমনীয় মুখখানা তবে কি এতদিনে সত্যি হ'য়ে নেমে এলো সূর্যজ্বলন্ত দিনের আলোতে। প্রথম বর্ষায় উথল-পাথল জাগানো মেঘনার মত দীঘল শরীরটার ওপর আঠোরো বছরের উচ্ছ্বসিত যৌবনের মাতামাতি—সোনারঙে আসার পর তাকে নিয়ে গান বেঁধেছিল আজম—

কালনাগিনী কইন্যা তুমি, আমার বুকের জ্বালা,
তোমার গলায় দিমু কইন্যা ডুম্বুর ফুলের মালা।

বিন্দু বিন্দু বিস্ময় ক্ষরিত হ'তে সুরু করল আজমের দৃষ্টি থেকে।

এর মধ্যে রমিনা কাছাকাছি এসে পড়েছে; ফিস ফিসকরে অস্পষ্ট গলায় বললে; "আপনে এইখানে!"

"এই গেরামেই আমার বাড়ী; তুমি এইখানে আইলা ক্যামনে?"

"চাচাজানে আমারে বেইচ্যা দিছে। আমি বিবিজানের লগে বান্দী হইয়া আইছি ভূইঞার বাড়ীতে।" বীতবর্ষণ আকাশের মত থম থম করে উঠল রমিনার গলাটা।

"বেইচ্যা দিছে!" বিস্ময়টা এবার আতঙ্কিত হয়ে উঠল আজমের কণ্ঠে।

একটু সময়ের বিরতিচিহ্ন। পচা পাটের দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন আবেষ্টনটা সংকেতময় নীরবতায় উদগ্র হয়ে উঠল।

জ্বরের নেশালাগা ঘোর ঘোর সকালে ঘননীলিম সন্ধ্যাতারার ওপর বরফ গলতে দেখেছিল আজম; আজ অনেকদিন পর আবার প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্ত্তে এই শ্রাবণ শেষের সূর্যদীপিত পটভূমিতে সেই দৃষ্টি থেকে ধারাবর্ষা নেমে এলো। আকুলিত গলায় চীৎকার করে উঠল রমিনা; "আমারে এইখান থিকা অন্যখানে লইয়া যাইতে পারো তুমি? আমারে বড় মারে বিবিজান, আর ভূইঞা সাহেব কুপেরেস্তাব করে। আমার বড় ডর করে। কেউ কি এই ইবলিশ্‌টারে শ্যাব করতে পারে না!"

চারদিকের বিক্ষুব্ধ লবণাক্ত সমুদ্রে আজমের মধ্যে একটা কঠিন মাটির আশ্রয় যেন খুঁজে পেয়েছে রমিনা; "আমাগো ঐ খান থিকা আসনের পর তোমার কথাই আমি জানি ক্যান ভাবছি!"

স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল আজম। মাথার ওপর ঝকমকে আকাশের শূন্যতায় কর্কশ ধ্বনিতরঙ্গ ছড়িয়ে একটা কালো দাঁড়কাক উড়ে গেল। প্রখর কান্নায় ভেঙে পড়ল রমিনা; "আমি আর পারতে আছি না; সবসময় বড় ভূইঞা আমার পিছনে মেকুরের (বিড়ালের) মত ছোক্ ছোক্ করে। কও, আমার কথার জবাব দাও; তুমি ছাড়া আমারে বাচানের আর কেউ নাই।"

নিজেরই অজান্তে ফস্ করে ছিট্কে বেরিয়ে এলো আজমের গলা থেকে ; "বেশ কথা দিলাম, কিন্তুক তার আগেই তো ট্যাকার দরকার। কিছু ট্যাকা জমাইয়া লই। তুমি সাবধানে থাইকো এই কয়টা দিন।"

"যত তাড়াতাড়ি পার ; আমি আর পারতে আছি না। কোন দিন আমারে বড় ভূইঞা সব্বনাশ কইর‍্যা ফেলব। আমারে বাচাও, তোমার বান্দী হইয়া থাকুম সারা জনম।"

শরীরটা ক্ষ্যাপা কান্নার আবেগে তরঙ্গিত হ'তে লাগলো রমিনার।

"রমিনা !"

নতুন বিবি ফুলবানুর কণ্ঠ। সূর্যের আকাশ থেকে দুজনের মধ্যে যেন একটা উল্কাপাত হ'ল। কখন যেন এদের অসতর্ক মুহূর্ত্তে লেবুবতী আমগাছটার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ফুলবানু।

রমিনার মুখখানা থেকে রক্ত সরে গিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল ; অসহায় আশঙ্কায় আড়ষ্ট হ'য়ে এলো শিথিল ইন্দ্রিয়গুলো ; ঘননীলিম সন্ধ্যাতারা দুটোর ওপর মসীমেঘের যবনিকা কে যেন নির্ম্মম হাতে টেনে দিয়েছে।

একসময় নতুন বিবি ফুলবানুর পেছন পেছন অন্দর মহলের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল রমিনা।

ফুলবানুদের গমন পথের দিকে নির্ব্বোধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটু আগের বিকেন্দ্রিত চিন্তাগুলো সংহত হয়ে এলো আজমের। রমিনার বর্ষণপ্লাবিত নিবিড় নীল চোখে সেই মনসামঙ্গল, রৈবতক, ময়মনসিংহগীতিকার একটা সুস্পষ্ট অর্থ খুঁজে পেয়েছে সে। একটা পরিষ্কার সংকেতের ব্যঞ্জনা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ভাইসাহেব, ইদিলপুর মসজিদের সেই শপথগ্রথিত মানুষের সশ্রদ্ধ ছবি, মেঘনাপারের মাটিতে

আর ঘনপত্র বংশীবটের নীচে পিঙ্গল মশালের আলোয় সহস্র মানুষের বন্য কঠিন দৃষ্টি। তাদের প্রতিবাদের কণ্ঠ; মনসামঙ্গল, সখীসোনার গানের একটা নতুন অর্থ যেন তলোয়ার হয়ে জলছে রমিনার চারপাশে।

রমিনার রোদনভরা দৃষ্টি একটা ভয়ানক সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে যেন। ওপরের দিকে তাকালো আজম, তাকালো রক্তাক্ত ছুটো চোখ মেলে। আকাশের দীপ্ততর সূর্যে তারই নির্ম্মম ঘোষণা।

* * *

পচা পাট শ্যামাঘাসের জাজিমে তুলে আঁশ ছাড়াতে ছাড়াতে পশ্চিম আকাশের সোনা বর্ষণ সুরু হয়ে গেল। একদিকে স্তূপাকৃতি হয়ে রয়েছে শোলা, আর একদিকে পাটের গোছা জমেছে পর্ব্বতের মত। আর তার মধ্য থেকে নারকীয় দুর্গন্ধটা সঞ্চারিত হয়ে বাতাসকে মন্থর আর বিষাক্ত করে তুলেছে।

এর মধ্যে একবার মাত্র এক সানক রাঙা আউশের ভাত আর ঝিঙে রসুনের ছালুন খেতে উঠেছিল আজম।

সারাদিন শ্রাবণের গাবানো জলে ডুবে ডুবে পাট তুলতে তুলতে এখন মেঘ্‌নার কাইতানের (ঝড়ের) মত হু হু করে আজমের ওপর মাত্‌লা ঝাপটা এসে আছড়ে পড়ল। বনবেতসের লতার মত হি হি করে কাঁপতে সুরু করল আজম।

এক সময় সেই বাদশাহী রেশমী লুঙ্গির আবির্ভাব হ'ল। বড় ভূইঞা জলিলউদ্দিন চৌধুরী এসে দাঁড়িয়েছে সামনে; "আজ আর কাজ করতে হবে না আজম, তুই বাড়ী থেকে শুক্‌নো জামা কাপড় পরে আয়। এখনই মিটিঙ্‌ সুরু হবে।"

সামনে ইদের চাঁদ লাঞ্ছিত পতাকা উড়ছে। ইংরাজী বাজনার বাজনদারেরা বেশ তৎপর হয়ে উঠেছে। একমাল্লাই আর কোষ নৌকায় করে মানুষ

এসেছে আবদুল্লাপুর-চরজলমা-বেগমগঞ্জ—দূর দূরান্তের গ্রাম-গঞ্জ-জনপদ থেকে। কালো কালো মাথা, লুঙ্গি, ধূতি, বোরখা, শাড়ী আর লাল-সবুজ ফেজটুপির একটা জটিল রঙের সংমিশ্রণ। সামনের মাঠ থেকে রীতিমত একটা মিশ্রিত চীৎকার কুণ্ডলিত হ'য়ে উঠছে আকাশের দিকে।

আজম জ্বরের দোলা-লাগা গলায় বলল; "ভূইঞা সাহেব, আমার রোজের ট্যাকাটা ছান। ট্যাকা লইয়া চাউল কিনলে তবে ভাত মিলব আম্মা বাজানগো।"

"এখন দেবার সময় নেই; বড় ব্যস্ত আছি। কাল সকালে নিয়ে যাবি। এখনই আবার নেতারা এসে পড়বেন সহর থেকে।"

"কিন্তুক্ ট্যাকাটা না মিলে—"

ততক্ষণে ব্যস্ত পদবিক্ষেপে সামনের জমায়েতের দিকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে বড় ভূইঞা জলিলউদ্দিন চৌধুরী।

আম্মার লঙ্কা-রসুনের ঝাঁজ মিশ্রিত গলা, আর ছোট ভাইটার পবিত্র কাউফল খেয়ে খেয়ে রক্ত আমাশার কথা চেতনার ওপর প্রতিফলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে একরাশ ঝিঁঝিঁ যেন ঐকতান করতে লাগলো। স্নায়ুগুলো জ্বরের মাতন লাগার চাইতেও আরো বেশী অবশ হ'যে আসতে সুরু করেছে।

সামনের মাঠ থেকে মিশ্রিত চীৎকারটা আরও বেশী প্রমত্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু ঐ চীৎকার, লুঙ্গি, ফেজ, ধূতির মিলিত পরিবেশ; ইদের চাঁদ-লাঞ্ছিত সবুজ দ্যুতি-ছড়ানো পতাকার যেন কোন অবয়ব নেই, সব কি একটা কঠিন কুয়াশার অতলান্তে তলিয়ে গিয়েছে। মনে হ'ল, পচা পাটের অকৃত্রিম দুর্গন্ধ ছাড়া পৃথিবীর সব সুর, সব আলো, সব সৌরভ মুছে গিয়েছে।

দ্রাম্-দ্রাম্ দ্রাম্—
পেঁ-পু-পু, পেঁ—পু—পু—

সাইড্ ড্রাম্ আর বিউগিল্ গুলো ছন্দে ছন্দে কথা কয়ে উঠছে। সমবেত জনতার সশ্রদ্ধ সম্বর্দ্ধনার মধ্যে নেতারা সভামঞ্চে আসীন হলেন। বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে। অনেকটা সময় ধরে হাততালির তরঙ্গ উঠল মাঠের এক প্রান্ত থেকে আর এক সীমান্ত পর্যন্ত। একটানা, বিরতিহীন।

এক সময় উঠে দাঁড়াল আজম। বাণীর বরপুত্রের কাছ থেকে বিমুগ্ধ স্বীকৃতি-পাওয়া কবি পুরুষ। রমিনার বিবর্ণ দৃষ্টিতেই কেবল নয়, রোশেনার শেষ রাত্রের নির্ভুল বিনানির মধ্যে, ছোট ভাইটার টক কাউফল খাওয়া দেহের বীভৎস কঙ্কালে আর একটা ইঙ্গিত সে পেয়েছে; মনসামঙ্গল, রৈবতক আর ময়নামতীর গানের অর্থ চোখের সামনে আর একটা পথ-চিহ্নের সুস্পষ্ট রেখা এঁকে দিয়েছে। সেই পথ ধরে জ্বরের নাগরদোলায় দুলতে দুলতে সোনারঙের খালের পারে এসে দাঁড়াল আজম। এ পারের বউন্যা গাছের ডালে আর ওপারের মাটির ওপর বয়রা বাঁশের সাঁকো পেতে যোগচিহ্ন রচনা করা হয়েছে। তলা দিয়ে শ্রাবণশেষের জল খরস্রোতে বয়ে চলেছে মেঘ্‌নার দিকে। সাঁকোর খুঁটির চারপাশে কচুরি পানা ফেনিয়ে ওঠা জলের সঙ্গে পাক খেয়ে ছিট্‌কে ছিট্‌কে বাঁকের দিকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

খালের পারেই কয়েকটা শাখাবিস্তারী কাউফলের গাছ; তাদের মাথায় এসে অবারিত জলো বাতাস আছড়ে পড়ে। রক্তাভ চোখ দুটো কাউ-গাছের ডালে টেনে তুলবার সঙ্গে সঙ্গে বেলা শেষের অকলঙ্ক সোনালী ঐশ্বর্য কেমন স্তিমিত হয়ে নিভে এলো আজমের দৃষ্টিতে। কে যেন তার আসার আগেই সব কটা পাকা কাউফল পেড়ে নিয়ে গিয়েছে। আজ ক'টা দিন ঐ টক ফলগুলিই ছিল একমাত্র নির্ভরতা।

সে কবিদার, মেঘ্‌নাপারের মানুষের দাবীকে সে স্বীকার করে নিয়েছে। মনসামঙ্গল আর পদ্মপুরাণের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা পথটা এখানেই

সীমাচিহ্নিত নয় ; দুর্নিরীক্ষ্য দিগন্ত পর্যন্ত তার রেখা প্রসারিত হয়ে রয়েছে। সেই রহস্যে-ঘেরা পথের আকর্ষণেই এগিয়ে চলল আজম।

আর একটি যতিচিহ্ন।

বাজানের দোচালাটার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো আজম। আম জামের পত্রবিস্তারের ওপর গোধূলির সোনালী আকাশটায় এখন রাশি রাশি ছাই উড়ছে যেন।

ক্যাঁচাবেড়ার ওপাশ থেকে একটা আনুনাসিক গলা থেকে ভৌতিক শব্দ বেরিয়ে আসছে। আজমের হৃৎপিণ্ডটা কেমন যেন চমকে উঠেছিল প্রথমে ; এখন আবার সহজ নিয়মের ছন্দে বেজে চলল। নির্ভুল কণ্ঠ ; রোশেনার বিনানিটা কেমন যেন নির্জীব হয়ে এসেছে এখন।

সশব্দে মুলি বাঁশের ঝাঁপটা খুলে ঘরের ভেতর চলে এলো আজম।

একপাশে লাল কেরাসিনের কুপী থেকে আলোর চেয়ে প্রচুর ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওত পেতে রয়েছে চারপাশে। সেই স্তিমিত আলোতে দৃশ্যটা চোখে পড়তেই অমানুষিক আতঙ্কে ধমনীর মধ্যে রক্ত যেন চল্‌কে উঠল আজমের। মনসামঙ্গলের সেই মায়াবৃত পথ এ কোন অপমৃত্যুর পৃথিবীতে নিয়ে এলো তাকে !

নীল রঙের বিষবমির ওপর সমস্ত শরীরটা ধনুকের মত বেঁকে গিয়েছে রোশেনার ; চারপাশে কাউফলের অজস্র আঁঠি ছড়িয়ে রয়েছে। ছোট ভাইটার ক'দিন আগে রক্ত আমাশা হয়েছিল ; একপাশে সে তার কঙ্কালের ধ্বংসশেষ নিয়ে পড়ে রয়েছে। রোশেনার বমির নীল সমুদ্রে একটা তাজা রক্তের ধারা এসে মিশে গেছে। লাল কেরাসিনের ধোঁয়াটে আলোতে বুকের ভেতরটা কেমন যেন ছম্‌ ছম্‌ করে উঠল আজমের। বমি আর রক্তের থক্‌থকে তরল প্রবাহ থেকে একটা অম্ল আর আঁশ্‌টে দুর্গন্ধ উঠে এসে সমস্ত স্নায়ুগুলোর ওপর চট্‌চটে আঠার মত জড়িয়ে গেল।

এমনি সময় মরা সাপের মত ভাবচিহ্নহীন নিস্তেজ দৃষ্টি মেলে ককিয়ে উঠল রোশেনা ; "কেঁ রে বাঁন্দীর ছাঁও নাঁ কী? বঁড় ক্ষিঁদাঁ পাইছেঁ আঁজমাঁ। বঁড়ঁ ক্ষিঁদাঁ।"

চোখের পল্লব শিথিল হ'য়ে আবার টলে পড়ল।

সে নতুন প্রভাতের বৈতালিক। সোনারঙের কেরায়া ঘাটে পূর্ব্বসূরী রসিক ঢালীর সশ্রদ্ধ আসনে তাকে অভিষেক করে নিয়েছে হাজিরদ্দিরা। কিন্তু সেই মনসামঙ্গল, রৈবতক, মেঘনাদ বধের সুস্পষ্ট অর্থ সন্ধান করতে গিয়ে এ কোন রক্তাক্ত পৃথিবীর সংবাদ পেল আজম!

এখানে মধুর সঙ্গীতের মর্মরিত আশ্বাস নেই, এখানে কিরণপ্লাবিত আকাশ গঙ্গার স্বপ্ন নেই, এখানে ছায়াতরুর প্রেম নেই। এ পথে মান-ভঞ্জনের কল্পনা ছাই হ'য়ে উড়ে যায়, এ পথে নৌকাবিলাসের অভিরাম লাস্য স্তব্ধ হ'য়ে যায়, এপথে কোন দৃষ্টি ছায়াচ্ছন্ন অনুরাগের দিশারী হয়ে পথ দেখায় না। বিপদমৃত্যুর রক্তাঙ্কিত ঘোষণায় এ পথ উৎকীর্ণ।

ইতিমধ্যে আবার দৃষ্টি মেলেছে রোশেনা ; "নঁটীর বাঁচ্চাঁ এঁখনও খাঁড়ইয়াঁ রঁইছিঁস ; বঁড়ঁ ক্ষিঁদাঁ, ভূঁইঞা বাঁড়ী থিঁকা কিঁছুই আঁনস নাই!"

"তুমি একটু খাড়াও আম্মা, আমি এখনই তোমার খাওনের কিছু লইয়া আসি।"

ক্যাঁচা বাঁশের বেড়ায় নির্ম্মম শব্দ তুলে বাইরে বেরিয়ে এলো আজম।

ছাই রঙের পাণ্ডুর আকাশটা এতক্ষণে কালো হয়ে এসেছে। ভূঁইঞাদের পতাকা-ওড়া মাঠ থেকে চৌদ্দই আগষ্টের সগৌরব ঘোষণা ভেসে আসছে।

একমুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করল আজম। রৈবতক মনসামঙ্গলের দাবীর সেই পথটা বাজানের দোচালা ঘরখানার সামনেই যতিচিহ্নিত হয়ে যায় নি ;

অনেক দুর্গম অভিযাত্রার হাতছানি দিতে দিতে সে এগিয়ে গিয়েছে অনেক, অনেক দূরে। নন্দ ভূঁইমালীর ফুস ফুস ফাটা রক্তাক্ত আসর থেকে যাত্রা সুরু করে, সেই ঘননীলিম সন্ধ্যাতারার দেশ পাড়ি দিয়ে, মেঘনাপারের পিঙ্গল মশালের চারপাশে বৃত্তের মত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা মানুষগুলোকে পাশে রেখে, ইদিলপুর মস্‌জিদের বীর্যবান ছন্দকে পাথেয় করে অনেকদূর—সেই পথটাকে আশ্রয়নিয়ে অনেক, অনেকদুর এগিয়ে এসেছে আজম। এখান থেকে ফিরে যাওয়া যায় না। বার বার এপথের ওপর পদ্মা-মেঘনার দেশের অজস্র প্রশ্নদীপিত প্রার্থনা এসে পড়ে। হাজিরদ্দি, কাসেম আলী, ভাইসাহেব—এমনি অনেকের, অজস্রের—

একসময় সোনারঙের খালের সাঁকোটা পেরিয়ে আউশ ক্ষেতের সামনে এসে দাঁড়ালো আজম। ধানের পাতার মধ্য দিয়ে শির শির করে বয়ে চলেছে শীতের আমেজ-লাগা শ্রাবণশেষের ক্লান্ত বাতাস। জলের ওপর খাড়া খাড়া মাথা তুলেছে নলখাগড়ার বন; তার মধ্যে জোনাকীর সবুজ দীপান্বিতা সুরু হয়েছে। ঝিঁঝিঁর নূপুরে নূপুরে, বাতাসের বাজনায় বাজনায় আর ধানের পাতায় প্রসন্ন সর্ সর্ শব্দে ঋতুলক্ষ্মীর আগমনী। মাঠের ঝাঁপি সোনালী ফসলের দাক্ষিণ্যে ভরে যাবে—তারই সংবাদ।

চারপাশে একবার তাকালো আজম।

এখনও আউশের দীঘাবাইল ধান রয়েছে মাঠে। কয়েকটা ছড়া কেটে নিয়ে চিঁড়ে কুটে দেওয়া যায় রোশেনাকে। দেওয়া নয়, দিতেই হবে।

নতুন পৃথিবীর কবিদার সে, মানুষের সমস্ত দাবীকে স্বীকার করে নিয়েছে। রোশেনার দাবীকেও সে অস্বীকার করতে পারবে না। কর্ত্তব্য

তার স্থির হয়ে গিয়েছে। অকম্পিত পদক্ষেপে জলে ডোবা ধানের ক্ষেতে নেমে গেল আজম।

* * * * * *

ষোড়শ শতাব্দীর সাজসজ্জা করে সভায় বসেছে জলিলউদ্দিন চৌধুরী।

আসমুদ্র ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় কোন নবাবজাদা বলে মনে হ'ল তাকে। চোখে সেই সূর্ম্মার কুশলী রেখা আর সুরাসক্তির রক্তরাগচিহ্ন।

মূলি বাঁশের ওপর পত্ পত্ করে ওড়া চন্দ্র-লাঞ্ছিত সবুজ পতাকার নীচে উঁচু সভা মঞ্চ রচনা করা হয়েছে। বড় বড় গদী আঁটা চেয়ারে বিশিষ্ট কয়েকজন সমাসীন। তাদের জমকালো পরিচ্ছদ থেকে অদ্ভুত দ্যুতি ঠিকরে বেরিয়ে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিচ্ছে।

সভানায়কের বিশাল আসনটা সহর থেকে আসা একজন দেশনেতা গ্রাস করে নিয়েছেন। সেদিকে একবার প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনে মনে নির্ব্বেদ আনবার চেষ্টা করল জলিলউদ্দিন। সামনের সহস্র সহস্র মানুষের মুখের ওপর বেলাশেষের রাঙা আলো কুমকুমচিহ্নের মত ছড়িয়ে পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতার সুর আওড়াতে লাগল গুন্ গুন্ করে। সহরের সম্মানিত নেতাদের তাক্ লাগিয়ে দিতে হবে। একেবারে অযোগ্য ব্যক্তিই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের সিংহাসনটা অলঙ্কৃত করছে না!

চারপাশে কেরামতের আনসার পার্টির ছেলেরা অর্ধচন্দ্রচিহ্নিত সবুজ টুপি মাথায় দিয়ে সভার শৃঙ্খলা রক্ষা করছে।

"এই, এই তুমি আবার উঠলা ক্যান?"

"এই বস, বস।"

অসহিষ্ণু গলার উত্তর ভেসে আসে সঙ্গে সঙ্গে; "তোমার কামে যাও সাহেব; এট্টু লইড়্যা চইড়্যা বসতে দিব না তো কিসের সভা!"

"মেজবানের নাম কইর‍্যা যে ঢোল দিছিলা, এইবার খাওনের জিনিষ আনো হে ভাইজানেরা। আর কতক্ষণ ভালো ভালো কথা শোনন যায়; প্যাটের ভাত হজম হইয়া গেছে।"

আগে থেকে ফলাহারের নিমন্ত্রণ জানিয়ে ঢোল দেওয়া হয়েছিল, নয়ত লোক জমায়েৎ হয় না বিশেষ। মেজবানের সেই মধুর প্রাত্যাশার কথা এরা ভুলতে পারে নি। এখানে আসার সেইই একমাত্র পরমার্থিক উদ্দেশ্য।

"এই সব কথা আমরা অনেক শুনছি; আইজের মত ঐ কথাগুলান সিন্দুকে ভইর‍্যা থুইতে কও আন্ছার ভাইএরা! আজাদী পাওনের আগেই আমরা ঐ সব শুন্ছি। এই পামু, সেই পামু!"

মসৃণ নিয়মে চলতে চলতে এ কোন অবিশ্বাসী ছন্দোপতনের আভাষ। আন্সার দলের সেনানীরা অর্থময় দৃষ্টি বিনিময় করে সমস্বরে গর্জ্জন তুলল; "চুপ, চুপ। চুপ কর বউয়ার ভাই—"

বিশৃঙ্খল গলার কদর্য ছন্দের ভঙ্গিতে দুদিক থেকেই অশ্লীল খেউড়ের পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। বসে থাকতে থাকতে কয়েকজন বেশ বীররশে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে; "সুমুন্দির পুতেরা ঢাক পিটাইয়া মেজবান দিছে। এখন আবার গালিগালাজ দেয়। কে আইত তোগো মিটিনে। আমাগো খাইয়া লইয়া কাম নাই? আয় দেখি এ মুড়া!"

কি একটা অনিবার্য সম্ভাবনায় ভয়ানক শোনালো কণ্ঠগুলো।

এ্যাম্প্লিফায়ারে ভারী গলা ভেসে এলো; "মিঞা সাহবরা, আমরা আজাদী পেয়েছি। এখন আমাদের উচ্ছৃঙ্খল হলে চলবে না। সহর থেকে মেহেরবাণী করে নেতারা এসেছেন আপনাদের দু চারটে কথা শোনাতে। আপনারা গণ্ডগোল না করে চুপচাপ শুনুন। পাকিস্তানের অর্থ বুঝতে পারবেন। আমাদের সামনে অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব এসেছে। এবার

মাননীয় নেতা ফিরোজউদ্দিন আইহোক সাহেব কায়েদ-এ-আজমের নামে কসম নিয়ে উর্দু সম্বন্ধে কিছু বলবেন। তার পরেই আতসবাজী পোড়ানো সুরু হ'বে। চুপচাপ বসে থাকুন।"

উর্দু!

কয়েক হাজার হৃৎপিণ্ডে ছলাৎ করে আছড়ে পড়ল একটা বিদ্রোহী তরঙ্গ।

অজস্র মানুষ। সোনারঙের ঘাটের কেরায়া মাঝির', ইল্‌সা ডিঙির নেয়েরা, 'গয়নার নাও'এর মাল্লারা পদ্মা-মেঘ্‌না-ইল্‌সা- কালাবদরের প্রসারিত জলদিগন্তের ওপর দিয়ে বৈঠা চালাতে চালাতে; রক্তকমলের মত রাঙা অপরাহ্নে কি গাঁদা ফুলের মত হল্‌দে রোদের দুপুরে এদের প্রতিবাদের কণ্ঠে, এদের হৃদয়ের বিক্ষোভে মনসুরের বজ্রডাকা কথাকে, আজমের অকুণ্ঠিত গানের মশালকে ছড়িয়ে দিয়ে এসেছিল।

"ও মাঝি ভাই, কোন গেরামে ঘর?"

"গেরাম কি আর আছে? চরে ছন দিয়া ঘর তুলছি; চর ম্যাঘ্‌নায়।"

তর তর করে পাশ দিয়ে জেলে ডিঙিটা নিয়মিত ছন্দে এগিয়ে যাচ্ছিল।

এ নৌকার কণ্ঠটি এবার বেশ তৎপর হয়ে উঠল; "ঘরে ফিরণের গরজ ক্যান অত? নয়া সাদি করছ না কী? মন যেন চরের ঘরে ফেলাইয়া আসছ— সন্দ হয়।"

বৈঠার কুশলী প্রক্ষেপে নৌকার গতিবেগ থামিয়ে দিল ও পক্ষ। অবারিত নদীর মত একমুখ হেসে উঠল হো হো করে; "রস দেখি চুয়াইয়া ঝরে মাঝির; আমার কিন্তুক্ রস শুকাইয়া গেছে। তিন দিন ঘর থিকা আইছি। চাউল লইয়া গেলে জরুবিটি ভাত পাইব। তুমি যে কী কও?"

এবার বেশ গম্ভীর হ'য়ে এলো এদিকের কণ্ঠটি; পরিহাসের বর্ণালী

আকাশে যেন দুর্যোগ-গর্ভ মেঘের ছায়াপাত হ'ল আচম্‌কা; "কথা আছে, বড় খারাপ কথা।"

"কি কথা?"

ওপক্ষ থেকেও উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

"যেই ভাষায় কথা কই, সেই ভাষায় আর কথা কইতে দিব না সুমুন্দির পুতেরা। বাজান-নানার চৌদ্দ জনমের ভাষা ছাইড়্যা বেজাত ভাষায় কথা কইতে হইব। তুমি কি কও?"

সোনারঙের ঘাটে প্রথমদিন মনসুর সংবাদটা দেবার সঙ্গে সঙ্গে যেমনটি হয়েছিল ঠিক তেমনি করেই চরের মানুষটির কণ্ঠ বিদীর্ণ হ'ল; "না না, ঐ সব চলব না। মুখের গরাস দিছি, বুকের কথা কিছুতেই দিমু না।"

"আমরাও সেই কথাই কই। এই জুলুমদারি সমু না। আমরা সব এক জোট। সোনারঙের ঘাটে আইসো; আমার নাম কইরো। আমার নাম হাজিবাদ্দি—চরে এই খবরটা দিও।"

"নিশ্চয় দিমু; আমরা আসুম, বেবাক মানুষ জুটাইয়া আনুম চর থিকা।"

একটা তীব্রগামী ফলুই মাছের মত ওপক্ষের নৌকাটা মেঘনার খরতরঙ্গে বিন্দুর মত মিলিয়ে গেল দিগন্তের দিকে।

কিংবা পদ্মার ওপর দিয়ে 'গয়নার নাও' চলেছে মুমূর্ষু রাত্রের অপরিচ্ছন্ন অন্ধকারে।

বাইরের তরঙ্গ প্রক্ষেপে অশ্রান্ত গর্জ্জন বাজছে।

একজন মাল্লা হামাগুঁড়ি দিয়ে সোনালী গোসাপের মত ছইএর ভেতর চলে এলো।

কয়েকটা পাণ্ডুর আলোর হ্যারিকেন জলছে চারপাশে। আড়কাঠের

কাছে দু'টো ঢোল রয়েছে। ঐ গুলো বাজিয়ে বাজিয়ে যাত্রীদের সতর্ক করে দেওয়া হয় বন্দরে বন্দরে।

মাল্লাটি ঋজু হয়ে বসে পরিষ্কার গলায় বলল; "আমার নাম কাসেম আলী; মিঞা ভাইরা এট্টা কথা। সহর থিকা খবর আইছে বাঙ্‌লা ভাষা ছাইড়্যা বিজাত ভাষা শিখতে লাগবো। মনে রাখবেন বাঙ্‌লা ভাষা আমাগো বাজান-নানার ভাষা; না খাইতে পাইলে অন্ততঃ এই ভাষাতে কাইন্দাই আমরা প্যাটের পোড়ানি কমাই।"

নড়ে চড়ে বসল কয়েকজন যাত্রী; "হ হ ব্যাপারটা কী কও দেখি। আমরাও গন্ধ পাইছি—কী জানি সুমুন্দির পুতেরা করতে চায়! তারা কারা কও দেখি মাঝি?"

"না খাওয়াইয়া শালারা মন গতর তাহা তাহা কইর‍্যা ভাইজ্যা খাইল; এখন আবার এই শয়তানি লাগাইছে। নাম কও বউয়ার ভাইগো।"

"নাম জাননের হইলে সোনারঙের ঘাটে, বট গাছের নীচে আইসেন। ভাইসাহেব আছে, আমাগো আজম কবিদার আছে। তার আগে যে যেই খানে থাকেন, যত মানুষ পারেন, সকলটিরে এই খবরটা দিবেন। দিবেন তো!"

একটু থেমে দৃষ্টির সন্ধানী আলোটা সকলের মুখের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিল কাসেম আলী।

"দিমু না মানে। বেবাক মানুষ; চিনা অচিনা সব মানুষরে কমু। এই সব্বনাইশ্যা ব্যাপার কিছুতেই করতে দিমু না।"

ততক্ষণে পূবের দিকচক্র থেকে জ্যোতির্ম্ময় অরুণোদয়ের আলো এসে পড়েছে পদ্মার শুভ্রচন্দন ঢেউগুলোর মুকুটে মুকুটে। মানুষগুলোর চোখে চোখে সেই শপথ-সূর্যের ইংগিতময় সম্পাত।

সেই সব জেলে-জোলা, মাঝি-মাল্লা, কৃষাণ-কামলা জলবাঙ্‌লার সুদূর

দিগন্ত থেকে এসে কেন্দ্রিত হয়েছে ভূইঞা বাড়ির এই সভায়; তাদের বুকে বুকে ধরে এনেছে রাতপ্রভাতের 'গয়নার নৌকা' থেকে, বেলাশেষের সোনালী মেঘনার ইল্‌সা ডিঙি থেকে, দীঘাবাইলের ধান কাটা সূর্যঝকিত কাস্তে থেকে প্রতিজ্ঞার অগ্নিমশাল—বাঙ্‌লা ভাষা।

এ্যাম্‌প্লিফায়ার থেকে গম্ গম্ আওয়াজ ভেসে আসছে।

মাইকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন ফিরোজউদ্দিন আইহোক। টকটকে লাল চেহারা; পরিপুষ্ট অমর্ত সাগর কলার মত মেদের স্ফীতকায় পর্ব্বত সঞ্চিত হয়ে রয়েছে শরীরে। পেশোয়ারী মুসলমান, কিন্তু সাবলীল বাঙ্‌লা বলেন। এ্যামপ্লিফায়ারে তাঁর কণ্ঠ বেজে উঠল; "মিঞাসাহেবরা, এই ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে খোদার নামে কসম নিয়ে বলুন—'পাকিস্তান'।"

সমুদ্রগর্জ্জন শোনা গেল; "জিন্দাবাদ।"

"বলুন—কায়েদে-এ-আজম।"—

কয়েকটা গলায় ক্ষীণ ঢেউ উঠল, "জিন্দাবাদ।"

আকস্মিক ছন্দোপতনে তাল কেটে দিল মৃদু শব্দটা।

দুর্বিনীত চোখে তাকালেন ফিরোজউদ্দিন আইহোক। দৃষ্টি থেকে স্পষ্ট বিরক্তি ঝরতে লাগল। অপমানে ফর্শা কান দুটো টকটকে লাল হয়ে গিয়েছে। পাঞ্জাবে-সিন্ধুতে অনেক সভায় তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন, কিন্তু কায়েদে-এ-আজমের নামে এমন নীরব অবজ্ঞা যেন তার মর্ম্মগ্রন্থিতে কাঁকড়া বিছার বিষ ছড়াতে লাগল; চেতনায় দাবাগ্নি নাচতে লাগল।

নাঃ, বিস্ফোরিত হ'লে চলবেনা; তাঁর ওপর অনেক দায়িত্ব। সহর থেকে উর্দ্দু প্রচারের ফরমান নিয়ে এসেছেন। চারদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিপাত

করে অসীম আত্মবিশ্বাসে নিজেকে সংযত করে নিলেন ফিরোজউদ্দিন আইহোক।

বুনো ভামের মত গুটি গুটি পদক্ষেপে সভামঞ্চের ওপর বড় ভূইঞার পাশে এসে দাঁড়াল মাধব বাড়োরী; "আপনি আমাকে তলব করেছেন ভূইঞা সাহেব?"

"হ্যাঁ, ভাল করেছেন এসে। আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।"

"কি কাজ?" কৃত কৃতার্থ দৃষ্টিতে তাকিয়ে গলাটা গো বকের মত বাড়িয়ে দিল মাধব বাড়োরী।

"বক্তৃতা দিতে হবে। আপনাদের কালী দুর্গার নামে কসম দিয়ে উর্দু ভাষা শিখবার জন্য হিন্দুদের বলবেন।" নিস্পৃহ গলায় ফিস ফিস করে উচ্চারণ করল বড় ভূইঞা।

উত্তেজনায় গো বকের মত প্রাসারিত গলাটা কচ্ছপের মত বুকের ভেতর গুটিয়ে এলো মাধব বাড়োরীর, মৃত গলায় বলল; "আমি যে কোনদিন—"

"চুপ চুপ—সাহেব বক্তৃতা দিচ্ছেন।"

সচকিত হয়ে কান দুটো উদগ্র করে বসে রইল মাধব বাড়োরী আর বড় ভূইঞা জলিলউদ্দিন চৌধুরী। চারপাশে চক্রব্যূহ রচনা করেছে ইমাম সাহেব, কেরামত, গণি মোলবী, আর মোল্লামুছুল্লিরা।

এ্যাম্‌প্লিফায়ারে গলা বাজতে লাগল ঝম ঝম করে; "মিঞা সাহেবরা এই পাকিস্তান এমনি এমনি তৈরী হয় নি। অনেক জান কোরবাণী হয়েছে, অনেক খুন দিতে হয়েছে। কাফেরদের, বখিল্‌দের অনেক কারসাজি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে তবে এই পাকিস্তান। এই পাকিস্তানের শিরে যিনি আছেন, সেই কায়েদ-এ-আজমকে আপনারা অপমান করেছেন। মনে রাখবেন তিনিই পাকিস্তানের শির, পাকিস্তানের খুন, পাকিস্তানের কলিজা,

পাকিস্তানের ঝাণ্ডা। এই পাকিস্তানের মাটিতে যে সবুজ ঝাণ্ডা উড়ছে এখন, এ তাঁরই কীর্ত্তি। তিনি পাকিস্তানের খোদাতাল্লাহ্।"

'খোদাতাল্লাহ্' কথাটার ওপর অস্বাভাবিক জোর দিলেন ফিরোজ-উদ্দিন আইহোক। প্রতিক্রিয়াটা কতদূর প্রসারিত হয়ে পড়েছে, পরীক্ষা করার জন্য কুঞ্চিত দৃষ্টিটা একবার সন্ধানী আলোর মত ঘুরিয়ে আনলেন।

স্তব্ধ জনসমুদ্র। ঘনগর্জ্জিত তরঙ্গ প্রক্ষেপ যেন এক নিমেষে থেমে গিয়েছে।

গলাটা এবার প্রসন্ন গৌরবে উচ্ছল শোনালো ফিরোজউদ্দিন আই-হোকের। এ্যাম্প্লিফায়ারে মসৃণ উচ্চারণ শোনা গেল; "সেই খোদা-তাল্লাহ্, সেই কায়েদ-এ-আজমের নির্দ্দেশ, উর্দ্দু ভাষা শিখতে হবে।"

জন সমুদ্রের সেই স্তব্ধতায় কোথা থেকে অতিকায় একখণ্ড কালো মেঘের ছায়া এসে পড়ল; প্রলয়ের ঢেউএ ঢেউএ মাত্‌লামি সুরু করে দিল একটা ক্ষ্যাপা বিক্ষোভ; অনেকগুলো বজ্রগর্ভ গলা মেঘমন্দ্রে গর্জ্জন করে উঠল; "সুমুন্দির পুতেরা, উর্দ্দু শিখবার লাগব! আস উর্দ্দু শিখি!"

"শালার পো শালা বেইমান। ফির ঐ কথা কইলে একেবারে কোতল কইর‍্যা ফেলামু না?"

"অনেক সইচি; আর না। বুকের খুন দিমু, কলিজার ভাষা না।"

অজস্র কণ্ঠ; চক্রচূড় সাপের মত ফণায় ফণায় অশ্রান্ত গর্জ্জন। 'গয়নার নাও'এ, ক্ষেতে ক্ষেতে সোনালী-ধানের পাল তুলে-দেওয়া বাতাসে বাতাসে, পদ্মা-মেঘ্‌না-ইল্‌সার তরঙ্গক্ষিপ্ত খড়্গাবাঁকে, সোনারঙের ঘাটের পিঙ্গল মশালের শিখা থেকে যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল, তাকে সঞ্চয় করে এসেছে মানুষগুলো।

রক্তের মধ্যে মন্দ্রিত উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে সকলে।

একটা গলায় শোনা গেল ; তাতে ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা বাজছে ; "দে দে সুমুন্দির পুতেগো নিকাশ কইর্‌যা। ওরে রজবালি কোনখানে গেলি ?"

আকাশ-ফাটানো চীৎকারটা কুণ্ডলিত হয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে। অনেকদিনের অসন্তোষ লাভার মত টগবগ করে ফুটছিল বুকের কোন নিভৃত কেন্দ্রবিন্দুতে। এতদিনে, এই মানসমৃত্যুর মুখোমুখি এসে একটা জ্বালামুখীর সন্ধান পেয়ে প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে এসেছে।

সমস্ত কোলাহলের উৎক্ষেপকে বিস্মিত করে আকাশ-সংকেত-করা সগৌরব পতাকাটার তলা থেকে অগ্নিমুখি হাউই উল্কাগতিতে উড়ে গেল কয়েকটা। পান্নার মত সবুজ আলোর ফুল ছড়িয়ে ছড়িয়ে ঝিঁঝিঁ ডাকা ধান ক্ষেতের ওপারে সাঁ করে মিলিয়ে গেল কতকগুলো তুবড়ী, প্রবালের রঙে লাল হয়ে চোদ্দই আগষ্টের অগ্নিলেখা জ্বলতে লাগলো নলখুড়ি গাছের অনেক ঊর্দ্ধে। বিষণ্ণ সন্ধ্যার প্রাক্‌মুহূর্ত্তে তারাবাজীগুলো জ্বলন্ত নীহারিকা-কণার মত আকাশের সুদূর শূন্যতায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে লাগল। আজাদীর অগ্নিবোধন ; পাকিস্তানের পবিত্র মৃত্তিকায় আরাত্রিকের মাতাল নৃত্যছন্দ।

চকিত হয়ে আকস্মিক চমকে দাঁড়িয়ে রইল জলবাঙলার দূরদূরান্ত থেকে আসা নদী আর মাটির সঙ্গে নিবিড় যোগবন্ধনে বাঁধা পরিশ্রমী মানুষগুলো। সকলের দৃষ্টির বিক্ষুব্ধ আয়নায় এখন হাউই তুবড়ীর আতসকুহক ফলিত হচ্ছে।

এ্যাম্‌প্লিফায়ারে গম্ভীর ঘোষণা শোনা গেল ; "মিঞা সাহেবেরা আপনারা বসে পড়ুন। গোলমাল করবেন না। অনেক রকমের বাজী আছে। আসমানে গিয়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ; 'কায়েদে-এ-আজম, জিন্দাবাদ' সব লেখা হবে আগুনের হরফে। আপনারা চুপ করে বসুন।"

বড় ভূইঞা জলিলউদ্দিন চৌধুরীর কণ্ঠ।

প্রলয় গর্জ্জনের মত সহস্র মানুষের বিক্ষোভকে আতসবাজীর ইন্দ্রজাল দিয়ে এক মুহূর্ত্তে শান্ত করে দিয়েছেন ফিরোজউদ্দিন আইহোকেরা।

কয়েকটা উৎসাহিত গলার সাড়া পাওয়া যায়; "আরে বস, বস। দেখাই যাউক না বাজী ফুটান।"

"হ, হ, তাই কর। প্যাটের পোড়া বাজী ফুটান্ দেইখ্যা নিভা। শালারা ঢোল দিয়া মেজবান করছে। খাওয়ানের বেলা আইঠ্যা কলাটাও পাইলাম না। আমরাও দেখুম।"

উত্তেজনা এখন স্তিমিত হ'য়ে এসেছে। অসন্তোষের বারুদে বারুদে উর্দ্দুর আগুন সংযোগ ক'রে আসন্ন একটা দুর্যোগকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল, তেপান্তরী মাঠের শূন্যতায় উড়ে-যাওয়া হাউইএর পক্ষীরাজে সওয়ার হয়ে সে দুর্যোগের মেঘ অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছে।

অনেকে আবার সেই ঘাসের প্রসারিত জাজিমে বসে পড়েছে পাশাপাশি, নিবিড় আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতায়!

ঊর্দ্ধ সঞ্চালী সবুজ পতাকার নীচে কয়েকটা ডে-লাইট আর প্যাট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। উগ্র আলোর বন্যায় প্লাবিত হয়ে গিয়েছে পটভূমিটা।

গোধূলির সোনাবর্ষিত আকাশ ছাই ছাই রঙে আচ্ছন্ন হয়ে এখন নিকষ কালিমায় আবৃত হয়ে গিয়েছে। ধূসর সন্ধ্যার পাণ্ডুলিপিতে আসন্ন রাত্রির বিষণ্ণ কবিতা রচিত হ'চ্ছে। আর তারই পটভূমিতে অগ্নিচম্পকের মত আতসবাজীর উল্লাসমন্দ্রিত সঞ্চার।

"যাই কইস্। বাজীগুলান বড় বাহারের, কি ক'ও ইয়াসীন্ চাচা?"

এই সুবর্ণ সুযোগে আবার তৎপর হয়ে উঠেছে আনসার্ পার্টির স্বেচ্ছা-বাহিনী। এতক্ষণ তাদের বিশেষ সাড়া পাওয়া নি।

"এই ছ্যাম্‌রা; বস্, বস্। বাজানের জন্মে এই বাজী উড়ান দেখ্‌ছিস? ত্যাখ, ত্যাখ; দেখতে দেখতে আটাশ (আশ্চর্য) হইয়া ভির্‌মি খা।"

"আবার ওঠে ; শালাগো লইয়া আর পারা যায় না !"

কয়েকটি কণ্ঠে হিংস্র সম্ভাবনা দোলায়িত হ'ল ; "'শালা, শালা" কইলে তোরে খুন কইর‍্যা ফেলামু।"

শান্তি চুক্তিও শোনা গেল একটি নিরীহ গলায় ; "আরে কাজিয়া কর ক্যান ? চুপ মাইর‍্যা বস।"

আর এমনি সময় ঘটে গেল ঘটনাটা।

চোদ্দই আগষ্টের মহিমাময় আলোতে সমস্ত অপরাধের মালিন্য ধরা পড়ে গিয়েছে ; সমস্ত গুণাহ্‌র ক্লেদ পরিষ্কার হয়ে ফুটে বেরিয়েছে। এ পবিত্র রোশ্‌নাই এই পুণ্য ভূমিতে কোন পচা আবর্জ্জনাই আর অবশিষ্ট রাখবে না, আল্লার এই আজান দেওয়া বেহেস্ত্‌ থেকে সব অপরাধীকে দোজখে নির্ব্বাসিত করে দেবে।

নির্ভুল চোখে দেখেছে বড় ভূইঞা জলিলউদ্দিন চৌধুরী। কে যেন ঝিঁঝিঁর ডানা-কাঁপা আর জোনাকি-জ্বলা ধানের ক্ষেতে নেমে গিয়েছে সতর্ক পদসঞ্চারে। কিন্তু সে জানে না, বড় ভূইঞার গৃধিনী দৃষ্টিকে এত অনায়াসে প্রতারণা করা যায় না।

পাকিস্তানের গৌরববাহী সবুজ পতাকার তলায় একটা ত্রস্ত প্রস্তুতির সাড়া পড়ে গেল ; "চোর, চোর। টেটাটা কই ? কোচ কই ? লাঠি আন।"

সশস্ত্র বাহিনী দুর্ব্বল শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ধানের ক্ষেতের দিকে দৌড়ে গেল। ডে-লাইটের উগ্র আলোতে বল্লমের ফলায় ফলায় জিঘাংসা ঝিলিক দিয়ে উঠল।

জরদগ্ধ দেহটা নিয়ে পাশের খালে নেমে যাবার আগেই সমস্ত পৃথিবীটা একটা ভূমিকম্পের নাগরদোলায় যেন কেঁপে উঠল ; বুক সমান ধান, আর

জলের নীচে পা রাখবার কোন মাটির স্নেহাশ্রয়ই যেন নেই আজমের। সামনের আতসবাজীজ্বলা রামধনু রঙের আকাশটা কেমন যেন স্তিমিত হয়ে আসতে সুরু করেছে মন্থর চেতনায়। বল্লমটা এসে সোজা কোমরের ওপর গেঁথে গিয়েছে।

একসময় অব্যর্থ শিকার নিয়ে বড় ভূইঞার বাদশাহী পয়জারের নীচে উপহার দিল সশস্ত্র বাহিনীটা। মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠল জলিলউদ্দিন চৌধুরী; "আরে এ যে আজম!"

গণি মৌলবী লাফিয়ে গিয়ে মাইকটা চেপে ধরল, তার পর গলার সমস্ত বিষ ঢেলে চীৎকার করে উঠল; "এই যে আজম, পাকিস্তানের দুশ্‌মন। আপনারা দেখে রাখুন মিঞা সাহেবেরা, আপনাদের আজম কবিদার, চোর। এমন একটা দিনে ধানের ক্ষেতে চুরি করতে গিয়ে আজাদীর বেইমানী করেছে।"

একে একে পালা এলো সকলের। ফিরোজউদ্দিন আইহোক, জলিলউদ্দিন চৌধুরী, কেরামত। সেদিনের জ্বালাটা নির্ব্বাপিত করবার প্রয়াস পেল দুবার হজ-ফেরত ইদিলপুর মসজিদের ইমাম সাহেব; "চোরের ছেলে কি আর পয়গম্বর হয়, না পীর হয়? হয় ডাকু। নইলে এত মানুষের চোখের ওপর দিয়ে ধানের ক্ষেতে গিয়ে নেমেছে। ব্যাটা পাকিস্তানের ইবলিশ্‌।"

প্রথমটা আহত বিস্ময়ে বিগতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল মানুষগুলো। এবার ক্ষিপ্ত উত্তেজনায় কালো কালো মাথাগুলোকে উদ্ধত ভঙ্গিতে আকাশের দিকে তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখে চোখে তাদের আসন্ন অকাল বৈশাখীর ঘোষণা।

ওপরে পান্নার দ্যুতি ছড়ানো সবুজ পতকা, নীচে চুনীর মত জ্বালাবর্ষী আজমের ঘনরক্ত। মনসামঙ্গলের দেশে প্রথম রক্তপাত।

সহস্র মানুষের অভিনন্দিত কবিদারের রক্তপাত। মানসশিল্পীর রক্তপাত।

সাত

মনসামঙ্গল, রৈবতক, শিবায়নের সেই জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধিপত্রে কবির হৃৎপিণ্ডবিদারী একঝলক রক্ত এসে উজলে পড়েছে। মায়ালোকের সেই বিচিত্র নামগুলোর রহস্যময় শোভাযাত্রা—বিজয় গুপ্ত, নয়ন চাঁদ, ময়ূরভট্ট, কানা হরি দত্ত, ষষ্ঠীবর মৈত্র; সব এখন একটা নিকষ কালো যবনিকার আড়ালে সরে গিয়েছে।

শ্রাবণের রৌদ্রদীপিত দুপুর। পেছনের ছায়ামসীমাখা আমরুজ গাছের পত্রশাখা থেকে একটা ঘুঘুর তৃষ্ণার্ত্ত আর্ত্তনাদ শোনা যাচ্ছে; কোথায় কোন গুলঞ্চলতার কারুখচিত বেতস-কাঁটার ঝোপ ডাহুক-ডাহুকীর দাম্পত্য রসালাপে মুখর হয়ে উঠেছে।

খাপরা ছাওয়া দোচালা ঘরের জীর্ণ বিছানায় শুয়ে শুয়ে আজমের স্তিমিত চেতনার ওপর একটি কণ্ঠই কেবল আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে গজরাতে লাগল। পাকের ঘরের ঘেরাটোপ থেকে রোশেনার ধাতব গলার বাজনা বাজছে সপ্তমে; "শয়তানের ছাওএর খেজমত করতে লাগব; ওগো আমার বাজান—তুমি আমারে এই নিঃবইংশ্যা ডেকরার লগে দিছিলা নিখা। আমারে খাটাইয়া খাটাইয়া, না খাওয়াইয়া জান আঙ্গার কইর‍্যা দিল। বাজান গো, তোমার মনে এই আছিল। হেইর পর আবার এই বান্দীর ছাও আইল এতদিন পরে। কপালে সান্‌কি মাইর‍্যা খেদাইছি এক ফির, আবার আইস্যা উঠ্‌ছে। আমার হাড্ডি ভাজা ভাজা কইর‍্যা খাইল।

কোচের ঘাই খাইয়া আইছে! না খাটনের মতলব, কাছিমের ছাওএর কামের নামে জ্বর আসে।"

নিরবচ্ছিন্ন গতিতে একটানা নির্মম ছন্দে রোজকার মতই কথাগুলো আবৃত্তি করে চলেছে রোশেনা। বাজান বাড়ী নেই। সোনারঙের বন্দর থেকে ইলসা জাল বাইতে গিয়েছে পদ্মার দিকে। বাড়ী থাকলে রোশেনার সঙ্গে সম্মিলিত কণ্ঠে দ্বৈত সংগীত আরম্ভ করে দিত নির্ঘাৎ। মোরগডাকা সকাল থেকে শিয়াল ডাকা ত্রিযামা পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত্তে এই শব্দভেদী তীরগুলো বিদ্ধ হ'তে হ'তে অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছে অনুভূতি থেকে। এখন মসৃণ অভ্যাসে অতটা বেদনা উপলব্ধি হয় না।

ঘরের ভেতর থেকে খোলা ঝাঁপের বাইরে অনেক, অনেক দূরের নিঃসীম শূন্যতায় রৌদ্রজ্বলা আকাশ দেখা যায়; রাশি রাশি রূপালী অভ্রের মত পতঙ্গ যেন উড়ে বেড়াচ্ছে। চোখের উপর ঠিকরে ঠিকরে বিচ্ছুরিত হচ্ছে একটা শাণিত দ্যুতি। চোখ দুটো যেন জ্বালা ক'রে উঠল আজমের। ঐ সূর্যটার সঙ্গে কালরাত্রির কোচের আঘাতটার একটা যেন সাংঘাতিক রকমের সম্পর্ক রয়েছে, সম্পর্ক রয়েছে তারই হৃৎপিণ্ড ছেঁড়া লাল রক্তের সঙ্গে, সম্পর্ক রয়েছে রোশেনার বিষবমির সঙ্গে, রমিনার বর্ষণঘন নীল চোখের সঙ্গে, সোনারঙের মশালের পিঙ্গল আলোয় দীপিত অজস্র বন্যকঠিন মুখের সঙ্গে। ঐ সূর্যটার মতই কি একটা অস্পষ্টজানা অথচ শুভ্রোজ্জ্বল পথ তাকে সম্মোহনে আচ্ছন্ন করে নিয়ে গিয়েছে অপরূপ জ্যোতির্লোকে—মনসামঙ্গল, শিবায়ন, পদাবলী, রৈবতকের রহস্যময় দেশে। বিজয় গুপ্ত, বিদ্যাপতি, বলরামদাস, নারায়ণ দেব—এই নাম গুলির সপ্তর্ষিমণ্ডলে সেও একটি দ্যুতিমান্ নক্ষত্রের মত স্থান করে নেবে; একটি ধ্রুবতারার মত সহস্র দৃষ্টির সাম্‌নে প্রেরণাময় দিশারী হয়ে থাকবে!

কিন্তু দৃষ্টিটা যেন ঝলসে যাচ্ছে তার। ধীরে ধীরে চোখের পাতা বুজিয়ে দিল সে।

সোনারঙের ঘাটে প্রথমদিনের আসরশেষের রাত্রিটার মত চেতনাটা কেমন যেন প্রক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে। চৈত্রের ঘূর্ণিওড়ানো বাতাসে ঝরাপাতার মত পাক খেয়ে চলেছে কয়েকটা দিন, কয়েকটা নাম, কয়েকটা ঘটনা। উর্দ্দু! বাঙ্‌লা ভাষা! ভূইঞা বাড়ীর দূর্বার গালিচা-বিছানো জমিতে অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত সবুজ পতাকা! ইমাম সাহেব! রমিনা! নতুন বিবি ফুলবানু! বাজানের ঘরে রক্তবমির উগ্র অম্ল-আঁশ্‌টে গন্ধ! শেষ আউশ দীঘা বাইল ধানের ক্ষেত! হৈ হৈ একটা উল্লসিত আক্রমণের মধ্যে জ্বরদগ্ধ দেহে কোচের আঘাত! তারপর আজ আকাশের কপালে রাজটীকার মত সূর্যটা পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠবার পর চেতনা প্রাপ্তি। সব কেমন যেন অনেকদিন, অনেক স্বপ্নের অসংলগ্ন টুক্‌রো দিয়ে সাজানো; কোন সংগতি নেই, কোন পারম্পর্য নেই, নেই কোন ছন্দোসুরের ধারাবাহিক মিল।

কোমরে পুরু ব্যাণ্ডেজের নীচে যেন একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার তরঙ্গ নড়ে বেড়াচ্ছে। পাশ ফিরতে অসহ্য বেদনা জ্বালা ছড়াতে থাকে; পেশীগুলো কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। এবার মৃদু আর্ত্তনাদ করে উঠল আজম।

সৎ-ভাই খলিল ঘরে এসে ঢুকল।

মুখ তুলে তাকালো আজম; "কে রে খলিল না কি? একবার আম্মারে ক' আমার বড় ক্ষুদা পাইছে। বড় ক্ষুদা।"

"ক্ষুদার কথা পরে কইও ভাইজান, ছোট ভূইঞা আর হাজিরদ্দি চাচারা আইছে। তোমার লগে দেখা করতে চায়। ডাইক্যা আনি?"

একবার উঠে বসবার প্রাণান্তকর প্রয়াস পেল আজম। পরক্ষণেই যন্ত্রনায় মুখখানা বিকৃত করে ছিন্ন বিছিন্ন কাঁথার ওপর টলে পড়ে গেল, "যা ডাইক্যা আন।"

একটু পরেই ঘরের ভেতর চলে এলো মনস্থর, হাজিরদ্দি, কাশেম আলী, ইয়াসীন্ আর কয়েকজন মাঝি কৃষাণ। সোনারঙের ঘাটে আসরজমানো সেই সব প্রতিজ্ঞাদীপ্ত পরিশ্রমী মানুষ।

ঝাঁপের বাইরে অনেকগুলো আমরুজ গাছ মায়ের কোলের মত পত্রছায়া বিছিয়ে দিয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরো অনেকে। গামছা পেতে বসে পড়েছে কেউ কেউ। সমস্তগুলো দৃষ্টি আজমের ঘরখানার দিকেই একটা করুণ প্রার্থনার ভঙ্গিতে কেন্দ্রিত হয়েছে।

ছেঁড়া বিছানার একপাশে বসতে বসতে অদ্ভুত কোমল গলায় ডাকল মনস্থর; "আজম, আজম ভাই!"

"ক'ন ভাই সায়েব।"

"কেমন লাগছে এখন? তুমি ভয় পেয়েছ?"

বাইরে চখাচখীর ছায়া উড়ে-যাওয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে নিরুত্তর রইল আজম। সত্যি তার ভয় লেগেছে। মনসামঙ্গলের ভেতর থেকে সেই ভোজবাজীর মায়া মাখানো পথটা এ কোন রক্তপাতের বিভীষিকায় নিয়ে এলো তাকে! মেঘ্‌নাপারের সেই অজস্র মানুষের দাবী নিশ্চেতন করে অপঘাতের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে তাকে। ঐ বইগুলো, তারপর ভাই সাহেবের আশ্চর্য কতকগুলো কথা! এই হিরণ্যগর্ভ ফসলের অকৃপণ পৃথিবীতে না কি সকলের সমান স্বাধিকার, সমান দাবী—এই কথাগুলো চেতনাকে কেমন যেন ঘূর্ণিত ক'রে দিয়েছিল; একটা আশ্চর্য চমকে মনের তলা থেকে সাঁ করে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছিল চক্রচূড় সাপটা।

তারও পর বাঙ্‌লা ভাষা! বাজান নানা আর পূর্ব্বগামীদের রক্তকণিকা দিয়ে বানানো এক একটি শব্দ; পবিত্র কোরাণশরীফের এক একটি 'সুরা'।

তা সত্ত্বেও কালকের কোচের আঘাত লাগার পর কোন প্রেরণাই

পাচ্ছে না আজম। সমস্ত শক্তির উৎসমুখ যেন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে; অনুভূতির ওপর চম্‌কে চম্‌কে নেচে যাচ্ছে মৃত্যুর তুহিন বিভীষিকা; চেতনার ওপর দুল্‌ছে একখণ্ড কালো আতঙ্কের সঞ্চার। চোখ দুটো বুজে নির্জীবের মত পড়ে রইল আজম।

তবু রেহাই নেই। ইন্দ্রিয়গুলো ফুঁড়ে যেন অনেকগুলো ঝক্‌ঝকে চোখ মর্ম্মগ্রন্থিকে স্পর্শ করেছে। কম্পিত গলায় আজম বলল; "না না ভাই সাহেব আমি পারুম না। আমার বাজান আম্মা আছে। তারা না খাইয়া থাকে; তাগো খাইট্যা খওয়াইতে হইব। ঐ সব সব্বনাইশ্যা কাম আমি পারুম না।"

কোমলতম হাসির প্রশ্রয়ে মুখখানা আভাসিত হয়ে গেল মনসুরের; "বাজান আম্মা না খেয়ে থাকে, জরু-বেটিরা পেটের জ্বালায় গলায় দড়ি দিয়ে মরে—সেই কথাগুলো তো বলতে যেতে হবে। সেই খবর তো জানিয়ে আসতে হবে। তোমার ভয় পেলে তো চলবে না ভাই। আমাদের আবহমানকালের ভাষায় সেই প্রতিবাদের কথা শুনিয়ে আসতে হ'বে। তোমার কোচের ঘা লেগেছে। খবর পেয়ে আমি আজ সকালেই চলে এসেছি ঢাকা থেকে। তুমি মেঘ্‌না পারের দেশের অজস্র মানুষের কবিদার, দেশের মানুষের মন তোমরাই তো তৈরী করে দাও যুগে যুগে। তোমার ভয় পেলে, তুমি দুর্ব্বল হয়ে পড়লে তো চলবে না। দেখো, তোমার বাড়ীতে এই মানুষগুলো এসেছে। তাদের দিকে তাকাও।"

আবেদনের করুণ আকুলতা ফুটে বেরুল মনসুরের কণ্ঠে।

সোনারঙের ইল্‌সা মাঝি হাজিরদ্দি বলল; "তোর ডরের কিছু নাই আজমা। আমরা আছি; আগে জান্‌লে কি আর কোচের ঘাইটা তোরে খাইতে দিতাম, আমরাই বুক পাইত্যা লইতাম। তুই আমাগো কবিদার।

তোর গলায় আমাগো দুঃখুর কথা, পরাণের কথা বাজে। তোরে আমরা মরতে দিতে পারি!”

ভাই সাহেব! হাজিরদ্দি! কি আশ্চর্য কথা বলে এরা; কথার যাদুস্পর্শে সমস্ত চেতনাকে কেমন যেন অবশ ক’রে আনে। নিজের সমস্ত আপত্তি মেঘ্‌নার খরস্রোতে একটুকরো কুটোর মত ভেসে যায় আজমের। নির্ব্বাক চোখ দুটো সকলের মুখের দিকে অপার বিস্ময়ে তুলে ধরল আজম।

বাইরে আমরুজ গাছের ছায়ামাখা আবেষ্টন থেকে অজস্র গলার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন ভেসে আসে; “আমরা আছি তোর পিছনে। তুই ত অন্যায় কিছু করস নাই। আমাগো কথা তো তুই-ই কইতে যাবি; তুই আমাগো কবিদার। প্রয়োজন হইলে তোর সংসার আমরা দেখুম।”

আশ্চর্য হয়ে যায় আজম! তার জন্য এত স্নেহ, এত ভালবাসা, এত নিবিড় আত্মীয়তার সঞ্চয় রয়েছে, পদ্মা-মেঘ্‌না-ইল্‌সার পারে পারে সহস্র মানুষের আন্তরিক স্বীকৃতিতে। তবে সে একটা কুহকিত পথে ভ্রান্তির স্বর্ণমারীচ সন্ধান করতে গিয়ে অপমৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানায়নি! নতুন পৃথিবী, সত্যিকারের পৃথিবী তাকে ডাক দিয়েছে, ডাক দিয়েছে তার মধ্যে অধিষ্ঠিত সেই চিরকালের কবিপুরুষকে।

মনসুর আবারও বলতে সুরু করেছে। সোনারঙের কেরায়া ঘাটে অনেকদিন আগে বহুদূরের বায়ু-আশ্রয়-করা সেই রহস্যময় কণ্ঠটা বাজছে এই রোদ-জ্বলে-যাওয়া শ্রাবণশেষের নির্ম্মম দ্বিপ্রহরে; “জানো আজম; ঢাকায় ভয়ঙ্কর অবস্থা সুরু হয়ে গিয়েছে। বাঙলা ভাষাকে ওরা জবাই করতে চাইছে; তাই এ ক’দিন আসতে পারি নি গ্রামে। ছাত্ররা ক্ষেপে গিয়েছে। তাদের মধ্যে দিনরাত কাজ করতে হচ্ছে। একটু নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। আমি সহরে কাজ করছি; তোমার কাজ গ্রামে আজম। তুমি ছাড়া ঐ মানুষগুলোকে কেউ বোঝাতে পারবে না।”

সহসা সব কিছু ছাপিয়ে পাকের ঘরের অন্তরাল থেকে রোশেনার ধাতব কণ্ঠের ঝঙ্কার ভেসে এলো। খুব সম্ভব খলিল তাকে আজমের ক্ষুধার জ্বালাময়ী সংবাদটা ইতিমধ্যেই দিয়ে ফেলেছে; "বাদ্‌শজাদা হইছে বান্দীর ছাও। ক্ষুদা পাইছে! বাসি আখার ছাই রইছে, তাই দিমু। মাইন্‌ষে কাম করতে কইব—তাই কোচের ঘাই খাইয়া আইছে। সানকিতে ভাত আসে কোথা থিকা?"

বিব্রত দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে তাকালো আজম; তার চোখে বিনীত কান্না ঘনীভূত হয়ে রয়েছে।

বিষণ্ণ মুখে ক্লান্ত করুণ হাসি হাসল মনসুর; "আমি জানি শিল্পীর জীবনে সুখ নেই, শান্তি নেই। দেশের মানুষকে তারা আত্মীয় করে নিয়েছে। দেশের মানুষের বেদনা তাদের কাঁদায়, হাসি তাদের হাসায়। ঘরের লোক গঞ্জনা দেয়। ওটুকু তাদের প্রাপ্য, তাদের পুরস্কার। ওটুকু যুগে যুগে সব কবিদাররাই পেয়েছেন। ঐ জন্য ভয় করলে চলবে না। যাক্ ওসব কথা।"

"তোমার কাজ দেখে আশা হচ্ছে, বাঙ্‌লা ভাষাকে কেউ মারতে পারে না; কেউ পারবেও না। চাচাজানের বাড়ীর মিটিঙে না কি খুব গণ্ডগোল হয়েছিল! আমার আসার ইচ্ছা ছিল কিন্তু নারায়ণগঞ্জে একট মিটিঙ্ ছিল বলে আসতে পারি নি আজম ভাই।"

"দারুণ গোলমাল হইছিল। সহর থিকা ন্যাতা (নেতা) আইস্যা আমাগো কি এক বিজাত ভাষা শিখতে কয়! আমরাও গরম হইয়া উঠলাম।" হাজিরদ্দির গলায় আজাদীর দিনের মিটিঙে যে দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছিল, তারই নির্মম আভাষ।

আচম্‌কা হাউ হাউ করে উচ্ছ্বসিত বন্যার প্রখর তরঙ্গে তরঙ্গে কান্না নেমে এলো আজমের সর্ব্বাঙ্গে; "আমারে মাপ্ করেন আপনেরা। আমি

কাইল চুরি করতে গেছিলাম ; আমার গুণাহ্ হইছে।" দু'টি নির্জীব করপল্লবের ঘেরাটোপে মুখখানা লুকিয়ে ফেলল আজম।

মনহুরের কণ্ঠ থেকে এবার মায়ের স্নেহ নির্বারিত ধারায় ঝরতে সুরু করেছে ; "এখন কেঁদো না আজম, তোমার শরীর ভয়ানক দুর্ব্বল! কি জন্য চুরি করতে গিয়েছিলে, সব শুনেছি। চুরি ; একে চুরি বলে না। সন্ধ্যার অন্ধকারে নয় ; যাতে দিনের ঝক্ঝকে আলোতে ঐ সোনালী ফসলের দাবী করতে পারো, সেই কথাই বলতে যেতে হবে সকলের। বাজান নানার ভাষায় ঐ প্রতিবাদের কথা বলতে যতটা জোর পাব, বিজাত ভাষা লিখে কি সে জোর পাব? বাঙলা ভাষা যে আমাদের ভরসা ভাই, একমাত্র অস্ত্র। তাকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের নিরস্ত্র করে দিতে চাইছে শয়তানেরা।"

"সত্য কথা! ঐ ভাষা দিয়া কি আমরা যুদ্ধ করতে পারুম ভাইসাহেব?"

উত্তেজনায় স্তিমিত দৃষ্টিতে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে গেল আজমের।

"নিশ্চয়ই পারবো। তুমি তো ঢপের দলে ছিলে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য পড়েছো। দধীচি মুনি দানব বধের জন্য নিজের হাড় দিয়েছিলেন। সে হাড়ে বজ্রবাণ তৈরী করা হয়ে ছিল। বাঙ্লা ভাষা যারা বধ করতে চাইছে ; তাদের প্রতিহত করতে হ'বে। আমাদের সকলের বুকে সেই দধীচির হাড় রয়েছে। সেই কথাটা একবার বলে দাও সোনারঙের কেরায়া ঘাটে, সে ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ুক ঢাকা-বরিশাল-কুমিল্লার দিকে দিকে। মানুষের দাবীকে স্বীকার করে নাও। মানুষই তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। শোন একটা কথা, শরীরটা ভালো হ'লে সোনারঙের ঘাটে আসর জমিয়ে মানুষগুলোকে বলে দিও, এবার আমাদের নৌকার বদলে বলতে হ'বে কিশ্তি, কুটুম্বের বদলে মেহ্মান, কর্ত্তব্যের বদলে ফর্জ, ভব্যতার বদলে তমীজ, অ, আ, ক, খ র দেশে, মনসামঙ্গল, রৈবতকের মাটিতে আলিপ, বে, পে, সে, জিম, হে, খে মুখস্ত করতে হ'বে। ঐ শর্ম্মিষ্ঠা, ঐ শিবায়ণ, ঐ

অন্নদামঙ্গল, দাসুরায়ের ঐ পাঁচালী মেঘ্‌নার জলে ভাসিয়ে দিতে হবে, নয় আগুন দিয়ে ওরা জ্বালিয়ে ছারখার করে দেবে।"

"না না, তা হইতে পারে না ; আমরা হইতে দিমু না।"

উত্তেজনায় আর্ত্তনাদ করে উঠে বসল আজম। চম্‌কে উঠল হাজিরদ্দি।

আজমের পিঠের ওপর হাত বিছিয়ে প্রশমনের শীতল চন্দনস্পর্শ দিতে দিতে আবার জরাজীর্ণ বিছানায় তাকে লগ্ন করে দিল ইয়াসীন্। মৃদু হেসে ভাইসাহেব বলল ; "আমরা এখন যাই আজম, এখনই ঢাকায় যেতে হবে। জরুরী কাজ আছে। পরশু তোমার জন্য কয়েকখানা বই নিয়ে আসব। তোমার খোঁজ নিয়ে যাব ; এই টাকা দশটা রাখো।"

জামার পকেট থেকে একখানা দশটাকার নোট বের করে আজমের হাতে গুঁজে দিল মনহুর ; "মনে রেখো আজম, তোমার কাজ শুধু এখানেই নয়। আমার সঙ্গে ঢাকায় যেতে হবে। কোচের আঘাতই শেষ আঘাত নয়। আরও আঘাত আছে—বন্দুক-কামান-গুলীর অভ্যর্থনা রয়েছে আমাদের জন্যে। কিন্তু আমাদের প্রতিবাদের ভাষাকে, আমাদের বাজান নানার ভাষাকে, আমাদের মনসামঙ্গলের ভাষাকে রক্ষা আমরা করবই। তার জন্য প্রস্তুত থেকো।"

হাজিরদ্দি বল্‌ল ; "হ, হ, ভাইসাহেব আমরাও আছি। আজমা আমরা এখন যাই। ভাটির টানে মাছ মারতে যাইতে হইব সেই পদ্মায়। রাইতে আইস্যা আবার তোরে দেইখ্যা যামু বেবাকে মিলা।"

এক সময় বাইরের অভ্রজ্বলা দিনদুপুরে বেরিয়ে গেল হাজিরদ্দি, মনহুর, কাসেম আলী আর মাঝি কৃষাণেরা। তার পর আমরুজ গাছের পাতা দিয়ে ছায়ার স্নেহ রচনা-করা পটভূমি থেকে সমবেত মানুষগুলোর সঙ্গে দূরে মিলিয়ে গেল।

ঘরের বাইরে এতক্ষণ একটা অতিকায় ভামের মত ওত পেতে বসেছিল

রোশেনা। মনস্থর বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে আজমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। দশ টাকার নোটটা ছিনিয়ে নিয়ে দৃষ্টি থেকে আগুন ঝরাল এক ঝলক; "বান্দীর বাচ্চা!"

আট

শ্রাবণ শেষের খড়্গদীপ্ত রোদের দুপুরে ফুলবানুর গলায় আকস্মিক দেয়া চমকে উঠল; "হারামজাদী বান্দীর বাচ্চা, ঐ চোরের সঙ্গে মব্বৎ করে পালিয়ে যেতে চাও। তোকে আজ কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে মেঘ্‌নার জলে ভাসিয়ে দেব না! কেনা বাঁদী আবার আজাদী পেয়ে গেলি না কি! পেত্নীর বাচ্চা কাছিম!"

হাতে একটা আটকিরার কাঁটাভরা ডাল ভেঙ্গে দাঁড়িয়েছে ফুলবানু, শরীরের প্রতিটি রক্তকোষে পবিত্র বীররসের মৌতাত টগবগ করে ফুটছে। সূর্ম্মাঙ্কিত চোখে সাপের মাথার মণি ঝলস।

সত্তার মধ্যে যেন কোন চেতনা নেই, সমস্ত রক্ত সরে গিয়েছে মুখ থেকে, ঘননীলিম সন্ধ্যাতারার মত চোখ দুটিতে একটা স্পন্দিত জীবনের অপমৃত্যু ঘটেছে যেন। লক্ষছিন্ন ডুরে শাড়ীটার অন্তরালে আসন্ন অপঘাতের আশঙ্কায় রমিনার প্রস্তরীভূত দেহে ভাবলেশহীন প্রস্তুতি।

"কি কথা বল; নইলে খুন করে ফেলব একেবারে।"

কণ্টকচিহ্নিত আটকিরার ডালটা রমিনার পিঠের ওপর সপাং ক'রে আছড়ে পড়ল; পেশীগুলো সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে গেল তার। বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল রমিনা; "কি কমু ক'ন বিবিজান?"

"আবার চিল্লাচিল্লি করে! শয়তানের বাচ্চা জিগ্যেস করি পালিয়ে যেতে চাইছিলি কেন?"

বায়ুতরঙ্গ ছিন্ন করে আট্‌কিরার কাঁটাভরা ডালে আর একটি শব্দ উঠল। পিঠের ওপর আর একটি রক্তাক্ত পুরস্কার; রমিনার কণ্ঠে আর একটি আর্ত্তধ্বনিত চীৎকার; "রোজ রোজ অত মাইর সইহ্য হয় না। আমি আপনের কী করছি? পলাইয়া যাইতেই তো চাইছিলাম। ফাক পাইলেই পলাইয়া যামু। আমিও মানুষ বিবিজান!"

প্রথমে হতচকিত বিস্ময় ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল ফুলবানুর সর্ব্বাঙ্গে, বলে কি রমিনা! কেনা বাঁদী আবার মানুষ হ'ল কবে! আবার তারই কণ্ঠে মনুষ্যত্বের দাবী ঘোষণা! সমস্ত দুনিয়া কি কোন প্রলয়মাতনে কেঁপে কেঁপে উঠেছে; দাবাগ্নি লেগেছে কি কোথায়ও, ভূকম্পনের উৎক্ষেপে পৃথিবীর পরিচয় কি পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল! কিন্তু সত্যিই দাবাগ্নি লেগেছে, তারই খরদাহ হু হু করে সমুদ্র বাতাসে সওয়ার হয়ে ছুটে আসছে, সত্যিই ভূমি-কম্পে পৃথিবী প্রমত্ত হ'য়ে উঠেছে। এ খবর ফুলবানুর মধ্যযুগীয় বেগমী মনে এখনও এসে কোন আন্দোলন তোলে নি। এ অগ্নিপ্রদীপ্ত সংবাদ আসার আগভাগ পর্যন্ত তার হাতে আটকিরার কাঁটাভরা ডালটাই বা আড়ষ্ট হয়ে থাকে কেন?

হত্যার আদিম উল্লাসে আটকিরার ডালটা বায়ুস্তরে হিংস্র শব্দ তুলে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল রমিনার শুভ্রপদ্ম কমনীয় দেহটার ওপর। পাশাপাশি অনেকগুলো রক্তচিহ্ন। মধ্যযুগীয় বেগমী মেজাজের সগৌরব স্বাক্ষর। রমিনার বিগতচেতন দেহটা টেনে পাশের পাটগুদামে ফেলে রেখে বাইরে থেকে শিকল টেনে দিল নতুন বিবি ফুলবানু। পরিতৃপ্তির উজ্জ্বল হাসিতে মাংসল গাল দুটো গোলালো হয়ে উঠতে লাগ্‌লো; "পালিয়ে যেতে

চাস। যা কেমন করে পালাতে পারিস। একটু একটু করে শুকিয়ে মারব এই গুদামে। হারামজাদী বান্দীর বাচ্চা কাছিম।"

হাতের মুঠোতে আটকিরার কণ্টকিত ডালটা তখনও বিজয় গৌরবে ধরা রয়েছে ফুলবানুর। কাঁটাগুলোর ওপর রমিনার রক্তমাংসের চিহ্ন জড়ানো। সে দিকে তাকিয়ে আর একবার হিংস্র পুলকে হেসে ফেলল ফুলবানু।

* * * *

শরীরের সমস্ত রক্ত ফেনিয়ে ফেনিয়ে ব্রহ্মতালুতে এসে জমা হয়েছে বড় ভূইঞা জলিলউদ্দিন চৌধুরীর। সহরের নেতারা দস্তরমত শাসিয়ে গিয়েছেন। এতদিনের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, ফুডকমিটির সেক্রেটারী—ইত্যাদির একচ্ছত্র ময়ূর সিংহাসনের নীচে ভিত্তি ভূমিটা টল মল করে নড়ে উঠেছে। যে কোন মুহূর্তে ইদিলপুরের খুরশেদ মিঞাকে অভিষিক্ত করা হবে সেই রাজাসনে, এমনি একটি ভয়ঙ্কর আশঙ্কার ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন নেতারা।

আইহোক সাহেব তো পরিষ্কার বলে দিয়েছেন। এই ইল্‌লিটারেট ম্যাস্‌। একেবারে নরম কাদার মত এদের মন। যেমন খুসী এদের দিয়ে কাজ করানো চলতে পারে। খেয়াল মত এদের তৈরী করে নেওয়া যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য জায়গায় বেশ সন্তোষজনক ম্যাস্‌ অর্‌গেনাই-জেশনের খবর পাওয়া গিয়েছে। অথচ ইষ্ট পাকিস্তানের গ্রামে তাদের মত দোর্দণ্ডপ্রতাপ ভূইঞারা থাকতে কি করে যে মানুষগুলোর মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে ভেবে উঠতে পারেন নি আইহোক সাহেব। কয়েদ-এ-আজম্‌কে অগ্রাহ্য করে পাকিস্তানের মাটিতে বাঙলা ভাষার জন্য কৃষাণ-মাঝি, জেলে-জোলারা কি করে জোট পাকায়, এ তাঁর ধারণার বাইরে। এর পেছনে নিশ্চয়ই জলিলউদ্দিন চৌধুরীর কোন

অদৃশ্য নির্দেশ কাজ করে চলেছে—এমন কুটিল সন্দেহের বিষ সঞ্চয় করে ফিরে গিয়েছেন তাঁরা।

আলী হোসেন ইস্লাম টেবিলের ওপর আড়াই সেরী পাঞ্জা আছড়ে চীৎকার করে উঠেছিলেন, "উর্দ্দু প্রচার করতেই হবে গ্রামের রিমোট কর্ণারে কর্ণারে। এর জন্য আমরা প্রয়োজন হ'লে কম্পিটেণ্ট্ হ্যাণ্ডকে এখানে আনব।"

কম্পিটেণ্ট্ হ্যাণ্ড্! দাড়ির শালমহুয়ার অরণ্যে দাঁত ঘষার বজ্রগর্ভ শব্দ। কম্পিটেণ্ট্ হ্যাণ্ড্—হ্যাঁ, নিজেকে সব দিক থেকে তাই প্রমাণিত করতে হবে। নইলে ইদিলপুরের খুরশেদ মিঞা থাবা পেতে বসেই আছে। দুর্ব্বলতার বিন্দুমাত্র রন্ধ্রপথ পেলেই একেবারে তখত্-এ-তাউসে এসে আসীন হ'বে নির্ঘাৎ। তা ছাড়া একমাস পরেই আবার নেতারা আসছেন সোনারঙে।

অতএব টু বি কম্পিটেণ্ট্। কিন্তু কেমন করে?

মাথার ভেতর রক্ত বিঘূর্ণিত হয়ে চলল অবিশ্রাম, আদ্দির আদিরসাত্মক আবরণের নীচে রোমশ দেহে কালঘাম ছুটল দরবিগলিত ধারায়।

আচম্কা দাড়ির অরণ্যে অনেকদূর থেকে যেন একটুক্রো সম্ভাবনার আলো এসে পড়েছে বড় ভূইঞার।

এই জেলে-জোলা, কৃষাণ-মজুরের নির্ব্বিরোধ পৃথিবী, যেখানে কেবল আত্মসমাহিত প্রশান্তি; সেখানে এ কোন কালবৈশাখীর দোলা এসে লাগল, কোন ঝড়ের উৎক্ষেপে সাধারণ মানুষগুলোর মধ্য থেকে এ কোন সর্ব্বনাশা আত্মপ্রকাশের সংকেত! তার সামান্য একটু নমুনা পাবার পর থেকে সমস্ত মনটা তমসাবৃত হয়ে রয়েছে জলিলউদ্দিনের। একটা রক্তাক্ত ভবিষ্যতের আভাষ দিয়ে গিয়েছে কালকের মিটিঙ্টা।

এই ঝড়, এই কালবৈশাখী যে উৎস থেকে ছুটে আসছে হু হু করে; সেই ঈশান কোণের সন্ধান অজানা নয় তার পক্ষে। মনসুর! লাল লাল

অসমান দাঁতের পাটির ফাঁকে নামটাকে কামড়ে ধরল জলিলউদ্দিন। হ্যাঁ, অত্যন্ত নির্মম সত্য যে সে তারই ভাইয়ের ছেলে—একটা পয়লা নম্বরের দুশমন্। দিনরাত উপুড় হয়ে পড়ে বইয়ের দোজখ থেকে একটা সর্ব্বনাশা তথ্য সংগ্রহ করে এনেছে; তারপর ছড়িয়ে দিয়েছে এই মানুষগুলোর মধ্যে। ঢোঁড়া সাপের দাঁতের নীচে গুঁজে দিয়েছে কালকেউটের মৃত্যু গরল।

একবার চমকে উঠল জলিলউদ্দিন। কালকের মিটিঙে সহস্র ঘনগর্জ্জিত ফণার আস্ফালন সে দেখেছে। নেতারা নিরাপদ সহরের দুর্গে থাকেন। প্রথম ছোবল তার ঘাড়েই এসে আছড়ে পড়বে। অতএব গর্জ্জমান ফণা থেকে নীল বিষটুকু নিঙড়ে নিতে হবে। সে বিষ মনসুর!

হোক তার ভাইএর ছেলে! কিন্তু অন্যদিকে ডিষ্ট্রিকবোর্ডের প্রেসিডেন্ট। ফুড কমিটির সেক্রেটারীর মসনদ। তার ওপর নিজের এক হাজার কানি দোফস্‌লা জমি! বাঙলা ভাষার দাবীকে একটু প্রশ্রয় দিলে এই বন্যা কূল ধ্বসিয়ে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এটুকু ধ্রুব বিশ্বাস অন্ততঃ তার আছে। উর্দ্দুর বল্লম দিয়ে ঐ মানুষগুলোর উদ্যত ফণাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে।

মনসুর—এই বন্যা, এই ফণা, এই মৃত্যুবিষ, সবকিছুর একটি মাত্র প্রাণকেন্দ্র। তাকে নিভিয়ে দিতে পারলে সব স্তিমিত হয়ে যাবে। বাঁ চোখের মণির ওপর কুঞ্চিত পাতাটা ফেলে একবার দাঁড়িয়ে পড়ল জলিলউদ্দিন। রাত্রির অন্ধকারে মাত্র একটি ধারালো সড়কির নির্ভুল লক্ষ্যভেদ। তবেই এই বন্যার গর্জ্জন, এই ফণার ফোঁসানি, এই মৃত্যুবিষের বিভীষিকা শিথিল হয়ে যাবে। সোনারঙের কেরায়া ঘাটের আসরে যে দুর্বিনীত প্রতিবাদের অঙ্কুর আকাশের দিকে মাথা তুলেছে, তাকে গুঁড়িয়ে বিচূর্ণ করে দিতে হবে।

মনসুর, হোক তার ভাইয়ের ছেলে। ঘন বিন্যস্ত দাড়ির অরণ্যে বন্য আদিমতার উল্লাস ফেনিয়ে উঠল জলিলউদ্দিন চৌধুরীর।

একটু পরেই আনসার পার্টির কেরামত আসবে। তাকে এই পয়গম্বরী প্রস্তাবটুকু জানিয়ে দিতে হবে। সড়কি চালানোর ব্যাপারে কেরামতের হাত বড় পরিষ্কার। একটা সমস্যার চমৎকার সমাধান হ'ল।

একটু আগেই পশ্চিম আকাশ থেকে গোধূলির রক্তচিতা নিভে গিয়েছে। দূরের কেয়াশরের নিবিড় অরণ্যে আসন্ন সন্ধ্যার আবাহন। আচ্ছন্ন অন্ধকার গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে জমেছে হিজ্জল গাছের পত্রশাখায়। দূর দিগন্তের বৃত্তরেখা ধূসরতায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে আর একটা সম্ভাবনা মস্তিষ্কের প্রেতলোকে বিদ্যুতের মত ঝিলিক মেরে গেল জলিলউদ্দিনের।

দগ্ধদীপ্ত দুপুরে বাইরের এই ঘরখানার প্রলম্বিত গালিচার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিরুপায় অসহায়তায় ফুলবানুর বীররস উপভোগ ক'রছিল জলিল-উদ্দিন। কাছাকাছি যাওয়ার বেপরোয়া সাহস তার ছিল না। ফুলবানুর মেজাজের অনুকূল স্রোতে চললে একটি সোনালী ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশ্বাস আছে। চিটাগাঙের বন্দরে দশটা ধানের গুদাম, চরইসমাইলে এক হাজার কানি বোরোধানের জমি আর ফুলবানু ছাড়া তার চাচাজানের আর কেউ নেই এই পৃথিবীতে। চাচাজান গোরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অতি মসৃণ নিয়মে সব কিছু জলিলউদ্দিনের থাবার মধ্যে চলে আসবে। অতএব ফুলবানুর বিপক্ষে কাজ করতে যাওয়া মানেই নিজের হিরণ্যগর্ভ ভবিষ্যৎকে জবাই করা।

এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সতর্ক ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে উপলব্ধি করেছিল জলিলউদ্দিন, রমিনা পাশের ঐ পাটের ঘরের ভেতর পড়ে রয়েছে।

চারদিকে একবার চনমনে দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিল জলিলউদ্দিন। নাঃ, কেউ কোথায়ও নেই; কোন সন্ধানী দৃষ্টিই তাকে অনুসরণ করছে না।

যতক্ষণ কেরামত না আসে, ততক্ষণ একটু আগের ঝিলিক মারা সম্ভাবনার পৃথিবীটা পরিক্রমা করে আসা যেতে পারে। আসন্ন রাত্রির নিশ্ছেদ অন্ধকার তারই স্বপক্ষে ঘনীভূত হচ্ছে।

বাইরের ঘর থেকে নেমে অকম্পিত পদসঞ্চারে পাটগুদামের শিকলটা খুলে ফিস ফিস করে ডাকল; "রমিনা, ও রমিনা।"

"কে?"

চকিত একটী প্রশ্ন সাঁ করে ছিটকে এলো। খাপখোলা তলোয়ারের মত লাফিয়ে উঠে বসল রমিনা।

চারপাশে টালসাজানো সোনালী পাটের অনুগ্র গন্ধ জমে রয়েছে; ঘরের এক কোণে বিড়ালের দৃষ্টিতে তরল আগুন টলমল করছে।

প্রায় নিশ্চিন্ত গলায় জলিলউদ্দিন চৌধুরী বলল; "চুপ, চুপ, আমি—বড় ভূইঞা সাহেব।"

মাধব বাড়োরীর দেওয়া একশ'টা টাকা আর হ্যারিকেনের রহস্যঘন আলোতে রমিনার পদ্মতনুর কল্পনা মিশে সে দিন একটা মানসিক বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল জলিলউদ্দিনের; এখনও সে দিনের রাত্রিটা ফেনিল রক্তের উচ্ছ্বাসে তরঙ্গিত হয়ে বয়ে চলেছে শিরা উপশিরার গতিপথে। বাঁদীটা বেহেস্ত্ থেকে যেন ডানা দুটো ঝেড়ে ফেলে হুরীর মত সরাসরি নেমে এসেছে পৃথিবীর মাটিতে।

আতঙ্কিত গলায় চীৎকার করে উঠল রমিনা; "আপনে এইখানে আইছেন ক্যান?"

"কেন, এলে কি হয়! খবর নিতে এলাম—তুই কেমন আছিস

এখন? ভাল লাগছে?" শুভাকাঙ্খীর স্বর্গীয় জিজ্ঞাসা জলিলউদ্দিনের কণ্ঠে চকিত হ'ল।

এবার ঝর ঝর করে রমিনার দু চোখ থেকে বর্ষণ সুরু হ'ল। ফোঁস্ ফোঁস্ করে একটা অস্বস্তিকর কান্নার অবারিত বন্যা সুরু হয়েছে। এই কান্নাটাই বরদাস্ত করতে পারে না জলিলউদ্দিন।

"আঃ! থাম থাম, কাঁদছিস কেন? তোর কোন ভয় নেই। তোকে নিয়ে আমি নতুন বিবির কাছ থেকে পালিয়ে যাব। তোকে আর কেউ মারতে পারবেনা।" অপরিসীম আত্মপ্রত্যয়ে রমিনার সুনত্র তনুপদ্মটি ওপরে তুলে ধরল জলিলউদ্দিন, তার অভিজ্ঞ হাত দুটো নারীদেহের গোপন প্রদেশের দিকে আক্রমণের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল।

শরীরের প্রতিটি রক্তকোষ থেকে জীবনের স্পন্দন সরে গিয়েছিল রমিনার। জলিলউদ্দিনের স্থূল সম্ভোগ প্রয়াসের স্পর্শে আকস্মিকভাবে প্রবল উচ্ছ্বাসে চেতনা নেমে এলো রমিনার হৃৎপিণ্ডে। কণ্ঠ বিদীর্ণ করে একটা প্রলয় শব্দ বেরিয়ে এলো; "কে কোথায় আছো, বাঁচাও। আমার সব্বনাশ কইর‍্যা ফেল্লাইল। ও বাজান, ও আল্লা—বাচাও, বাচাও।"

জানালার ফাঁক দিয়ে পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ্চের উগ্র আলো এসে পড়ল ঘরের ভেতরে। টিনের চালা পর্যন্ত স্তূপীকৃত পাটগুলো রেশমের মত চিক মিক করছে। তারই অমার্জ্জিত পটভূমিতে, জলিলউদ্দিনের ব্যাঘ্রবাহুর বন্ধনে একটি নিস্প্রাণ হরিণশিশুর মত কবলিত হয়ে রয়েছে সারাদিনের অভুক্ত রমিনা। বুকের ওপর থেকে ডুরে শাড়ীর আচ্ছাদন সরে গিয়েছে; লাল লাল ফিতের মত ফুলবানুর আটকিরার কাঁটাভরা ডালের সোহাগ রক্তচিহ্নিত হয়ে রয়েছে সেখানে।

টর্চ্চের আলোটা আল্লাহ্‌র কোন অলক্ষ্য আবাসলোক থেকে এসে পড়েনি। খানিকটা আগে কেরামত এসে বসেছিল বাইরের ঘরে। বড়

ভূইঞার জন্য অপেক্ষা করতে করতে রমিনার আকাশ-বিদারী চীৎকারটা শুনে পাট গুদামের দিকে ছুটে এসেছিল।

তারপর পাটের স্তূপের রঙ্গমঞ্চে এই আদিম নাটক। কেরামতের হাতের নির্ম্মম আলোটা এখনও বৃত্তকারে স্থির হয়ে পড়ে রয়েছে; যেন যাচাই করে নিতে চাইছে একটা অবিশ্বাস্য নগ্ন সত্যকে।

পাটের বিছানার ওপর রমিনাকে আছড়ে ফেলে বাইরে বেরিয়ে এলো জলিলউদ্দিন। অতৃপ্তিতে চোখদুটো অরণ্যশ্বাপদের দৃষ্টির মত জ্বলছে; চাপাগর্জ্জনের মত শোনালো তার কণ্ঠ; "কে?"

"আমি কেরামত।"

প্রাণান্তকর প্রয়াসে একটা প্রসন্ন অভ্যর্থনার ব্যস্ততা নামিয়ে আনবার চেষ্টা করল বড় ভূইঞা জলিলউদ্দিন চৌধুরী; "ও তুমি, এসো এসো, বাইরের ঘরে এসো; আমি ভাবলাম আবার কে এলো! তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আর বোল না; কি যেন হয়েছে বাঁদীটার, ভয় পেয়ে আঁতকে উঠেছিল। আমি দৌড়ে গিয়েছিলাম ভয় ভাঙাতে—ও কিছু না।"

দার্শনিক পীরের গম্ভীর গলায় ঘটনাটার পবিত্র ব্যাখ্যা বর্ণনা করল জলিলউদ্দিন।

"হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।"

গলার স্বরটা অস্বাভাবিক রকমের থমথমে কেরামতের। যে কোন একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যেতে পারে—তারই পূর্বাভাষ।

চমকিত ভয়ের কাঁপন লাগল জলিলউদ্দিনের কণ্ঠে; "তুমি কি বিশ্বাস কোরছ না আমার কথা?"

"বিশ্বাস কোরব না, বলেন কি ভূইঞা সাহেব! সব বিশ্বাস করছি। পাটের গুদামে বাঁদীটাকে জড়িয়ে ধরে কি সুন্দর করে ভয় ভাঙাচ্ছিলেন,

আমার এত ভাল লাগছিল, ভাষা দিয়ে প্রকাশ করতে পারছি না। আপনি তো এককালে 'মোসলেম ভারতে' কবিতা লিখতেন—আপনিই বলুন না এই মুড্‌টাকে কি বলে ?"

"কেরামত !"

বড় ভূইঞার গলায় এবার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল।

"ভয় দেখাচ্ছেন—কিন্তু আপনার কাল-পাত্র চিনতে ভুল হয়েছে। স্থানটা হয়ত আপনার বাড়ী হ'তে পারে। কিন্তু কেরামতকে ভয় দেখাতে গলার আওয়াজ নয়, হিম্মতের দরকার। একটু আগের ঘটনার পর আপনার সেই হিম্মৎ আছে কি বড় ভূইঞা সাহেব !"

বিদ্রূপের ফুলকি ঝরল কেরামতের কণ্ঠ থেকে।

"কেরামত।"

এবার বড় ভূইঞা জলিলউদ্দিনের গলায় একটি কোমলতম প্রার্থনার মত বিনীত শোনালো শব্দটা।

"বড় দেরী হয়ে গিয়েছে ভূইঞা সাহেব। সব আন্‌সার সমান নয়। আপনাকে চিনতেও আমার বড় দেরী হ'য়ে গিয়েছিল। তাই অনেকটা খেসারৎ দিতে হ'ল। আজ সকালে আমি খবর পেয়েছি—দাঙ্গার জিগির জীইয়ে রেখে মাধব বাড়োরী, যতীন মুখুটি সকলের কাছ থেকে টাকা আদায় করেছেন আপনি।"

কেরামতের কণ্ঠ ! না, না, জলিলউদ্দিনের মনে হ'ল গোরস্থান ফুঁড়ে কোন অশরীরী প্রেতলোক থেকে কথা কয়ে উঠ্‌ছে কেরামত। চীৎকার করে উঠতে চাইল জলিলউদ্দিন; "না, না—মিথ্যা; মিথ্যা কথা—"

কিন্তু কে যেন একটা অতিকায় রোমশ হাতের শক্ত থাবায় গলার সমস্ত শব্দ স্তব্ধ করে দিয়েছে তার। শিথিল-লগ্ন পেশীতরঙ্গে আগুনের ঢল নেমে

এসেছে। একটা অদৃষ্ট অপযোনি যেন শরীর থেকে চুমুক দিয়ে সমস্ত রক্ত শুষে নিচ্ছে তার।

কেরামতের স্বর আবার মেঘমন্দ্র হ'য়ে উঠল; "ভূইঞা সাহেব আপনার ভাইস্তা (ভাইপো) মনস্থর সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। পাকিস্তানের অর্থ নতুন করে শিখলাম তাঁর কাছে! তাঁকে সেলাম। 'বখিল' হিন্দুরা নয়, 'বখিল' হ'ল দেশের শত্রুরা। তাদের চিনছি এক এক করে।"

"কি বলছ কেরামত?"

পাণ্ডুর হয়ে এসেছে জলিলউদ্দিনের মুখ, বিবর্ণ দেখাচ্ছে দৃষ্টি।

কখন একসময় বাইরের ঘরে এসে পড়েছিল দু'জনে—খেয়াল ছিল না।

"যা বলছি শুনুন—পাকিস্তানের নতুন অর্থ শিখে মনে হয়েছে, দেশে অনেক শয়তান রয়েছে—তাদের আগে কোতল করতে হ'বে। তাদের পরিচয় আমরা পেয়েছি। মেহেরবান্ খোদাতাল্লাহ্ করুন, ঠিক সময় তাদের যেন দেখা আমরা পাই। আচ্ছা এখন উঠি। আর একটি মাত্র কথা বড় ভূইঞা সাহেব; আমরা পাকিস্তানী—পাকিস্তানকে বড় করার জন্যই দরকার আমাদের এই পূব বাঙলাকে বড় করা, দরকার বাঙলা ভাষাকে বড় করা। এই ভাষাকে কেউ হত্যা করতে চাইলে, আমরা তাকে রেহাই দেব না। উর্দ্দুর সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম নয়—সংগ্রাম সেই সব ইব্লিশ্দের সঙ্গে, যারা উর্দ্দুর নামে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চাইছে।"

ভয়ঙ্কর দেখালো কেরামতের ঝক্ঝকে কৃপাণের মত চোখ দু'টি। এই মুহূর্ত্তে সে হত্যা করতে পারে—মনে হ'ল জলিলউদ্দিনের।

শেষ আলোকদানের প্রাণান্ত প্রয়াস পেল জলিলউদ্দিন; "কিন্তু কায়েদ-এ-আজমের হুকুম!"

"আমি বাঙালী, কিন্তু তার চেয়েও বড় পরিচয় আমি পাকিস্তানী। পাকিস্তানী বলতে আমার দিল সাত হাত ফুলে যায়। আর সেই

পাকিস্তানের স্বার্থের জন্যই মস্ত বড় হাতিয়ার হ'ল বাঙলা ভাষা। আমাদের বাজান নানার চোদ্দ জন্মের ভাষা। তাকে সগৌরবে বাঁচিয়ে রাখতেই হ'বে। এই যদি কায়েদ-এ-আজমের হুকুম হয়; আমি বলব, তাঁর ভুল হয়েছে এ প্রসঙ্গে।"

প্রতিজ্ঞাগর্ভ ঘোষণার বার্ত্তা দিয়ে বাইরের কালিঢালা অন্ধকারের ঘেরাটোপে অদৃশ্য হয়ে গেল কেরামত।

আর বাইরের ঘরে হ্যারিকেনের আলোর মধ্যে বসে থাকতে থাকতে জলিলউদ্দিন চৌধুরীর মনে হ'ল, কোন একটা অপরিচিত রহস্যের আকাশ থেকে এই শ্রাবণ মাসের শেষ রাত্রে একটার পর একটা উল্কা খসে পড়ছে—পাটের ঘরে রমিনা, ফুলবানু, কেরামত, ঢাকা থেকে-আসা দেশ নেতা ফিরোজউদ্দিন আইহোক্, মনসুর—

চারপাশের কালো অন্ধকার কি আগুনের সমুদ্র হ'য়ে তাকে ঘিরে ধরবার জন্য মত্ত উল্লাসে ছুটে আসছে?

নয়

আশ্বিনের প্রসন্ন সূর্য সোনালী পুলকে ঝল্‌মল্ করছে। কাশফুলের শ্বেত-হিরণ্যে, ইকড় ঘাসের অরণ্যে, নলখাগ্ড়ার ঘনবিন্যস্ত পটভূমিতে রোদের আলোর মোহময় সঞ্চার।

সোনারঙের খাল থেকে বর্ষার উত্তরঙ্গ জল সরে যাচ্ছে মেঘ্‌নার দিকে। পান্নারঙের মাছরাঙা, খয়ের রঙের শঙ্খচিল আর শুভ্রপক্ষ বকের পৃথিবীতে যেন আনন্দঘন উৎসব পড়ে গিয়েছে। তারা ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে খালের কাচস্বচ্ছ জলের খরস্রোতে; কই, পুঁঠি, মেনি, খল্‌সের চলমান প্রবাহে।

খালের পারে দূর্ব্বাঘাসের জমিতে পুরাতন একমাল্লাই নৌকাটা মেরামত

করে গাবের কষ মাখিয়ে শুকাতে দিয়েছিল আজম। আজ থেকেই কেরায়া বাইতে হ'বে। এতকাল নৌকাটা ঠাসবুনন কচুরী পানার নীচে ঘনকৃষ্ণ জলের অতলান্তে ডুবে ছিল। পুরু শ্যাওলার আস্তর পড়ে পড়ে ফলুই আর কালো জীওল মাছের নিরুদ্বেগ আস্তানা তৈরী হ'য়েছিল একটা। অনেকদিন পর বাড়ীতে আজমের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সৎমা রোশেনা একটা নির্ভুল অঙ্ক কষে ফেলেছিল। ঐ জীর্ণ একমাল্লাই নৌকাটা মেরামত করা, তারপর আজমের পরিশ্রম—দুই মিলিয়ে কিছু টাকার আশ্বাস। জীবিকার সেই অকৃত্রিম প্রেরণায় খালের অতলগর্ভ অন্ধকার থেকে মাটির ওপর তোলা হয়েছে নৌকাটাকে। গাবের কষের ওপর আশ্বিন সূর্যের সোনালী প্রেম ঝিলমিল করছে।

পিটকিরা গাছের তলা দিয়ে, একটা বৌ-কথা-কও পাখীর পুলকিত সুরের দোলা-লাগানো লাটা-ঝোপের আয়তনটা পেছনে ফেলে নৌকাটার কাছে এসে দাঁড়ালো আজম। কোমরের ওপর আজাদীর দিনে কোচের সেই আঘাতটা একটা গৌরবান্বিত ক্ষতচিহ্ন এঁকে শুকিয়ে গিয়েছে।

একবার আকাশের দিক্‌চিহ্নহীন বাসরে সাদা মেঘের উড়ন্ত ঝাঁকের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টি তুলে ধরল আজম। কে যেন অজস্র বকের পালক ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে।

সে কবিদার। মেঘ্‌না পারের দেশ তাকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছে। মনসামঙ্গল, রৈবতক, পলাশীর যুদ্ধের প্রেরণাময় অর্থ সে খুঁজে পেয়েছে সোনারঙের কেরায়া ঘাটে অজস্র দৃষ্টির অগ্নিঝলকে; আজাদীর দিনে কোচের নির্ম্মম আঘাতে, ভাইসাহেবের রহস্যময় কণ্ঠে, রমিনার মুক্তি-প্রার্থনায়, রোশেনার অম্লগন্ধি বমির স্রোতে।

কোচের আঘাত সেরে যাবার পর কেরায়া ঘাটে গিয়ে সেদিন মনসুরের কথা বলে এসেছে আজম; "মেঞাভাইরা সোহাগ কইর‍্যা বউরে যে

এট্টু রসের কথা শুনাইবা, তাও গরমেণ্ট্ আইন বাইন্ধ্যা বন্ধ কইর্যা দিব। এইবার থিকা উর্দ্দুতে সোহাগ করতে লাগব। ক্ষুদার সময়ে উর্দ্দুতে কান্তে (কাঁদতে) লাগব। হাসন-কান্দন সবই উর্দ্দুতে।"

একটা অপূর্ব্ব গান বেঁধে ছিল আজম। মনসামঙ্গল কি ভাসানের ছড়ার অনুসরণে নয়। কেরায়া ঘাটের ঐ মানুষগুলোর হৃদয় থেকে বজ্র দিয়ে দিয়ে গানের অক্ষর সাজিয়েছে সে; তারপর শান্ত শারদী সন্ধ্যায় তাদের শুনিয়ে এসেছিল।

খালের খরস্রোতে উজান বেয়ে সেই গানটাই ভেসে আসছে এখন:

'বাজান নানার বাঙ্‌লা ভাষা,
সখীর মুখের বাঙ্‌লা ভাষা,
মিতার গলার বাঙ্‌লা ভাষা,
তারে ধইর্যা দিছে টান;
এই দুনিয়ার যত শয়তান।
ইল্‌সার বুকে ফোসায় কাইতান্,
মেঘ্‌নায় নাচে ক্ষ্যাপা তুফান্,
তোমার মনে ছুট্‌ছে উজান,
এই দুনিয়ার যত শয়তান
সব শালারই লইমু জান।
ওরে মেঞা ভাই, ওরে মাঝি ভাই—
তোমার আমার বাঙ্‌লা ভাষা—
তারে ধইর্যা দিছে টান,
এই দুনিয়ার যত শয়তান।'

সচকিত হয়ে পেছন দিকে ফিরে তাকাতেই হাসেমের কোষ ডিঙিটা

চোখে পড়ল আজমের। পুলকিত উচ্ছ্বাসে সমস্ত মুখখানা উদ্ভাসিত হ'য়ে গেল এক মুহূর্তে। তার বাঁধা সেই রক্ত-মাতাল-করা গানটা তবে সোনা-রঙের কেরায়া ঘাটের সীমায়িত আসরটা উত্তীর্ণ হয়ে আমনের ঘনমেঘ ক্ষেত, নিদ্রাবতীর খালের উজানী ঢেউএর ওপর দিয়ে কিংবা গোধূলির রক্তোচ্ছ্বাস-লাগা মেঘ্‌নার দূরতম চক্ররেখার দিকে দিকে পরিপ্লাবিত হয়ে পড়েছে! মনসামঙ্গলের দেশের বিমুগ্ধ অভিনন্দন পাওয়া কবিদার সে, তার পৃথিবী জলবাঙ্‌লার দিগন্তব্যাপ্তিতে বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

কোষ ডিঙিটা নলখাগড়ার সমুন্নত ঝোপের পাশে ভিড়িয়ে ওপরে উঠে এলো হাসেম; "এই যে আজম কবিদার, আপনের লগে আমার একটা কামের কথা আছে।"

"কি কথা!"

দুরান্ত মেঘের ম্লান ছায়া পড়ল আজমের মুখে।

শঙ্কিত ভঙ্গিতে চারদিকে একবার সন্ধানী দৃষ্টি ছড়িয়ে প্রায় নিশ্চুপ গলায় হাসেম বলল; "ক'ন কারো কাছে কইবেন না। খোদার কসম খান—তবে কমু। বড় ভূইএগ জানতে পারলে আমার কল্লাডা একেবারে লামাইয়া দিব ছেন্‌দা দিয়া।"

"না কারোরে কমু না, খোদার কসম।"

ঘন উত্তেজনায় মুখচোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল আজমের।

"রমিনা বইনের কাছ থিকা আইতে আছি, আপনেরে খবর দিতে কইছে। পড়ন্ত বেইলে একবার খালের ঘাটে দেখা কইরেন কাইল। কি কথার কাম আছে আপনের লগে। রমিনা বইনেরে চিনেন তা হইলে আপনে!"

হাসেমের কণ্ঠে সকৌতুক জিজ্ঞাসা। চোখ দুটো মধুর আবিষ্কারের সম্ভাবনায় চক চক করছে।

অন্যমনস্ক গলায় আজম বলল ; যেন তার মধ্যে থেকে আর একটা অপরিচিত সত্তা স্বগতোক্তি করে উঠছে ; "রমিনা আমারে যাইতে কইছে কাইল পড়ন্ বেইলে। খালের ঘাটে !"

"কি হইল আপনের কবিদার? সত্যই আপনেরে যাইতে কইছে। জানেন তো না ; বড় ভূইঞার কীর্ত্তি। দুফার বেইলে নয়া বিবিজান আটকিরার কাঁটাডাল দিয়া পিটাইছিল শ্রাবণ মাসে, সন্ধ্যার সময় বড় ভূইঞা কুমতলব লইয়া রমিনা বইনের কাছে গেছিল।"

"তার পরে?"

একটা প্রচণ্ড আর্ত্তনাদের মত কথাটা ছিট্‌কে বেরিয়ে এলো আজমের।

"আমি কিছু জানি না।"

এস্তে নিজের কণ্ঠটাকে আশ্চর্য কৌশলে সংযত করে নিল ভূইঞা বাড়ীর বান্দা হাসেম। না ; শুধু মাত্র একটি সংবাদ দিতে এসে প্রাপ্য অধিকারের বাইরে অনেকখানি অনধিকার চর্চ্চা করে ফেলেছে সে। বড় ভূইঞার কানের সুড়ঙ্গে এ খবর পৌছলে পরিণামটা কি হবে, তা একেবারে অবোধ্য মনে হচ্ছে না। আচম্‌কা কোথা থেকে পায়ের শিথিল জোড়ে অপরিসীম গতিবেগ প্রবাহিত হয়ে গেল হাসেমের। নলখাগ্‌ড়া ঝোপ থেকে নৌকাটা খুলে কাঁঠাল কাঠের বৈঠাটা দিয়ে খালের মেঘ্‌নাগামী জলের দিকে চালিয়ে দিল সে।

আজম চীৎকার করে উঠল ; "হাসেম, হাসেম—"

ততক্ষণে কোষ ডিঙিটা বয়রা বাঁশের ঝোপ থেকে ছায়া-নামা খালের পটভূমিটা বৈঠার বিক্ষেপে বিঘূর্ণিত করে চলে গিয়েছে কাসিমালির আমন ক্ষেতের পাশে।

সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আজমের মনে হ'ল ; মনসামঙ্গলের পৃথিবী তাকে নতুন করে ডাক দিয়েছে ; শিবায়নের দেশ আর একটা সুস্পষ্ট

হাতছানি দিয়ে সংকেত করছে। পৃথিবীর গর্ভকোষে কোথায় যেন আবির্ভাবের স্পন্দন শুনতে পেয়েছে সে। সোনারঙের আসরে গাওয়া সেই গানটা, রৈবতক, ধর্ম্মমঙ্গলের সেই মহাভাষা কাল পড়ন্ত বেলায় খালের ঘাটে তাকে আর একটা দিগন্তের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে।

দশ

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কের দু পাশে বর্ষাস্নিগ্ধ মাটির প্রাণরস চুষে বনকচুর জঙ্গল জমেছে অজস্র; কালো কালো ডাঁটাগুলো ডাহুকের লম্বিত গলার মত অস্বস্তিকর মনে হয়। তার নীচে নরম মাটির আশ্রয়ে সংসার বাড়িয়ে চলেছে কটকটে ব্যাঙ্, জোঁক, পোকা মাকড়। ঝিঁঝিঁদের জলসা চলে অবিশ্রাম।

সেই নীলাভ কচুপাতার ওপর প্রথম সন্ধ্যা নেমে এলো আচ্ছন্ন হ'য়ে; বিবর্ণ হয়ে এলো মেঘ্‌নার দূরতম ক্রান্তিবলয়।

সোনারঙের ঘাট থেকে তিনটি মানুষ ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সড়কের ওপর এসে উঠল। মনসুর, আজম আর সোনারঙ্ আন্‌সার পার্টির একনায়ক কেরামত।

মনসুরের গম্ভীর কণ্ঠটা অস্বাভাবিক শোনালো; "আজম, কেরামত আলী সাহেব, শুনুন। ঢাকায় ভয়ঙ্কর অবস্থা, এই মাত্র আমি সহর থেকে আসছি। গভর্ণমেণ্ট একটা ভয়ানক ব্যবস্থা নেবে বলে মনে হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে মোল্লা-মৌলবী আর ভূঁইঞাদের হাত করে উদ্দু তারা জোর করে চাপাবেই।"

অপলক চোখে তিনজন পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টির জিজ্ঞাসা তুলে ধরল।

মনস্থর বলে চলল ; "ছাত্ররা ভয়ানক ক্ষেপে উঠেছে। বাঙ্লা ভাষা—আমাদের জন্মমৃত্যুর, আশা-আনন্দের খতিয়ান যে ভাষায়, সেই ভাষাকে জবাই করতে চাইছে সরকার। আজাদী হওয়ার অর্থ যদি মানসহত্যা হয়, সে আজাদীর প্রয়োজন নেই আমাদের।"

কেরামত মাথা দুলিয়ে স্বীকৃতি জানালো ; "ঠিক, ঠিক কথা ভাইসাহেব। আপনার কথায় আমার নতুন দৃষ্টি খুলে গিয়েছে।"

মনস্থর বলল ; "আমরা পাকিস্তানী নিঃসন্দেহে। কিন্তু আমরা বাঙালীও। সেটাও আমাদের মস্তবড় পরিচয়। সমস্ত দেশের সঙ্গে আমাদের মিলন বাঞ্ছনীয় আলী সাহেব—পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা এক হ'য়ে পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষা করব। তাই বলে নিজেদের ঐতিহ্য, নিজেদের কৃষ্টি আমরা কিছুতেই কারোকে হত্যা করতে দেব না।"

কেরামতের বিমুগ্ধ স্বীকৃতি পাওয়া যায় ; "ঠিক কথা বলেছেন ভাইসাহেব। আমিও আপনার পেছনে আছি।"

"পেছনে নয়, বলুন পাশে আছি।"

পাশাপাশি হেঁটে আসছিল আজম। হাতে একটা জাম কাঠের বৈঠা। আজ প্রথম কেরায়া নৌকা নিয়ে মেঘনার খরস্রোতে নেমে ছিল। সারা বিকাল সওয়ারী বেয়ে দুটো টাকা মিলেছে। মনটা মধুর প্রসন্নতার আমেজে ভরে রয়েছে তার। আজ অন্ততঃ রোশেনার মুখ থেকে লঙ্কা রসুনের অসহ্য ঝাঁঝের বদলে একটু খুশীর হাসি ফিনকি হয়ে ফুটবে।

সওয়ারী বাওয়ার পর্ব্ব সমাপ্ত রেখে সোনারঙের কেরায়া ঘাটে নেমে আসতেই কেরামত আর মনস্থরের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গিয়েছিল।

তারপর ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সড়কে পাশা পাশি এই অগ্রযাত্রা।

মনস্থরের একটু আগের কথাগুলো পরিষ্কার না বুঝলেও একটা সুস্পষ্ট

অর্থের সঞ্চার হয়েছে চেতনায়, আর একটা আসন্ন দুর্বিপাকের নিশ্চিত আভাষ পাওয়া যাচ্ছে।

আজ সে প্রথম স্বাবলম্বী পরিশ্রমের পবিত্র মূল্যে অর্থ উপার্জ্জন করেছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা সুরভিত স্বপ্নের ভবিষ্যৎ মধুর আলোকমূর্ত্তি হ'য়ে দৃষ্টিদীপের সামনে দুলতে সুরু করেছে। রমিনা। এই পৃথিবীরই মাটিতে কোন একটি বনস্পতির নিবিড় ছায়ায় একটি নিভৃত প্রাঙ্গন। গাছাগাছালির ফাঁকে ফাঁকে পাখপাখালির মিষ্টি কণ্ঠকূজন। একটা শ্রীময়ী গৃহস্থালি, রমিনার কোলে মাখমের মত একটি কোমল সন্তান, ঘরের চালে চালে উঠে যাওয়া লাউলতার আল্‌পনা। বড় ভূইঞাদের উদ্ধত কোচ ফলকের নির্ম্মমতার আড়ালে কোথায় সেই প্রশান্তি-ভরা আশ্রয়! সে খবর জানা নেই আজমের। কিন্তু কাল পড়ন্ত বেলায় রমিনার সঙ্গে দেখা করার ডাক এসেছে।

"আজম।"

একটি কোমল গলার ডাক। কিন্তু যেন প্রচণ্ড একটা ধমকে সমস্ত মনটা ছত্রখান হ'য়ে গেল আজমের। দৃষ্টির ওপর থেকে সমস্ত আবেশ মুছে ফেলার চেষ্টা করল আজম, তারপর মনসুরের মুখের দিকে তাকাল।

মনসুর বলল ; "তোমার কাজ কেমন চালাচ্ছ ?"

ভাইসাহেবের কাছে জীবনের প্রথম মিথ্যা কথাটা উচ্চারণ করতে প্রচণ্ড দ্বিধা এলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তেপান্তরী মাঠের পরপার থেকে ঘননীলিম সন্ধ্যাতারার স্নিগ্ধ আলো এসে পড়ল চেতনায়। রমিনা। তাকে নিয়ে একটা অক্ষুব্ধ শান্তির আশ্রয় রচনা করার জন্ত এতদিন মশগুল হ'য়ে ছিল। নৌকা সারিয়ে আজ থেকে অর্থসন্ধানে বেরিয়েছে সে। নিজের স্বাবলম্বনের মধুর পৃথিবীতে রমিনাকে আবাহন করে আনতে হবে।

তাই এতদিন বিশেষ কাজ হয়নি।

আজম বলল; "হ, ভাইসাহেব, ঠিক মতই চলতে আছে কাম।"

হাসেম খবর দিয়ে যাবার আগে থেকে কয়েকদিন সে স্বপ্ন দেখেছে। কোচের আঘাতচিহ্ন নিয়ে দোচালা ঘরের নিঃসহায় একাকীত্বের মধ্যে পড়ে থাকতে থাকতে একটা তৃষিত প্রেরণায় প্রতিদিনকার জীবন শিল্পের সন্ধান করেছে সে। রমিনা। যন্ত্রণা-কাতর কপালের ওপর চন্দনস্পর্শের মত একটি শ্যামল হাতের সঞ্চার। মনসামঙ্গল, রৈবতক, সখীসোনার গানের শান্ত ভূঁইচাঁপার মত নির্ব্বিরোধ আর একটি অর্থেরও যে অস্তিত্ব আছে; সেই বিষণ্ণ দিনগুলোতে তাকে আবিষ্কার করতে করতে মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল আজমের। তার ওপর হাসেমকে দিয়ে আগামী কাল দেখা করার প্রার্থনা জানিয়েছে রমিনা। তার কাছে রমিনারও দাবী রয়েছে অনেক।

আজাদীর দিন সকালে পাট তুলতে গিয়ে আশ্বাস দিয়ে এসেছিল; কয়েক কুড়ি টাকা জমিয়ে সে রমিনাকে নিয়ে চলে আসবে জীবনের প্রসন্ন দিগন্তে। আচম্‌কা বুকের ভেতর মেঘ্‌নার একটা বিদ্রোহী ঢেউ যেন লাফিয়ে উঠল আজমের। বড় ভূইঞা সাহেব। একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিল রমিনা। তাই কি এই আর্ত আহ্বান! হৃৎপিণ্ড দুটো ধক্ ধক্ করে অশ্রান্ত ভাবে ঠোকাঠুকি সুরু করে দিয়েছে আজমের।

মনে হ'ল, মনসামঙ্গল, রৈবতকের অর্থ কেবল সুরভিমদির স্বর্ণচম্পকই নয়; তার অর্থ আগুনেভরা একটা সূর্যমুখীও। আর এই সূর্যমুখীর অর্থই বুঝি জীবনে সবচেয়ে বড় সত্যি!

তিন জনে নিঃশব্দ পদপাতে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সড়কটা ধরে এগিয়ে চলেছে। আজম, মনহর আর কেরামত।

দুপাশের নয়ানজুলিতে অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে নেমে এসেছে। আমনের ক্ষেতের ওপর দিয়ে মেঘ্‌নার উদ্দাম বাতাস হু হু করে বয়ে চলেছে

নিরাবরণ চক্ররেখার দিকে। উন্মুক্ত আকাশের নীচে চলতে চলতে শেষ আশ্বিনের সন্ধ্যা শীতের আমেজ হ'য়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়তে সুরু করেছে। আগামী পৌষের হিমাক্ত পূর্বাভাষ।

এতক্ষণ আত্মমন্থনের পর আচম্‌কা ধরা গলায় চেঁচিয়ে উঠল আজম; "ভাইসাহেব, আমি মিছা কথা কইছি। কয় দিন আমি ঠিকমত কাম করি নাই। আমার শরীর বড় খারাপ আছিল; কিন্তুক আপনের চাচাজানের ব্যাপারে—"

তীব্র তীক্ষ্ণ গলা থেকে একটা ভীষণ আওয়াজ বেরিয়ে এলো মনহুরের; "আমার চাচাজান! কি, কি হয়েছে?"

মাথাটা ধীরে ধীরে নীচের দিকে নমিত হ'য়ে গেল আজমের; ফিস্ ফিস্ করে সে বলল; "আপনেগো বাড়ীতে যারে বান্দী কইর‍্যা আনছেন, তারে আমি চিনি। তার লগে -"

নিশ্চুপ হয়ে গেল গলাটা।

অনেকদিন পর বজ্র ডাকল মনহুরের কণ্ঠে; "বল কী! চাচাজান এত জঘন্য চরিত্রের, বল কি!"

একটা ভয়ঙ্কর কিছু আসন্ন হয়েছে। তিনজনের রুদ্ধশ্বাস অগ্রচলায় তারই সংকেত থম্ থম্ করতে লাগল। পায়ের তলা দিয়ে রাত্রি ছিটকে ছিটকে সরে যেতে লাগল।

এর মধ্যে একসময় আজম কেবল সম্মোহিত গলায় বলল; "আমার কসুর হইয়া গেছে ভাইসাহেব। এইবার থিকা ঠিকমত কাম করুম।"

কেরামত বলল; "আজম ঠিক কথাই বলেছে, আমিও সেদিন ভূইঞা সাহেবকে রমিনার সঙ্গে একটা বিশ্রী অবস্থায় দেখেছি।"

তারপরে আর কোন শব্দ নেই। পৃথিবীর সমস্ত মুখরতা স্তব্ধ

রাত্রির কালো যবনিকার আড়ালে যেন নির্বাসিত হয়েছে চিরকালের জন্য।

সোনারঙের তেমাথায় আসতেই চক্ষের পলকে ঘটে গেল ঘটনাটা। পত্রঘন বউন্যাঝোপের পাশ থেকে একটা ধারালো কাতান উল্কার মত সাঁ করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল মনস্থরের। একটা প্রচণ্ড চমকে তিন জন একমুহূর্ত্তে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

প্রাথমিক বিস্ময়ের চমকটা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তীরের মত বউন্যা ঝোপটার দিকে ছুটে গেল কেরামত।

মানুষটা তখনও পালাতে পারে নি; সোনারঙের খালের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগেই কঠিন মুঠিতে তার লুঙ্গিটা চেপে ধরেছে কেরামত। ইতিমধ্যে আজম আর মনস্থর ছুটে চলে এসেছে।

মুখটা ছুটো হাতের ছাউনি দিয়ে ঢেকে রেখেছিল লোকটা; কেরামত টর্চ্চের গোড়া দিয়ে পাঁজরায় একটা প্রচণ্ড খোঁচা লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে হাত ছুটো সরিয়ে অনাবৃত করে দিল।

কোথায় যেন পৃথিবীর মাটি বিদীর্ণ করে একটা বাজ পড়ল, টর্চ্চের নগ্নতম আলোতে গণি মৌলবীকে চিনতে এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না আর।

বিস্ফারিত গলায় কেরামত বলল; "এ কাজ আপনার মৌলবী সাহেব! কি ব্যাপার? আজকাল ছেলে-পড়ানো ছেড়ে মানুষ খুন করতে স্থরু করেছেন না কী!"

ডুকরে কেঁদে উঠল গণি মৌলবী; "আমাকে মাপ করুন মিঞা সাহেবরা। আর এক মূহূর্ত্ত আমি এখানে থাকব না। অনেক আক্কেল হয়েছে— আল্লাতাল্লাহ্-র নামে কসম করছি। এই রাত্রেই আমি চলে যাব বরিশালে।"

মনসুর আশ্বাস-ভরা গলায় বলল ; "আপনার ভয় নেই মৌলবী সাহেব ; কিন্তু এ কাজ করতে গেলেন কেন ?"

ডুকরে ওঠা গলাটা এবার প্রমত্ত কান্নায় ভেঙে পড়ল ; "আমি কিছু জানি না ভাইসাহেব। সব বড় ভূইঞার জন্য। উর্দ্দুর জন্য তিনিই আমাকে কাজ করতে বলেছিলেন। তারপর আপনার দিকে তাক্ করে কাতান ছুঁড়তে হুকুম দিয়েছিলেন। আমার কোন কসুর নেই ভাইসাহেব। আমাকে বাঁচান।"

মনসুরের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গণি মৌলবী।

একটা প্রচণ্ড ধমক শিউরে উঠল কেরামতের গলায় ; "খুন করবার জন্য তাক্ যখন করেছিলেন, তখন মনে ছিল না ! এইবার ঠেলাটা সামলাবার জন্য তৈরী হ'ন।"

আশ্বিন রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে একটা মর্ম্মচেরা কণ্ঠ আকাশের দিকে উঠে গেল ; "ইয়ে খোদাতাল্লাহ্, মিঞাসাহেবরা বাঁচান, আমাকে বাঁচান। আপনারা যা বলবেন, আমি তাই করব। আর কিছুতে বাধা দেব না। আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আর কোনদিন সোনারঙে আসব না, কোন দিনই না।"

স্নেহকোমল গলায় মনসুর বলল ; "উঠে দাঁড়ান মৌলবী সাহেব। আপনার কোন ভয় নেই। খালি একটা কথার জবাব দিন।"

ধীরে ধীরে বউন্যাঝোপের পাশে দূর্বাবিছানো জমি থেকে ওপরে উঠে দাঁড়াল গণি মৌলবী; বিবর্ণ দৃষ্টিটা মেলে ধরল মনসুরের মুখের ওপর ; "বলুন, কী জবাব দেব ?"

"আপনি পাকিস্তানী তো !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমাদের প্রধান পরিচয় আমাদের ভাষা, আমাদের সাহিত্য। তাকে

কী মনে করে, কিসের আশায় উর্দ্দুর কাছে জবাই দিতে চাইছেন ? আপনার স্বার্থ কি তাই বলুন।"

"আজ্ঞে, আমি তো তা জানি না।"

"জানেন না, আপনি জানতেও চান না ?"

"না, আর জানবার দরকার নেই। আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের সংবাদে প্রয়োজন নাই। শায়েস্তাবাদের নদীর পারে আমার ঘর। বৌ-বেটী আছে। মাঝখানে কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল, কায়েদে-এ-আজম, পাকিস্তান, উর্দ্দু, এই সব কথাগুলো শুনতে শুনতে মাথাটা গুলিয়ে গিয়েছিল। আমাকে ছেড়ে দিন সাহেব—আজ রাত্রেই 'গয়নার' নৌকা ধরব বরিশালের। খোদার কসম।"

একটা উদ্গত কান্নার উৎক্ষেপকে ক্লিষ্ট ঢোক গিলে চেপে নিল গণি মৌলবী।

"আচ্ছা আপনি যান এখন।"

একবার অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে তাকালো গণি মৌলবী। বড় ভূইঞা আর উর্দ্দুর প্রেরণাময় উত্তেজনায় ধারালো কাতানটা ছোঁড়ার পেছনে যে এমন একটা ভয়ানক সম্ভাবনার ইতিহাস লুকানো ছিল, আগে ভাগে সে সম্বন্ধে কোন পূর্বাভাষই জাগে নি মনে।

ধরা পড়ে যাবার পর আকস্মিকভাবে মুক্তিটা যখন একেবারে কাছা কাছি হাতের নাগালে এসে পড়েছে, তখন মনটা অবিশ্বাসে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। একমুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করল মৌলবী, তারপর বাজানের দেওয়া প্রাণটা নিয়ে এক একটা লাফে যোজন যোজন পথ অতিক্রম করতে করতে আমন ক্ষেতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। এই বিদেশ বিভূঁইতে মহাপ্রাণীটা রেখে যাওয়া নিতান্তই অসমীচীন হবে। মনস্থরদের মনে হল শায়েস্তাবাদের নদীর পারে না পৌঁছান পর্যন্ত এ দৌড় আর থামবে না। এখন 'গয়নার'

নৌকা না পাওয়া গেলে গণি মৌলবী সাঁতার কেটেই মেঘনা পাড়ি দেবে নির্ঘাৎ।

অনেকটা রাত্রি উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। শেষ আশ্বিনের আকাশ থেকে হাল্কা হাল্কা ইতস্ততঃ মেঘের টুকরার ফাঁক দিয়ে পাণ্ডুর জ্যোৎস্না এসে অস্পষ্ট রূপালী আলো ছড়িয়ে দিয়েছে জামপাতার প্রচ্ছদে। কোন অদৃশ্য অরণ্যপথ থেকে নলখুড়ি ফুলের বনজ গন্ধ ভেসে আসছে।

উঠানের ভিজে মাটিতে পা দিয়ে বড় ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে রোশেনার হিংস্র কণ্ঠ শুনতে পেল আজম ; "আইন্যো (এনো) আইন্যো, একবার পিছা মাইর‍্যা খেদাইয়া দিমু খালের ঐ ওপার।"

খাওয়াদাওয়া সেরে শোওয়ার পর বাজানের সঙ্গে সৎ-মার দাম্পত্য রসালাপের পর্ব্ব সুরু হয়েছে। এক পলকে বুঝতে পারল আজম। আর সঙ্গে সঙ্গে নির্দোষ কৌতূহলে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়াল।

জিগিরালির নিস্তেজ কণ্ঠ ভেসে এলো ; "পোলা বড় হইচে, এ্যাতদিন ঢপের দলে ঘুইর‍্যা ঘুইর‍্যা বেড়াইছে। এখন সংসারে মন আইছে এট্টু। কেরায়া বাইতে বাইর হয়। ঘরে মন বসাইতে হইলে জরুর গন্ধ দরকার, বিছানায় মাইয়া দিতে হয়। তা হইলেই দেইখো টাকা পয়সা আইন্যা দিব ঠিক মত।"

রোশেনার ধাতব কণ্ঠ আবার পাখসাট মারল ; "না, না, ঐ সবে কাম নাই। বৌ ঘরে আনলে আমি গলায় রশি দিমু, কী ওরে খেদামু। ঐ সব পেরেস্তাব কইর‍্যো না। বান্দীর বাচ্চার আবার সাদী !"

উদার-ব্যাপ্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে কেমন যেন হাসি পেল আজমের ; একটা আকারবিহীন অনুভূতিতে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সংসারের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞীর অধিকারে আর কারো হস্তক্ষেপ, রোশেনার পক্ষে একান্তই অবাঞ্ছিত।

এক হিসাবে ভালোই হয়েছে। রমিনা আছে। আর তার নিজের মর্ম্মকোষে রয়েছে মধুমান স্বপ্ন। রমিনার দুটো নীলিম চোখের ছন্দ দিয়ে, দুটো শ্যামলা বাহুর লয় দিয়ে, তার কামরাঙা শাড়ীর মনোরম সুর দিয়ে একটা দৃঢ়গঠন চৌচালা ঘরের মধ্যে আশ্চর্য মায়াময় জীবনকাব্য রচনা করবে আজম। সেই স্বপ্নের সুরভিত প্রহর গুণে চলেছে সে।

মনের ওপর থেকে স্বপ্ন সঞ্চারিণী সরে গেল। আচ্ছন্ন কল্পনা আবার বিস্রস্ত আর ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল আজমের।

জিগিরালির কম্পিত স্বর শোনা যাচ্ছে; "সোনাবালিরে যে কথা দিলাম আমি, তার বড় মাইয়াটার লগে আজমা বান্দরের সাদি দিমু। এখন উপায়টা কী?"

"উপায় আবার কী? কথা যেই মুখ দিয়া দিছিস্ ড্যাকরা, সেই মুখ দিয়া ফিরাইয়্যা নে। পোলারে সাদি করায়!"

রোশেনার প্রখর গলায় একটা বিষধর ফণা গর্জন করে উঠল।

"কিন্তুক্—"

"আবার কিন্তুক্—ওগো আমার বাজান, এই পোড়াকপাইল্যা, ড্যাকরার লগে দিছিলা আমার নিখা! বান্দীর পুতের সাদির লেইগ্যা শয়তানে একেবারে উইঠ্যা পইড়্যা লাগ্ছে গো বাজান। তুমি কই গো বাজান?"

এই কান্নাটা অনেক সাধনা করে আয়ত্ত করেছে রোশেনা। যে কোন মুহূর্ত্তে সে এই কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করতে পারে।

বিব্রত গলায় জিগিরালি চীৎকার করে উঠল; "চিল্লানি থামা, চৌদ্দ পুরুষের বাজানের কসম, আজমার সাদি আমি দিমু না। কাইল রাইত থাকতে উইঠ্যা কিছু করণের আগে সোনাবালিরে কইয়্যা আসুম; তার মাইয়ারে যেন অন্য খানে সাদি দেয়। খোদার কসম, তোর নানার কসম।"

ফোঁস্ করে একটা অমানবিক শব্দের বিলম্বিত লয়ে রোশেনার সাধনা-লব্ধ সংগীত থেমে গেল।

আর এমনি একটা ভয়াবহ মুহূর্ত্তে আজম ডাকল; "আম্মা, ও আম্মা—"

"কে?"

"আমি—আজম।"

"ও নোয়াবের ছাও আইল; তা ইদিকে ঘুরাফিরা ক্যান, মতলব খান কী? সাদির কথা বুঝি কান পাথালি (খাড়া) কইর‍্যা শুনতে আছিলি?"

ক্যাঁচ করে ঝাঁপ খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো রোশেনা।

"না আম্মা। আমি তো এই আইস্যা খাড়াইলাম।"

নির্ব্বিকার মিথ্যা বলে গেল আজম।

"শোনস্ নাই তো ইদিকে ছোঁক ছোঁক ক্যান?"

অত্যন্ত হিংস্র আর ভয়ঙ্কর মনে হ'ল রোশেনাকে। এই মুহূর্ত্তে একটা ক্ষুধার্ত্ত বাঘিনীর মত সে আজমের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

"না, তোমারে আইজকার কেরায়ার ট্যাকা দিতে আইলাম।"

লুঙ্গির কষি থেকে একটা কাঁচা টাকা বের করবার সঙ্গে সঙ্গে ছিনিয়ে নিল রোশেনা। তারপর ঘরের ভেতর ঢুকে ঝাঁপটা বন্ধ করতে করতে বলল; "যা বান্দীর পুত., পাকের ঘরে মাটির পাতিলে ভিজা ভাত আর রসুন আছে। কাইল থিকা ট্যাকা পাইয়া আমার হাতে দিবি। ঐ বুইড়্যা ড্যাকরারে দিবি না কোনাদিন।"

এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল আজম।

একটা টাকা এখনও কোমরের গোপন গ্রন্থিতে বাঁধা রয়েছে। সে সংবাদ রোশেনার জানা নেই। একটি মাত্র টাকা—শিল্পীর যাযাবর জীবনে নীড় বাঁধার প্রথম সঞ্চয়, প্রথম প্রস্তুতিপর্ব্ব। মনসামঙ্গলের অর্থ আবার

কী একটা সুবাসিত স্বর্ণচম্পা হয়ে গেল ! সেই ঘননীলিম সন্ধ্যাতারার স্বপ্ন কবে নেমে আসবে মুলিবাঁশের বেড়ায়-ছাওয়া ছোট্ট ঘরের আয়তনে ? কবে ?

এগারো

পড়ন্ত বেলায় সাদা সাদা কাশের স্তবকের মত খণ্ডবিচ্ছিন্ন মেঘের ছায়া ভেসেছিল সোনারঙের খালে। সোনালী তরলের মত টলমল করছিল জল। একমাল্লাই কেরায়া নৌকাটা নিয়ে নারকেল গুঁড়ি বাঁধানো ঘাটে, সেই স্বর্ণাভাসের অপরাহ্ণ থেকে রাত্রির প্রথম প্রহর পর্যন্ত রমিনার জন্য শঙ্কিত প্রতীক্ষায় বসে থেকে থেকে কেরায়া ঘাটে চলে এসেছে আজম। রমিনার সঙ্গে একটি মুহূর্তের জন্যও দেখা হয় নি আজ অনেকদিন।

মনটা বিতৃষ্ণ শূন্যতায় ভরে গিয়েছে।

নৌকার সাম্‌নের গলুইতে হাঁটু দুটোর মধ্যে মাথা গুঁজে নিশ্চুপ হয়ে বসে ছিল আজম।

ঘনপত্র বংশীবটের নীচ দিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালো ইল্‌সা-মাঝি হাজিরদ্দি; "কি রে আজমা, কয়দিন ধইর‍্যা যে তোরে আসরে দেখি না, শরীর খারাপ করছে না কী ? অসুখ বিসুখ কিছু হয় নাই তো !"

হাঁটু দুটোর অবরোধ থেকে মাথাটা তুলে বেদনা-করুণ দৃষ্টিতে তাকালো আজম; "কে চাচা না কি, মনটা বড় খারাপ। শরীরটাও সেই কোচের ঘাই খাওনের পর থিকা ভাল যাইতে আছে না।"

"তোর কথা মতন আমরা চরে-নদীতে সবখানে সব মানুষেরে জানাইয়্যা দিলাম। কত মানুষ এই কয়দিন ধইর‍্যা সমানে আইতে আছে; সিধা কথা জানতে চায়—বাজান-নানার ভাষারে ধইর‍্যা কোন্ সুমুন্দির পুতেরা

মস্করা সুরু করছে? আইজও আসব বেবাক। বিহান বেলায় তোর খোজে গেছিল কাসেম আলী। যাউক, তোরে পাইয়া ভালই হইচে।"

"মন মেজাজ ভাল না চাচা।"

অসহায় গলায় আর্তি জানালো আজম। এতদিনকার সক্রিয় জীবন-শিল্পীর মধ্যে কোথায় যেন নিরাসক্তির ছায়াপাত হয়েছে। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হাজিরদ্দি।

দামঘাসের ঘনছায়ায়, আকুল বাতাসের আবেদনে, কি শাপলাফোটা খালের টলটলে নীল জলে যখন দুপুরের রোদ ঝিলমিল করে কাঁপে; ঠিক তখনই কিংবা এমনি আবছায়া অন্ধকারে, পাণ্ডুর জ্যোৎস্না আর মেঘনার অশ্রান্ত বাজনা মিলে মনের ভেতর একটা আচ্ছন্ন মাদকতার সঞ্চার হয়। আর সেই মাদকতার মধুকোষে নিশ্চুপ পদপাতে স্বপ্নের মত নেমে আসে রমিনা। ঘননীলিম সন্ধ্যাতারার মত দু'টি চোখ জ্যোতির্ময় দিশারী হয়ে জেগে থাকে।

কিন্তু সেই সন্ধ্যাতারার স্বপ্নের ওপর এ কোন অবাঞ্ছিত মেঘের ঘন আবরণ এসে পড়ল! কোন রোমশ থাবা সেই তারার দীপ্তিকে নির্বাপিত করে দিতে উদ্যত হয়েছে—তা অবশ্য অজানা নয়; কিন্তু তার প্রতীকারের, সেই স্বপ্নকে চিরস্থায়ী করার দুরূহতম পথটাও যে জানা নেই। সেই নির্জন অবসরের হৃদয়বিনোদনকে স্পর্শের নাগালে কবে পাওয়া যাবে, আদৌ যাবে কি না—সে প্রশ্নের উত্তরও দুরধিগম্য। এক এক সময় ভয়ঙ্কর কিছু করে ফেলতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে, নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে প্রতিমুহূর্তের বঞ্চনার আঘাত থেকে সে মুক্তি পায়। অথবা জ্বালাভরা বন্দীত্বের গ্লানি থেকে রমিনাকে নিয়ে উধাও হয়ে যায় কোন নাম-না-জানা চক্ররেখায়। অন্ততঃ এই মুহূর্তে হাজিরদ্দির আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত এমনি একটা চিন্তার শাণিত বল্লমে আহত হ'তে হ'তে মনটা কুঞ্চিত হচ্ছিল আজমের।

হাজিরদ্দি বলল ; "কি ব্যাপার, আম্মায় মন্দ কইছে বুঝি।"

"সে তো রোজই কয়।"

"তবে ?" হাজিরদ্দির দৃষ্টিটা প্রশ্নবোধক হয়ে উঠল।

"সে অন্য ব্যাপার। তোমার কাছে কইতে সরম লাগে চাচু।"

"ওঃ। সরমের ব্যাপার বুঝি ; তা আমার কাছে না কইয়্যা সোমান বয়সের ছেম্‌রা (ছেলে) গুলানের কাছে কইলেই পারস। একটা—আধটা বুদ্ধি দিব। যৈবনে মন অমন এট্টু পোড়েই রে আজমা। যৈবনে মন যদি সরমের কথায় খারাপ না হয় তো হইব কোন বয়সে ? বুড়া বয়সে মন তো পুইড়্যা পুইড়্যা আঙ্গার হইয়া যায়।"

মাথায় ধূসর রঙের চুল, আর শরীরের কুঞ্চিত চামড়ার গৌরবে একটা বর্ষীয়ান্ মন্তব্য করে গভীর অভিজ্ঞতার হাসি হাসল ইল্‌সা মাঝি হাজিরদ্দি।

আর এমনি সময়ে হৈ হৈ করে প্রলয় পর্ব বাধিয়ে আজমের কেরায়া নৌকাটার সামনে এসে পড়ল মাঝি-মাল্লা, জেলে-কামলারা। মিশ্রিত কণ্ঠের উত্তাল ধ্বনিতরঙ্গ কুণ্ডলিত হয়ে আকাশের দিকে উঠে গেল ; "আরে এই তো হাজিরদ্দি চাচু, আরে এই যে কবিদার। তোমার লেইগ্যা কয়দিন আইলাম চর থিকা, অথচ দেখাই মিলে না।"

"হ, হ, মেঘনার হেই পার থিকা আইতে আছি সাত দিন। কথাটা ভালো কইর‍্যা শুইন্যা যাইতে চাই।"

"বাজান-নানার ভাবাটা ওরা ভুলাইয়া দিব ক্যামনে ? কইতে গেলেই তো সেই ভাবাই বাইর হইয়া আসে। ভুলুম ক্যামনে ?"

মনসামঙ্গল, রৈবতক, দাসু রায়ের পাঁচালীর মধ্য থেকে সেই রহস্যময় পথটা তাকে অনেক দূরে আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছে। এই অগ্রযাত্রার দাবীকে স্বীকার করে নিয়েছে আজম। সে পৃথিবীর কবিদার ; দূর আকাশের রামধনু-রঙা ক্রান্তিবলয়ের শূন্য স্বপ্নের আত্মবিলাস নয়, মাটির বুকে কান পেতে

তার বেদনার করুণ কান্নার বোলকে হৃৎস্পন্দনের একতারায় সে তুলে নিয়েছে। জীবনের দাবীকে অস্বীকার করে নি সে, মানুষ তাকে অস্বীকার করতেও দেবে না।

"কি হে কবিদার, চুপ কইর‍্যা বইস্যা রইলা যে। গলা দিয়া আওয়াজ বাইর হয় না ক্যান? সত্য সত্যই কি বাঙ্‌লা ভাষায় কথা কইতে দিব না? কিন্তুক্ ভুলি ক্যামনে বাজান-নানার ভাষা?"

ঋজু হয়ে বসল আজম। আত্মমন্থনের কেন্দ্রিত পরিসর থেকে এক মুহূর্ত্তে জেগে উঠল সংগ্রামী মানুষের কবিদার। বাতাসবাজা আকুলিত নির্জনতায় সন্ধ্যাতারার স্বপ্নের চেয়ে কোন অংশে কম সত্য নয় এই অর্দ্ধবৃত্তের আকারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর প্রশ্নশাণিত দৃষ্টিফলক।

মানুষগুলোর দিকে দৃষ্টিটা একবার ছড়িয়ে দিল আজম; অজস্র জোড়া চোখ তারই দিকে ঝকঝকে সড়কির মত উদ্যত হয়ে রয়েছে।

স্থির গম্ভীর গলায় বলল আজম; "ভাইসাহেব কইছে গুলী মাইরা বুক ফুটা কইর‍্যা দিব গরমেণ্ট্। এই ভাষা ভুলতে হইবই, তারপর বিজাত ভাষা শিখতে লাগব। না হইলে ফাটকে ভরব, ফাঁসীতে ঝুলাইয়া দিব।"

"একটা কথা জিগাই কবিদার, আমরা এত মানুষ। এত মাইন্‌ষেরে কী পারব গুলী কইর‍্যা মারতে? এত গুলী কি গরমেণ্টের আছে? আমরা চরের মানুষ, গেরামের মানুষ, হাট-গঞ্জের মানুষ। এ তাজ্জব কথা—এত মানুষ যদি খাড়াই তো পারব কী মারতে? তুমিই কও!"

বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের সুর ফুটে বেরুল মানুষটির কণ্ঠে।

"ঠিক, ঠিক কথা।"

অজস্র কণ্ঠে তারই কুণ্ঠাবিহীন সমর্থন।

আজমও বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল। সত্যিই তো এই কথাটা সে বিশেষ

চিন্তা করে দেখে নি। তারা এত মানুষ রয়েছে পাশাপাশি। এত অজস্র, গণনাতীত মানুষ।

একসময় হাজিরদ্দি বলল; "সেইদিন কী একটা নয়া গান বান্‌ছিস, (বেঁধেছিস) তাই গা দেখি আজমা।"

ইতিমধ্যে সকলে আসে পাশের কেরায়া নৌকাগুলোতে উঠে বসেছে।

চারদিকে একবার তাকালো আজম। সব নৌকা থেকেই সশ্রদ্ধ অনুরোধ এলো; "গাও, গাও কবিদার, আমরা শুনি। এক নদী পাথালি (আড়া আড়ি) পাড়ি দিয়া আইছি। গাও, গাও—"

আপাততঃ এরাই সত্য, এদের দাবীকে প্রত্যাখান করার ক্ষমতা নেই আজমের। রমিনা এই মুহূর্তের জন্য হারিয়ে যাক্ কোন কুয়াশা জড়ানো রাত্রির অস্পষ্টতায়। আজম নতুন রচনা-করা একটা গান সুরু করল:

'ও ভূইঞা,' ও ইমামসাহেব—
আমার ঘরের টুয়ায় তোমার আগুন,
সেই আগুনে পোড়াও বেগুণ,
তোমার ক্যামন মেজাজ, মর্জ্জি ক্যামন,
বুইঝবার না পারি—
প্যাটের জ্বালায় ধিকি ধিকি লক্ষ মানুষ মরি।

ও ভূইঞা, ও ইমাম সাহেব—
আমরা মরি তোমরা হাস,
তোমরা ক্যামন ভালবাস,
ক্ষুধার কথায় একটু কাশ,
হায়রে কিবা করি?

প্যাটের জ্বালায় ধিকি ধিকি লক্ষ মানুষ মরি।

ও ভূইঞা, ও ইমাম সাহেব—
ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে আমরা খাটি,
শুক্‌না প্যাটে জাব্‌না কাটি,
ভাগের কালে মিলল লাঠি,
হায়রে কিবা করি?
প্যাটের জ্বালায় ধিকি ধিকি লক্ষ মানুষ মরি।

ও ভূইঞা, ও ইমাম সাহেব—
মাইয়া দিলাম তোমার পূজায়,
বইন দিলাম তোমার শয্যায়,
ধানও দিলাম তোমার গোলায়,
তবু তোমার বদন ভারী।
প্যাটের জ্বালায় ধিকি ধিকি লক্ষ মানুষ মরি।

"ঠিক, ঠিক কথা, ভূইঞা আর মহাজনে, ইমাম আর মুছুল্লিতে চুইষ্যা চুইষ্যা বেবাক রসই নিছে। এখন ছিবড়াখান কইর‍্যা ছাড়ছে আমাগো। ধান দিছি, আন্ধার রাইতে বুকের কাছ থিকা যুয়ান বউরে কাইড়্যা লইয়া গেছে। ঠিক ঠিক, ঠিক কথা।"

সংখ্যাতীত গলায় ভৈরব ধ্বনিতরঙ্গ কল্লোলিত হয়ে ওঠে।

ধীরে ধীরে আজম বলে; "এই কথাগুলান্ যাতে আমরা না কইতে পারি, তার লেইগ্যাই তো উর্দু শিখাইতে চায়। বাঙলা ভাষা ভুলাইয়া দিতে চায়।"

"ঠিক, ঠিক, ঠিক কথা। উর্দু আমরা শিখুম না। যা করতে হয় কইবেন, আমরা পাশে আছি ঠিকই।"

উদার মনের প্রাণিত আমন্ত্রণ ভেসে আসে; "আমাগো চরে চলেন কবিদার। আগামী বুধবারই চলেন।"

"ম্যাঘ্‌নার ঐ পারে আমাগো গেরামে চলেন আগে।"

প্রসন্ন হাসি হেসে সম্মতি জানাতে গিয়ে মনের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ চমক প্রবাহিত হয়ে গেল আজমের। রমিনা। যাকে সে একটা কুয়াশাভরা অস্পষ্ট অন্ধকারের আড়ালে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল; এই মুহূর্তের জন্য সে যেন বৃত্তের মত ঘিরে-ধরা মানুষগুলোর দৃষ্টিতে বিম্বিত হয়ে গেল। এদের মধ্য থেকে সে তো বিচ্ছিন্ন নয়। রামধনুর স্বপ্নমিথুনও সে নয়, নয় কোন স্পর্শাতীত আকাশগঙ্গার অহেতুক বর্ণবিলাস। এই মানুষগুলোর মধ্যেই সে ছড়িয়ে আছে। বড়ভূইঞার বেআইনি মত্ত লালসা তাকে গ্রাস করতে চাইছে। অর্ধচেতন মনের অতলগর্ভ থেকে আজমের গানের মধ্যে মূর্ত্তি ধরে সেই তো আত্মপ্রকাশ করেছে সকলের সামনে।

বড় ভূইঞা। সিল্কের বাদ্‌শাহী লুঙ্গি, রেশমী আলখাল্লা, পায়ে কারুখচিত নাগরাই, সুরারঞ্জিত চোখের কোলে সুর্ম্মার সতর্ক চিহ্ন। দেখলে বুক দুরু দুরু করে ওঠে। সেই ভূইঞাই একটা দুর্ভেদ্য দুর্গের মত রমিনাকে আগলে রয়েছে।

মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে একটু আগের অসহায়ত্ব মনের ওপর থেকে সরে গেল আজমের। প্রতীকারের সহজতম পথটা নতুনভাবে অবিষ্কার করে ফেলল আজম। এরা তার পাশাপাশি থাকলে বড় ভূইঞার দুর্গকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ভেঙে রমিনার মুক্তিযাত্রার জন্য একটা সগৌরব তোরণপথ সে তৈরী করে দিতে পারবে বৈ কি!

মনসামঙ্গল, কৃষ্ণযাত্রা, মহাজনপদের মধ্য থেকে একটা পথ রামধনুর

ক্রান্তিরেখার দিকে ধরাছোঁয়ার বাহিরে চলে গিয়েছিল, আর একটি পথ ধূলামাটিঘাসের স্পর্শের পৃথিবীতে নেমে এসেছিল। পথ দুটি সমান্তরাল রেখার মত কোন দিনই এক হয়ে মিলবে না বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু মেঘ্‌নাপারের এই সমবেত মানুষগুলোর স্বচ্ছতম দৃষ্টিতে এই মুহূর্ত্তে সে পথ দুটি আশ্চর্য ভাবে মিলে গিয়েছে। আজম অপলক চোখে তাকিয়ে রইল।

বারো

আরো কয়েকটা মাস সোনালী পারাবতের মত ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলে গিয়েছে। এতগুলো শরৎ-হেমন্ত-শীতের রঙ-বেরঙের দিনে একটি বারের জন্যও দেখা হয়নি রমিনার সঙ্গে। ভূইঞা বাড়ীর বান্দা হাসেমের কাছে অনেক জিজ্ঞাসা করেও কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় নি। রমিনার কথা হলেই সে আশ্চর্য সংযমে নির্ব্বাক হয়ে গিয়েছে।

শেষ শীতের এই বর্ণগৌরব হীন দিনগুলোতে আজম সকাল বিকাল দু বেলাই কেরায়া নৌকাটা এনে ভিড়ায় সোনারঙের গতপ্লাবন খালে।

মধু বসন্তের মুকুলিত স্বপ্নকে হতাশভরে ছেড়ে সে দেয়নি। সে কবিদার, হৃদয়বৃত্তির সে অনন্য রূপকার। রমিনাকে নিয়ে নতুন পৃথিবী রচনার জন্য এর মধ্যে সে সাত কুড়ি টাকা জমিয়েছে কেরায়া বেয়ে। রোশেনার সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে চালিয়েছে এই সঞ্চয়পর্ব।

আজও নৌকাটা এনে ভিড়াল সে নারকেল গুঁড়ি দিয়ে বাঁধানো খালের ঘাটের পাশে।

দুপাশে জলঘাস আর নলখাগ্‌ড়ার ঘনবিন্যস্ত অরণ্যসবুজ—আর তারই মাঝখান দিয়ে মেঘমতী রাজকন্যার সিঁথির মত ঋজু রেখায় সোনারঙের

খালটা সাম্‌নের মেঘ্‌নায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। খালের পারে নারকেল গাছের মর্ম্মরিত কুঞ্জে শেষ শীতের মধুর সকাল দোল খেয়ে এসে পড়েছে।

অস্থির দৃষ্টিটা একবার করমচা ঝোপের আড়াল দিয়ে, সুপারী বীথির মধ্য দিয়ে, সামনের ক্যাঁচাবাঁশের চৌচালা ঘরখানার চারপাশ দিয়ে এক নিমেষে চক্রাকারে ঘুরে এলো আজমের। কিন্তু না — রমিনা হয়ত ভুলেই গিয়েছে অনেকদিন আগের কোন এক গোধূলির প্রতিশ্রুতির কথা।

খালের ঘাটে কচুরী পানার ঠাস বুনন ভেঙ্গে জল নিতে এসেছে কৃষাণকন্যারা। জহিরদ্দির মেয়ে আকৃলিমা বলল; "কি গো কবিদার রোজ দুই বেলা কার লেইগ্যা নাও ভিড়ান খালের ঘাটে? ব্যাপারখান কী?"

সমস্ত মুখে ফাগের মত উচ্ছ্বসিত রক্তের কণা জমল আজমের। অভ্যস্ত নিয়মে ফিস্ ফিস্ করে বলল; "রমিনারে দেখছ আকৃলিমা?"

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটা জবাব এলো; "আইজ দেখা পাইবেন রমিনার লগে। এট্টু পরেই সে আসব খালের ঘাটে। খাড়ইয়া যান।"

আরো অনেকটা সময় অপেক্ষা করল আজম। মনে মনে যখন আজকের সওয়ারী বাওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠেছে; তাড়াতাড়ি বন্দরে যেতে না পারলে আজ আর কেরায়া মিলবে না—ঠিক তখনই একটা ধ্যানমৌনী নারকেল গাছের পাশে অতিকায় একটা মাটির কলসী নিয়ে রমিনার আবির্ভাব হ'ল।

গলুইর ওপর থেকে আজমের মনে হ'ল রমিনার সন্ধ্যাতারার মত নীলাভ দৃষ্টিতে সোনারঙের খালের প্রসন্ন সকাল মোহন স্বপ্নের মত টলমল করছে না, তার বদলে একটা কান্নার উৎক্ষিপ্ত আবেগকে যেন বন্দী করে রেখেছে সে।

ততক্ষণে পারের ঘাসবিছানো মাটিতে এসে দাঁড়িয়েছে রমিনা। আজমের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সাঁ করে পেছন দিকে ঘুরে কলসীটা নিয়ে দৌড়াতে সুরু করল সে।

নির্বাক বিস্ময়ে সমস্ত বোধবৃত্তি যেন তাকে পরিত্যাগ করে গিয়েছে, এমনি নিশ্চেতন ভাবে খানিকটা সময় বসে থাকার পর একটা স্বাভাবিক প্রেরণার ধাক্কায় সচেতন হয়ে গেল আজম। গলুই থেকে লাফিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে দৌড়াতে করমচা ঝোপটার পাশে এসে রমিনার নাগাল পেল আজম। ততক্ষণে বুকের ভেতর দ্রুত হাঁপানির টান সুরু হয়ে গিয়েছে; "এই কী, এতদিন পর দেখা হইল—দৌড়াইয়া পলাইতে আছ!"

যে কান্নাটা দুটো চোখের ঘননীলিম মণিতে এতক্ষণ আবদ্ধ হয়ে ছিল, সেটা একটা প্রচণ্ড উৎক্ষেপে সমস্ত অবরোধ ভাসিয়ে দিয়ে হু হু করে নেমে এলো রমিনার সর্ব্বাঙ্গে; "এতদিন পরে খবর লইয়া লাভ কী, আমার সব্বনাশ কইর‍্যা দিছে বড় ভূইঞা। যাও, যাও, তুমি আর আইসো না।"

"সর্ব্বনাশ করছে!"

আজমের কণ্ঠ বিদীর্ণ করে একটা তীব্র তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ উঠল; "সর্ব্বনাশ করছে বড় ভূইঞা? কাছিমের ছাওরে আমি খুন করুম। তুমি এতদিন আমারে খবর দাও নাই ক্যান?"

"আমারে ঘরে বন্ধ কইর‍্যা রাখছিল এ্যাদ্দিন।"

"আর কাম নাই ঐখানে থাইক্যা। ট্যাকা আমি জমাইছি সাতকুড়ি। আইজ সন্ধ্যায় আসুম, তোমারে লইয়া চইল্যা যামু চরবেহুলায়। আইসো কিন্তুক খালের কিনারে। আসবা তো!"

এক মুহূর্ত্তে সংকল্প স্থির করে ফেলেছে আজম। আজ সন্ধ্যার অন্ধকারেই চারপাশের ক্ষিপ্ত অগ্নিসমুদ্র পাড়ি দিয়ে সে চলে যাবে কোন প্রশান্ত জীবনের প্রান্তরে। আর একটি মুহূর্ত্তও এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

পৃথিবীর কাছে তার খুব বেশী দাবী ছিল না। সে কবিদার হতে চেয়েছিল, স্বীকৃতি সে পেয়েছে মেঘনাপারের সাধারণ পরিশ্রমী মানুষগুলোর আন্তরিকতায় আর অভিনন্দনে। সেই সঙ্গে মনসামঙ্গল, সখীসোনার গানের সুরভিত অর্থটাকেই সে সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিল, আত্মস্থ করতে চেয়েছিল, চরিতার্থ করতে চেয়েছিল রমিনার মধ্যে। আর সেই পথেই দেখা দিয়েছে ভাইসাহেব; দেখা দিয়েছে বাঙলা ভাষার স্বপক্ষে অজস্র মানুষের প্রশ্নদীপিত প্রার্থনা।

কিন্তু মাটির কঠিন পৃথিবী তার স্বপ্নকে, তার কামনাকে আঘাত হেনেছে। সেই কোচের আঘাতটা থেকেও এ আঘাত অধিকতর ভয়ঙ্কর, রক্তাক্ত বিভীষিকায় এ আঘাত সর্বনাশা। এ আঘাতকে প্রতিঘাতের রক্ততিলক পরিচয় ফিরিয়ে দেবে কি সে? তার একটি মাত্র সংকেতে মেঘনাপারের অজস্র বজ্রবাহী বাহু এগিয়ে আসবে কি?

আবার চিন্তাটা বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে, ছত্রখান হয়ে নড়ে যাচ্ছে চেতনার ভারসাম্য। কি করবে সে! কি সে করতে পারে!

বিক্ষুব্ধ দৃষ্টি তুলে আজম তাকাল রমিনার মুখের দিকে। আর্তনাদ করে উঠল রমিনা; "না, না আমার মত পোড়ারমুখীরে লইয়া তুমি ঘর বাইন্ধো না। না, না, আমি যামু না। তুমি অন্য বউ লইয়া সুখী হইও। আমার বরাতে যা আছে—তাই হউক।"

আজমের বিগতবুদ্ধি দৃষ্টির সামনে দিয়ে রুদ্ধশ্বাস দৌড়ে দূরের হেউলিঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করল রমিনা।

* * *

প্রচণ্ড আঘাতে রক্তাক্ত মনটা নিয়ে কখন নৌকায় ফিরে এসেছিল আজম, এতক্ষণ খেয়াল হয় নি। তার স্বপ্নের স্বর্ণপাত্রে একরাশ কালি ছিটিয়ে দিয়েছে বড় ভূইঞা, তার সব আশার পবিত্রতাকে কলুষিত করে দিয়েছে।

আঘাত। আঘাত। মনে হচ্ছে একটা বিরাট প্রতিঘাত না দিতে পারলে মনটা যেন স্বস্তি পাচ্ছে না, একটা প্রকাণ্ড প্রতিবাদ না জানাতে পারলে স্থিরতা আসছে না চেতনায়। প্রতীকার—প্রতিঘাত—প্রতিবাদ—মেঘ্না পারের কেরায়া ঘাটে অজস্র মানুষের বন্য দৃষ্টিতে একটা সুস্পষ্ট সংকেত পেয়েছে আজম।

অনেকটা বেলা চড়েছে। তীক্ষ্ণ রোদের উত্তাপ এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে খালে-জঙ্গলে। সামনের দিকে তাকালো আজম।

গণি মৌলবীর মক্তব, বর্ষায় যেটাকে একটা দ্বীপখণ্ডের মত মনে হয়েছিল, এখন তার চারপাশের জল সরে গিয়ে রাশি রাশি অসুরমুণ্ডের মত মাটির ঢিবি আত্মপ্রকাশ করেছে।

মক্তবের দরজাটা হাট করে খোলা রয়েছে। মেঝেতে ধুলোর আস্তর জমেছে একহাঁটু; বাইরে থেকে ঝরা পাতা উড়ে এসে একটা মৃত্যুশয্যা রচনা করেছে মক্তবটার। সুযোগ বুঝে কয়েকটা বেওয়ারিশ গ্রাম্য কুকুর আস্তানা গেড়েছে ঘরের মধ্যে; তারাই এই ভয়াবহ শ্মশানপর্বে প্রহর গুণে চলেছে একটানা।

আচম্কা মনের ভেতর সে দিনের রাত্রিটা একটা পাক খেয়ে তরঙ্গিত হয়ে গেল। গণি মৌলবী নিশ্চয়ই সেই শায়েস্তাবাদের নদীর ধারে গিয়ে এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস টানছে জোরে জোরে।

বেশীক্ষণ আর গণি মৌলবীর চিন্তার মধ্যে কেন্দ্রিত থাকা গেল না। রমিনার ভাবনা সমস্ত মনটাকে অধিকার করে ফেলল।

সোনারঙের কেরায়া ঘাট থেকে মেঘ্নার একটা বাঁক দূরে বনবেতসের ঘনপত্র ঘেরাটোপের মধ্যে নৌকাটা এনে গুঁজে রেখেছিল আজম। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোতে, বিক্ষিপ্ত স্নায়ুর আয়নায় আর শিথিললগ্ন পেশীতে পেশীতে

রমিনার ঊর্ধশ্বাস পলায়ন কালনাগিনীর জ্বালার মত জড়িয়ে রয়েছে। সারাদিন কেরায়া বাওয়ার কোন সপ্রতিভ উৎসাহই সে পায়নি। রমিনার পবিত্রতম নারীত্বকে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে বড় ভূইঞা, তার সত্তাকে আদিম হিংস্রতায় কলুষিত করে দিয়েছে। একটা অবরুদ্ধ আক্রোশে কঠিন অন্ধকারের ওপর আঘাতে আঘাতে মাথাটা রক্তাক্ত করে ফেলতে ইচ্ছা করে আজমের।

রমিনার নারীত্বের এই অপমান তার কাছে কি কোন আবেদন আনে নি! সে নতুন দিনের পদ-রচনা-করা কবিদার। তাকে কবির স্বীকৃতি দিয়েছে রূপকথার মত এই মধুর পৃথিবী। আশ্চর্য বিস্ময়ের দৃষ্টি থেকে বিমুগ্ধ শ্রদ্ধা ঝরে পড়েছে মনসুরের। তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে পদ্মা-মেঘনা-কালাবদরের ক্রান্তিবিসারী দেশের মানুষ।

শুধুই কি সে কবিদার? তিক্ত অথবা মধুর গান বাঁধা ছাড়া আর কোন কাজই কি করার নেই তার পৃথিবীর এই চক্ররেখায়, যেখানে বড়ভূইঞার প্রলুব্ধ গৃধিনী দৃষ্টি তাদের মধু মিলনের বাসরস্বপ্নে মারীমড়কের সঞ্চার করে? সে কি কেবল গান গাওয়া স্বপ্নলোকের ছিন্নমূল ফানুসী কল্পনা? মনের অতলান্ত থেকে পৌরুষের কোন আবেদনই কী আলোড়ন তোলে নি তার সমগ্র চেতনায়? আকাশের বজ্র লেখনীমুখ থেকে কিংবা কণ্ঠ থেকে পেশীতে পেশীতে চালনা করতে পারে না সে? অগ্নিগর্ভ প্রতিজ্ঞায় ধমনীর ভেতর ঝলক লাগা রক্তস্রোত কী এখনও প্রস্তুত হয়ে ওঠে নি?

মর্ম্মগ্রন্থিকে ব্যবচ্ছেদ করে বিশ্লেষণ করবার জন্যই সে লুকোতে চেয়েছে একটা নির্জ্জন বিবরে; খুঁজেছে একটা নিঃসঙ্গ আশ্রয়। যেখানে সে আর তার নিজের মনটা মুখোমুখি হয়ে বসবে কিছুক্ষণ, একটা শপথের স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য। তাই কেরায়া ঘাটটা পেছনে রেখে সে চলে

এসেছে বনবেতসের নির্জন অবগুণ্ঠনের অন্তর্লোকে। যেখানে সে ছাড়া আর কেউ নেই।

পাটাতনের ওপর ঋজু হয়ে বসল আজম। একটা দুর্বার প্লাবন নেমে এসেছে শরীরের প্রতিটি রক্তকোষে। সে কেবল কল্পনার নভোচারী কবিদারই নয়; সে পায়ের নীচের কঠিন পাথরের মত মাটির মানুষ—তার স্নায়ুকোষে পৌরুষের ব্যঞ্জনা তলোয়ারের ফলার মত ঝিলিক দিয়ে উঠল।

রমিনার নারীত্বকে অপমান করেছে বড় ভূইঞা। বড় ভূইঞা? নিমেষে প্রতিবাদের সমস্ত সঙ্কল্প গুটিয়ে আসে শামুকের মাথার মত, প্রতিশোধ নেবার সিদ্ধান্ত শিথিল হয়ে যায়। কিন্তু—কিন্তু—পরিষ্কার স্মরণলোক থেকে ওই কারা মাথা তুলে উঁকি দিচ্ছে! আগুনজ্বালা চোখের ভাইসাহেব, বংশীবটের পত্রাচ্ছাদনের নীচে পিঙ্গল মশালের আলোতে অজস্র বন্য কঠিন মুখ, মনসামঙ্গল, রৈবতক, বাঙ্‌লা ভাষা—

সে তবে একা নয়? উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল আজম; একমাল্লাই নৌকাটা প্রবলভাবে দুলে চলল। এই মুহূর্তে সে একটা আলোকিত লক্ষ্যবিন্দুর সন্ধান পেয়েছে। প্রতিশোধ—প্রতিবাদ—প্রতীকার—

এখন সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে নেমে এসেছে। সোনারঙের কেরায়া ঘাটের নৌকাগুলোতে আলোর বিন্দু জ্বলে উঠেছে; হাটের চালার নীচে নীচে ভিন্‌গেরামী দোকানীদের কেরাসিনের কুপীতে, এই অন্ধকারের পটভূমিতে কনক চাঁপার মত শিখা ফুটে উঠেছে অজস্র। দূরের মহাজনী নৌকাগুলো থেকে শ্রান্ত মাঝির গলায় নামাজপড়ার অবসন্ন আওয়াজ ভেসে আসছে। নির্বারিত আকাশ থেকে কে যেন রাত্রির ঘন কালি ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীর নদী-অরণ্যে, ঘাসে-জঙ্গলে। সূর্যকন্যার কৌতুক-উজ্জ্বল মুখের ওপর অমেয় লজ্জার মত অন্ধকার ঘনীভূত হচ্ছে।

নৌকাটা বনবেতসের ঝোপ থেকে বাইরের নদীতে নিয়ে এলো আজম।

কোমরের গোপন গ্রন্থিতে সাতকুড়ি কাঁচা টাকা ঝম্ ঝম্ করে বেজে উঠল। প্রথম কেরায়া বাওয়ার দিন থেকে একটি একটি করে টাকা জমিয়েছে সে। তার সমস্ত যৌবনের রূপবিমুগ্ধ কামনাকে ঘাম ঝরানো পরিশ্রমের পবিত্র মূল্যে কিনবার জন্য একাগ্র নিষ্ঠায় কেরায়া বেয়ে সওয়ারী পারাপার করেছে। দেলভোগ, সাভার, বাসাইল, সিরাজ-দীঘা—জলবাঙ্লার উদার জলবিস্তারে নিজের নৌকাটাকে একটি স্রোতের ফুলের মত নোঙর বিহীন আনন্দে ভাসিয়ে দিয়েছে আজম। দিন-রাত্রির, ক্লান্তি-অবসরের কোন হিসাব ছিল না এই ঝড়ের মত কয়েকটা উন্মত্ত মাসের পাণ্ডুলিপিতে। নিশ্চিত বিশ্বাসে রমিনার বন্দরে নোঙর ফেলার জন্য নিশ্ছেদ প্রস্তুতি পর্ব্ব চালিয়ে গিয়েছে আজম। ঘরের ভেতর রমিনার স্বপ্নকে নিবিড় করে পাওয়ার জন্যই ঘরের বাইরে এই ক্লান্তিবিহীন আয়োজন।

কিন্তু সেই আয়োজন, সেই প্রস্তুতির কামনাকে গলা টিপে কদর্যভাবে হত্যা করেছে বড় ভূইঞা।

বড় ভূইঞা—একবার গর্জ্জন করে উঠল আজম। তারপরই আচম্কা চম্‌কে উঠল। সকাল বেলায় বলে এসেছিল, সন্ধ্যার ধূসর মুহূর্ত্তে মর্ম্মরিত নারকেল কুঞ্জে সে দেখা করবে রমিনার সঙ্গে, তাকে নিয়ে উধাও হয়ে যাবে এই পৃথিবীর আকাশ গঙ্গার পরপারে। কিন্তু তখন পালিয়ে গিয়েছিল রমিনা। তবু তাকে নিয়ে আসতে হবেই ঐ অপমৃত্যুর দোজখ থেকে।

ইতিমধ্যে নৌকাটা মেঘনার উন্মুক্ত পার ঘেঁষে মৃদু মৃদু ঢেউএ দোল খেয়ে চলেছে।

আচম্কা আকাশবাণীর মত শোনালো কথাগুলো।

"মাঝি কেরায়া যাবে না কী নদীর ওপার? আরে কে আমাদের আজম মাঝি না কী? অন্ধকারে ঠিক করে উঠতে পারি নি।"

পারের শ্বেতচন্দনের মত কোমল মাটিতে এসে দাঁড়িয়েছে ইদিলপুরের নতুন মসজিদের ইমাম সাহেব—আফজল হক্। আর ঠিক তার পেছনে বোর্খাগুণ্ঠিত একটি নারীমূর্ত্তি; খুব সম্ভব ইমাম সাহেবের বিবিজান।

দূরের কেরায়া ঘাটের সন্নিহিত ফেরীলঞ্চের নিশ্চল জেটীটা প্রলম্বিত হয়ে পড়ে রয়েছে। এইমাত্র কচুরী পানার উদ্দাম বিন্যাসকে বিচ্ছিন্ন করে মুন্সীগঞ্জের লঞ্চটা এসে ভিড়ল, সার্চ্চ লাইটের তীব্র আলো ছড়িয়ে পড়েছে ঝলকে ঝলকে। সোনারঙের বন্দর আর কেরায়া ঘাটটা আভাসিত হয়ে গিয়েছে। আর সেই আলোতে আফজল হকের মুখটা কি একটা ভয়ঙ্কর হিংস্রতায় যেন ঝকমক করে জ্বলে উঠলো, চোখের মণি দুটো অজগরের দৃষ্টির মত ক্রূর হয়ে উঠেছে। যেন এইমাত্র একটা রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডে নায়কের ভূমিকা শেষ করে এসেছে ইমাম সাহেব।

একটু চমকিত হয়ে উঠল আজম; "কোথায় যাইবেন ইমাম সাহেব?"

"চরইসমাইল।"

"অত দূরে যাইতে পারুম না। রাইত হইয়া গেল—এখন এক গাঙ্ পাড়ি দেওয়া যাইব না। কাইল সকালে আইসেন।"

আজমের গলায় নিরালম্ব নিস্পৃহতা।

ব্যস্ত হয়ে উঠল আফজল হক; ব্যগ্র পদসঞ্চারে এগিয়ে এসে গলুইটা চেপে ধরল; "কেউ এত রাত্রে যেতে চাইছে না। তোমাকে খুশী করে দেব। নাও—দেরী করার সময় নেই একমুহূর্ত্ত। সেদিনকার মসজিদের ব্যাপার নিয়ে কিছু মনে করো না আজম। আমিও ধর তোমাদের দলেই আছি। ধর, ধর, বৈঠা ধর।"

এবারে একটু মন সংযোগ করার চেষ্টা করল আজম। রাত্রির এই

অন্ধকারে ইমাম সাহেবের কবর-ফোঁড়া আবির্ভাব কি একটা রহস্যময় দিক্‌নির্দেশ করছে যেন। আজম বলল ; "কত দিবেন ?"

"পাঁচ টাকা।"

"পাচ ট্যাকা। ফুঃ। একখান কাথা দেই—বিবিজানেরে লইয়া সারা রাইত ঐ কেরায়া ঘাটের চালায় পইড়্যা পইড়্যা ঘুমান গিয়া। বিহানে (সকালে) উইঠ্যা সাতইর‍্যা যাইয়েন গিয়া। পাচটা ট্যাকা আর খরচ করবেন ক্যান ? ছাড়েন—গলুই ছাড়েন। কাম আছে আমার।"

আজ যেন কি হয়েছে আজমের। আঘাত দেবার তীব্র প্রেরণায় মনের ওপর প্রখর কাঠিন্য নেমে এসেছে। কর কর করে নিজের রসিকতার কর্কশ ছন্দে হেসে উঠল আজম। মনের সমস্ত ভারী মন্থরতা মুক্তি দেবার প্রয়াস পেলো যেন।

হ্যাঁ। অনেকটা সময় বাজেখরচ হয়ে গিয়েছে। খালের ঘাটে যদি এসেও থাকে আবার এতক্ষণে মর্ম্মরিত নারকেল বীথির অন্তরাল থেকে নিশ্চয়ই ভূইঞা বাড়ীর প্রেত-দুর্গে ফিরে গিয়েছে রমিনা।

গলুইটা আরো তীব্রভাবে আঁকড়ে ধরল ইমামসাহেব ; "সাত টাকাই দেব মাঝি, আমার বড় জরুরী কাজ চরইসমাইলে।"

নিরুপায় কণ্ঠের অসহায় উচ্চারণে আশ্চর্য লাগল আজমের। অথচ এই আফজল হকের গলায় সে দিন দেয়া ডেকে উঠেছিল ; মস্‌জিদের সেই শুভ্রশুদ্ধ পটভূমিতে দৃষ্টি থেকে জ্বলন্ত অঙ্গারবৃষ্টি হয়েছিল।

আবারও সেই রকম করেই হেসে উঠল আজম ; "সাত ট্যাকা আমারে দিবেন ক্যান ! ঐ ট্যাকা দিয়া আড়াই সের ত্যাল (তেল) কিনা নাকে দিয়া পইড়্যা থাকেন ; চরইসমাইলে যাওনের কথা মনেও থাকব না। ছাড়েন—ছাড়েন—"

"তবে কত টাকা চাই তোমার ? আমাকে আজ যেতেই হবে।

আজাদী আসার পর তোমরাই নবাব-বাদশা হলে দেখছি। কত চাই তোমার !"

একটা তীব্র উৎকণ্ঠা একরাশ গলিত পিণ্ডের মত উঠে এলো আফজল হকের গলায়।

"দশটা টাকা দিতে হইব মিঞাসাহেব—সাফা হিসাব।"

পরম বৈষ্ণবের মত সংসার বিবাগী একটা হাই তুলবার চেষ্টা করল আজম। চেতনাটা এখনও তার পরিপূর্ণ স্থির হয় নি। মনের সঙ্গে জবাবদিহি করার জন্য আরও খানিকটা একাকীত্বের অবসর প্রয়োজন। নিরাবরণ আকাশের নীচে উদারব্যাপ্ত নদীর বিসারে হালের বৈঠাটা শক্ত মুঠোয় চেপে বসলে অবসর পাওয়া যাবে অনেকটা।

তা ছাড়া মনের ভেতর একটা কুটিল সন্দেহের ছায়াসঞ্চার হয়েছে। আফজল হকের দুর্বিনীত কণ্ঠ কোন ভানুমতীর কুহকে এই ক'টা দিনের মধ্যে এত ক্লান্ত করুণ হয়ে এলো !

"দশটা টাকা !" আতঙ্কিত চীৎকারের সঙ্গে মহাপ্রাণীটাও যেন গলার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলো ইমাম সাহেবের।

"পারলে পাটাতনে ওঠেন, না হইলে গলুই ছাড়েন। রাইত হইয়া গেল দুফার।" এই ব্যাপারে আর একটা হাই তোলার বেশী অপব্যয় করবার মত উৎসাহ নেই আজমের।

চাপা গলায় এবার গজ গজ করে উঠল আফজল হক্; "ঠেকায় পেয়েছ; মোচড় দিয়ে টাকা আদায় করছ। কি আর করার আছে, দশ টাকাই দেব।"

প্রথম কথাগুলো যেন শুনতেই পায় নি আজম; কিন্তু শেষের কথা ক'টা নির্ভুলভাবে তার কানের সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেছে; "এই তো ইমাম সাহেবের মরদের লাখান কথা ছুটছে। বিবিজানেরে লইয়া নৌকার পাটাতনে ওঠেন। যাইতে যাইতে আবার রাইত ভোর হইয়া যাইব।"

একটা দিনের মধ্যে সে এতটা প্রগল্‌ভ হয়ে উঠল কেমন করে, শান্ত মনের তলদেশ থেকে অবিরাম বদ্বুদের মত এত বাচালতা আত্মপ্রকাশ করল কোথা থেকে, হিসাব করে উঠতে পারে না আজম।

আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে গেল ঘটনাটা।

আফজল হক্ পেছনের বোর্‌খার আবৃত নারীমূর্ত্তির হাত ধরে একটা আসুরিক-টান দেবার সঙ্গে সঙ্গে মৃদু গলায় অমানুষিক চীৎকার করে উঠল মেয়েটি; "না, না, আমি যাব না। আমাকে ছেড়ে দিন, আপনার পায়ে পড়ি।"

চাপা গর্জ্জন শোনা গেল আফজল ইমামের; "হারামজাদীর সুখে থাকতে ভূতে কিলায়। গিয়ে থাকবি খাঞ্জা-খাঁয়ের নাতিন-বিবির মত। তা না হ'লে সোনারঙের ঐ ডাকু বড় ভূইঞাটাই তোকে নিয়ে যেত। তার কীল খাওয়ার থেকে আমার খোদ বেগম হওয়া ভাল না!"

শরীরের উত্তেজিত শিরায় শিরায় প্রবহমান উষ্ণ তুর্কী রক্তে বাদ্‌শাজাদার পবিত্র মেজাজ অনুভব করতে লাগল ইমাম সাহেব।

এবারে মৃদু চীৎকারটি মর্ম্মান্তিক রূপান্তর নিল। চম্‌কে উঠল ইমাম সাহেব; তারপর ভারী ভারী কর্কশ হাত মুখের ওপর ঠেসে ধরল নারী মূর্ত্তিটির; "চুপ চুপ, একেবারে খুনই করে ফেলব।"

গলার আওয়াজে এমন একটা বীভৎস বীরকর্ম্ম করা যে একেবারেই অসম্ভব নয়—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহই থাকে না।

ফেরী লঞ্চের সার্চ্চলাইটটা অন্যদিকে ঘুরে গিয়েছে। কালো কাচের মত মেঘ্‌নার জল ঝকমক করে উঠেছে পান্নার কণিকার মত। এদিকে অন্ধকারের সেই ছিদ্রহীন যবনিকা; আর তারই মধ্যে সাপের মাথার মণির মত জ্বলছে ইমাম সাহেবের চোখ দুটো।

সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে দুটো চোখ আর দুটো কানের মধ্যে কেন্দ্রীভূত

করে দর্শন আর শ্রবণ, এই দুই পুণ্যকর্ম্মই করছিল আজম, আচম্‌কা সে বলে উঠল ; "কি মিঞা সাহেব, বিবিজানে কী কয় ? গোসা হইল না কী ?"

গলার স্বরটা তার কেমন যেন সন্দেহজনক।

ত্রস্তে তিড়িক করে লাফিয়ে উঠে নৌকার গলুইএর কাছে এসে দাঁড়াল ইমাম সাহেব, এলোমেলো গলায় বলল ; "পোলাপান মানুষ কি না—আম্মার কাছ থেকে স্বামীর ঘরে যেতে তাই কাঁদে। ও কিছু না মাঝি।"

"অ—আমি ভাবলাম বুঝি অন্য কিছু—"

গলার স্বরে আরো খানিকটা সন্দেহের উদ্বেগ ঢেলে দিল আজম।

কোন জবাব না দিয়েই এবার বোর্‌খা সমেত একরকম পাঁজা কোলে করে নারীমূর্ত্তিটিকে পাটাতনের ওপর তুলে নিয়ে এলো আফজল হক্। ঘাতকের হাতে উদ্যত ছুরী দেখলে যেমন করে নিরীহ পশু আর্ত্তনাদ করে ওঠে, বোরখার অন্তরাল থেকে তেমনি একটা আকাশ-ফাটানো চীৎকার ভেসে এলো। কেন্দ্রীভূত ইন্দ্রিয়গুলো আবার কেমন যেন বিপর্যস্ত হ'য়ে গেল আজমের ; "মিঞা সাহেব, আমার বড় ভয় করতে আছে। কাইল সকালেই যাইয়েন—"

"বাগে পেয়েছ, আচ্ছা পনেরো টাকাই দেব। নাও, আর দেরী করো না ; নৌকা খুলে দাও। রাতারাতি চরইসমাইলে পৌছে দেবে।"

আকাশবাণীটা এবার আরও উদাত্ত শোনালো আফজলের কণ্ঠে।

পনেরো টাকা ! বলে কী লোকটা—মাথার মধ্যে কোন বিপর্যয় বেধে যায় নি তো এই মুহূর্ত্তে। বাদাম তুলে দিলে উত্তুরে বাতাসের এক টানে গিয়ে চরইসমাইলের মাটিতে গিয়ে নৌকার গলুই ঠেকবে ত্রিযামা রাত্রির অনেক আগেই ; শুধু মাত্র হালের বৈঠাটা শক্ত মুঠোয় চেপে আকাশের আদিগন্ত বাসরে তারাদের আয়নায় রমিনার আতঙ্কিত মুখখানা দেখতে দেখতে একটা মৃত্যুশপথ নেওয়া। তার বিনিময়ে পনেরোটা টাকা ! হ্যাঁ টাকার বড়

প্রয়োজন ; রমিনাকে নিয়ে নতুন করে নীড় নির্ম্মান করার স্বপ্ন এখনও তার মন থেকে বিলীন হয়ে যায় নি ; একটা ভালো জাম কাঠের নৌকা না হ'লে এই ভাঙা একমাল্লাই দিয়ে সওয়ারী বাওয়া আর চলছে না।

এবার ইমাম সাহেবকে পরখ করলে আজম ; "কত টাকা দেবেন ?"

বিশ্বস্ত গলায় ছইএর ভেতর থেকে জবাব এলো ; "পনেরো।"

মোচড় দিলে আরো রস ঝরবে নিঃসন্দেহ কিন্তু আর গুণাহ্ করল না আজম। কিঞ্চিৎ ধর্ম্মবোধ আছে তার। বৈঠাটা দিয়ে পারের মাটিতে খোঁচা লাগিয়ে নৌকাটা মাঝ নদীতে নিয়ে এলো আজম।

এরপর অন্তহীন মেঘনার খরধারা ; রাত্রির পিঙ্গল চুল ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত বিসারী পটভূমিতে। দূরতম আকাশ থেকে অতৃপ্ত কামনার মত পাণ্ডুর জ্যোৎস্না এসে সমস্ত কিছুকে ভৌতিক আর মায়াময় করে তুলেছে।

কালো কাচের মত জলের নগ্ন স্বচ্ছতা এখন রাত্রির অন্ধকার নিঃসীমতায় তলিয়ে গিয়েছে ; ঢেউগুলো উদ্যত ফণার মত ছোবল দিচ্ছে জামকাঠের নৌকায়। হালের বৈঠাটা শক্ত মুঠোয় ধরে দূর আকাশের দিকে আজম তার দৃষ্টিটা বিকীর্ণ করে দিল। রাশি রাশি তারা স্বর্ণপদ্মের মত ফুটে রয়েছে ; তাদের মধ্যে আর একটি অদৃশ্য নক্ষত্র যেন এই রাত্রির অতলান্ত অন্ধকারে জোতির্ম্ময় দিশারী হয়ে দিক্‌নির্দ্দেশ করে চলেছে।

ঐ অদৃশ্য নক্ষত্র ! রমিনার ঘননীলিম সন্ধ্যাতারার মত দৃষ্টি, না ভাই-সাহেবের হীরকখণ্ডে প্রতিফলিত অগ্নিদীপ্ত চোখ ! মনসামঙ্গলের সেই-আগুন ঝরা অর্ঘ, না সোনারঙের কেরায়াঘাটে পিঙ্গল মশালের আলোতে সমবেত মানুষগুলোর সেই ঝকঝকে প্রতিজ্ঞা-দীপিত দৃষ্টি ? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কেবল মনে হচ্ছে একটা আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাষ নিয়ে ঐ সবগুলো সেই অদেখা দিশারী তারার মধ্যে কেন্দ্রিত হয়েছে। একটা আশ্চর্য দ্যুতি যেন ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে সেই নক্ষত্র থেকে।

ভাবনাটা ঠিক সোজা পথে চলছে না।

রমিনা। মনটা একটা জ্বালাভরা বেদনায় ভরে গেল আজমের। আজ কাল চৌচালা ঘরের বিছানাটাকে মৃত সাপের শীতল আলিঙ্গনের মত ভয়াবহ মনে হয়, বড় নিঃসঙ্গ আর বিলম্বিত মনে হয় বিনিদ্র রাত্রিটাকে। আর সেই অবয়বহীন একাকীত্বের মধ্যে রমিনার স্বপ্নসঞ্চার কতকগুলি ক্লান্তিকর দীর্ঘশ্বাসের অস্বস্তি জাগিয়ে রাখে সারা রাত। মনের সমস্ত কিছু বিমুগ্ধ স্বপ্নের কৌতূহলকে নির্বাপিত করে একটা মুখ ভেসে ওঠে—বড় ভূইঞা! উত্তেজনায় বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটো অশ্রান্তভাবে ঠোকাঠুকি সুরু করে দিয়েছে আজমের।

আচম্‌কা চেতনাটাকে বিস্রস্ত করে ছইয়ের ভেতর থেকে আফজল হকের গলা ভেসে এলো; "মাঝি একটা কথা বলব। আমি যে যাচ্ছি, এ খবর যেন কাকপক্ষীতে টের না পায়, অন্তত বড় ভূইঞা যেন না জানে।"

"ক্যান?"

"এমনি, তোমাকে আর পাঁচটা টাকা বেশী দেব।"

তর তর করে তীরের মত জল কেটে এগিয়ে চলেছে নৌকাটা। অনাবৃত মেঘ্‌না থেকে শেষ শীতের তীব্রতা রাশি রাশি দাঁত বসিয়ে দিচ্ছে চামড়ার ওপর। শরীরের ওপর উষ্ণমধুর কম্বলটা আরো নিবিড়ভাবে টেনে সঙ্কুচিত হয়ে বসল আজম। ভাবতে চেষ্টা করল, একদিন রমিনাকে নিয়ে অপরূপ এক জীবনকাব্য রচনা করেছিল সে, সে পৃথিবীর স্বীকৃতি-পাওয়া কবিদার:

ময়ূরপঙ্খী নাও ভিড়াইয়া আইলাম তোমার ঘাটেতে,
ও কন্যা, নিগুণ কথা কইয়া যামু কানেতে।
ও কন্যা, তুমি হইও চন্দ্রবদন, আমি হমু মুখের অঞ্চল,
তুমি হইও নয়নমণি, আমি হমু কালো কাজল।

মনের মধ্যে গানের গুঞ্জিত রেশটা স্তব্ধ হয়ে গেল আচম্‌কা। সুরের তন্ময়তা একটা তীব্র ঝাঁকানি খেয়ে সতর্ক করে তুলল ইন্দ্রিয়গুলোকে; সমস্ত সত্তাটাকে শ্রবণের মধ্যে সংহত করে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে রইল আজম।

ছইয়ের ভেতরে তখন খণ্ডপ্রলয় চলছে; একটা অস্বস্তিকর ধ্বস্তাধ্বস্তির পরিষ্কার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। বুকের ভেতর কি একটা অনুভূতি কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল আজমের। হাঁটু দুটো অশ্রান্তভাবে বলির বাজনার মত ঠক্‌ ঠক্‌ করে বেজে চলেছে।

সাপের শিষের মত ক্রূর গর্জ্জন হিস্‌ হিস্‌ করে বাজছে আফজল হকের গলায়; "চুপ চুপ—একেবারে গলা টিপে খুন করে ফেলব—"

"তাই, তাই করুন। আমি বেঁচে যাই। আমাকে ছেড়ে দিন, আমি জলেই ঝাঁপিয়ে পড়ব।" নারী কণ্ঠটি ভয়ঙ্কর রকমের করুণ শোনাল।

শ্মশানের শিয়ালের মত খিক খিক করে প্রেতলোকের হাসি হেসে উঠল অফজল হক্‌; "মরণ এতই সস্তা। এমনি তোকে মারব না কী—একটু একটু করে তোকে খুন করব। পুড়িয়ে পুড়িয়ে তোকে মারব।"

একটা ভয়াবহ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিল আফজল হক্‌; দু দুবারের হজ্জ ফেরৎ ইমাম সাহেব।

আর তার কথাগুলো ঝড়ের মত ধড়াস্‌ করে এসে আছড়ে পড়ল আজমের হৃৎপিণ্ডে।

মেঘ্‌নার অন্তহীন খরস্রোতে নৌকাটা ভেসে চলেছে তীব্রবেগে। পারের মাটিতে সুপারী-নারকেলের বীথিতে অশ্রান্ত মর্ম্মর। অবারিত সিন্ধু-বাতাস বাঁশীর সুরের মত মাতন তুলেছে অর্জ্জুন পাতার ফাঁকে ফাঁকে।

ছইএর ভেতর সেই পাটাতন-কাঁপানো ধ্বস্তাধ্বস্তিটা এখন নিথর হয়ে গিয়েছে। আজমের একাগ্র ইন্দ্রিয়গুলো আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আকাশের জ্যোতির্ম্ময় সপ্তর্ষি মণ্ডলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বড়ভূইঞার দাড়ি-বিভাসিত মুখখানা ভাববার চেষ্টা করল আজম।

মোরগ ডেকে উঠবার আগেই কাল ভোরে এই খবরটা ভাইসাহেবকে জানাতে হবে। সে দিন একটু মাত্র আভাষ দিয়ে এসেছিল তাকে। ভাইসাহেব—হ্যাঁ, সেই একমাত্র এই ভয়ঙ্কর অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাগ্নিক প্রতিবাদ তুলতে পারে। সেই তো তাদের হতমান জীবনে একমাত্র দিক্ নির্দ্দেশক।

জটে বুড়ী মেঘের মত চুল আলুলায়িত করে বসে রয়েছে। তারই মধ্যে মধ্যে অপরিচিত কৃষাণ জনপদে আলোর আভাস পাওয়া যায়। চাষীদের ঘরে রক্তদীপ্তির মত জ্বলছে কুপীগুলো; অন্ধকারের নিশ্ছেদ পাথরে ঠুকতে ঠুকতে কারা যেন মাথাগুলোকে শোণিতাঙ্কিত করে ফেলেছে।

সমস্ত কল্পনা আবার সরে গেল, প্রতিবাদের উদ্দীপ্ত সিদ্ধান্ত আবার ছত্রখান আর বিস্রস্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল আজমের।

ছইএর ভেতর থেকে একটা তীক্ষ্ণ ব্যাকুল প্রার্থনা শোনা গেল; "আমাকে ক'লকাতায় দিয়ে আসুন। আপনি আমার ধর্ম্মের বাপ।"

আবারও সেই বিষধর হাসি; "তোর বাপ না রে হারামজাদী, তোর ছেলের বাপ হ'ব। এখন চুপ মেরে পড়ে থাক। তোকে আনতে গিয়ে তিনটে সড়কির খোঁচা খেয়েছি তোর স্বোয়ামীর। একটা দিন ফূর্ত্তি করতে পারলাম না। মনে পড়ে না সে কথা!"

এই চলমান একমাল্লাই নৌকাটার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর প্রেতলোকের পরিবেশ টেনে আনল কথাগুলো। অতন্দ্র তমসার হৃৎপিণ্ড খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে যেন এই মুহূর্ত্তে কোটি কোটি ইব্‌লিশ নদীর অতলান্ত থেকে উঠে এসেছে; কেমন যেন ভয় করতে লাগল আজমের। হাতের জোড়গুলো কী খুলে খুলে যাচ্ছে? একাগ্র পেশীগুলো কী শিথিল হয়ে আসছে?

আবারও সেই ভয়ঙ্কর গলা, আবারও সেই অশরীরী জিনলোকের হাসি। বুকের ভেতর ছম ছম করে উঠল আজমের।

"বেশী ঘ্যান্ ঘ্যান্ করবি না। ঠ্যাঙ্ দুখানা ধরে ফেঁড়ে ফেলব একেবারে।"

পাখীর পালকের মত একটা ভীত-কোমল কণ্ঠ থর থর করে উঠল; "তাই করুন—তা হ'লে আমি বেঁচে যাই। আমার স্বামীকে আপনারা মেরেছেন।"

"তোর স্বামীকে মেরেছি। পুরানো স্বামীতে কতদিন আর স্বাদ থাকে, নতুন স্বামী চাখ্ রসবতী। মন-মেজাজ তাজা হ'বে।"

সঙ্গে সঙ্গে সেই একটানা হাসির পুনরাবৃত্তি।

অমানুষিক গলায় আর্ত্তনাদ করে উঠল মেয়েটি। বোর্খার অবগুণ্ঠনের আড়ালে এমন একটা আকাশ-ফাটানো চীৎকার কোথায় লুকিয়ে ছিল, এতক্ষণের মধ্যে আবিষ্কার করে উঠতে পারে নি আজম।

শীতশেষের মুমূর্ষু রাত্রি চমকে উঠল; "আমাকে ছোঁবেন না, ছোঁবেন না। এই আপনার ধর্ম্মের বিচার। এই জন্যে ওদের হাত থেকে আমাকে ছিনিয়ে এনেছেন? আপনি বলেছিলেন, আমাকে ক'লকাতায় দিয়ে আসবেন—আমাকে আর ছোঁবেন না—"

"ইস্ সতী বেউলা দেখি একেবারে! ছোঁবেন না! ছোঁব না তো সুরৎ দেখাবার জন্য এনেছি তোকে!"

ছইএর ভেতর ধ্বস্তাধ্বস্তির আভাষ। একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার ইঙ্গিত বয়ে এনেছে আফজল হকের মৃত্যুগর্ভ কথাগুলো। নৌকাটা টলমল করে ঢেউএর ওপর আছাড় খেতে খেতে এগিয়ে চলল।

মৃদু গলায় আজম কিছু একটা উচ্চারণ করার আগেই ছইএর ভেতর তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল মেয়েটি; "আমাকে বাঁচাও মাঝি, আমাকে বাঁচাও, আমার সর্ব্বনাশ ক'রে ফেলল!"

ঐ আকাশ-ফাটানো চীৎকারের মধ্য দিয়ে, এই নিকষ তমসাবৃত পটভূমিতে, যেখানে মেঘ্‌নার অবারিত তরঙ্গ-স্পন্দন ছাড়া আর কোন পৃথিবীর অস্তিত্ব নেই, সেখানে একটা নিশ্চিত মৃত্যুর সঞ্চার হ'ল।

সুরভিত চাঁপার কলির মত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সোনালী সকালের মোহন স্বপ্নমাখা রাজকন্যা মনের গুঞ্জিত সংগীত থেকে সরে গিয়েছে। কী একটা অনিবার্য প্রতিজ্ঞায় পেশীগুলো বজ্রের মত প্রখর হয়ে গেল, শিরায় শিরায় বহমান মৃদু-কম্পিত রক্তে খড়্গাধার স্রোত নেমে এলো, চোখের মণি দুটো গুলবাঘের দৃষ্টির মত ধক্ ধক্ করে জ্বলতে লাগল আজমের। সে কবিদার। তার যৌবনস্বপ্নকে নির্ম্মম নখরাঘাতে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দিচ্ছে বড় ভূইঞা। দু-দুবারের হজ-ফেরৎ হাজী সাহেবেও সেই নির্ম্মমতারই অংশীদার। বড় ভূইঞার সঙ্গে তারও অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা। এই মুহূর্ত্তে ইমাম সাহেবর মধ্য দিয়ে তাদের সবার বিরুদ্ধে একটা আগ্নেয় প্রতিবাদ জানাবার, একটা রক্তাক্ত প্রতিশোধের সন্ধান পেল কি আজম?

ভয়ানক গলায় ডাকল আজম; "মিঞা সাহেব—"

বাঁ হাতে হালের বৈঠাটা শক্ত করে চেপে ধরে ডান হাতটা আড়কাঠের নীচে ধারালো কোচের ফলাগুলোর দিকে প্রসারিত ক'রে দিল আজম। আজ রমিনার সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে সারাটা রাত্রি কাটিয়ে দেবার কঠিন সঙ্কল্প ছিল আজমের, কিন্তু সেই ভাবনার পাশে পাশে এমন একটা নিষ্ঠুর অপমৃত্যু ওত পেতে ছিল—তা কি সে জানত!

ছই খুলে বাইরের পাটাতনে এসে বসেছে আফজল হক্; দু দুবারের হজ-ফেরত ইমাম সাহেব; সঙ্গে সঙ্গে একরকম ঝাঁপিয়েই বাইরে বেরিয়ে এলো মেয়েটি। এক ঝলক জল গলুইর ওপর দিয়ে নৌকার ডোরায় এসে উঠল; "আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও মাঝি। আমি বামনবাড়ীর বউ; কাল রাত্রে আমার স্বামীকে এরা মেরেছে।"

দানা-পাওয়া কণ্ঠ ; রক্তের মধ্য দিয়ে কেমন যেন শির শির করে বয়ে গেল স্বরটা। আজমের মনে হ'ল রাত্রির অন্ধকার গুণ্ঠনের তলা থেকে রমিনার আর্ত প্রার্থনা ঐ স্বরের মধ্য দিয়ে ভেসে আসছে, মনে হ'ল আফজল হকের কুৎসিত দেহের রেখায় রেখায় বড় ভূইঞার ক্লেদাক্ত সঞ্চার হয়েছে।

মাথার মধ্যে কেমন যেন বিপর্যয় ঘটে গেল সহসা। ধারালো কোচের মসৃণ ফলাগুলো নির্ভুল লক্ষ্যে গিয়ে গেঁথেছে চক্ষের নিমেষেই, আফজল হকের বাধা দেওয়ার অনেক আগেই।

একটা প্রচণ্ড চীৎকার কুণ্ডলিত হ'য়ে আকাশে উঠে গেল ; "ইয়ে আল্লা, রসুলাল্লা—"

তারপর নৌকার ভার খানিকটা হাল্কা করে আফজলের দেহটা শীতের মেঘনার তুহিন-সঞ্চারিত খরস্রোতে পাক খেয়ে কোন দিকে মিলিয়ে গেল। আগামী কালের সূর্য হয় ত দামঘাসের উদ্দাম আচ্ছাদনে ঢাকা কোন রূপালী বালুচরে মৃতদেহটা আবিষ্কার করবে ; কিংবা মেঘের ছায়ার মত কালো রঙের কুমীর ঘড়িয়ালের পেটে টুকরো টুকরো হয়ে সগৌরবে বিরাজ করতে থাকবে আফজল হক্। পৃথিবীর আলো কোনদিনই তার সন্ধান পাবে না।

ততক্ষণে কোচের ফলাগুলো পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে আবার ডোরার নীচে চালান করে দিয়েছে আজম।

আতঙ্কে শ্বাসনলী যেন চেপে আসতে চাইছে মেয়েটির, আঙুল ফেটে ঝিঁঝিঁ করে রক্ত বেরিয়ে আসতে চাইছে ; চোখ দুটো দেহের সঙ্গে বিদ্রোহ করে আবদ্ধ থাকতে চাইছে না।

শান্ত গলায় আজম বলল, যেন একটু আগের রক্তাক্ত ঘটনাটা এই অন্ধকার পাণ্ডুলিপি থেকে মুছে গিয়েছে ; "আপনে যাইবেন কই ?"

পাণ্ডুর উত্তর এলো, যেন অনেক দূর থেকে কোন ছায়া অস্পষ্ট গলায় কথা কয়ে উঠল ; "আমি মাধব বাড়োরীর মেয়ে। এখানে আমাদের কেউ নেই, কাল রাত্রে লোক লাগিয়ে ইমাম সাহেব সব মেরেছে। তারপর আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে। কলকাতায় আমার এক দেওর আছে—সেইখানেই যেতে চাই।"

নৌকার গলুইটা তারপাশা ষ্টীমার ঘাটার দিকে ঘুরিয়ে দিল আজম। আবার সেই মেঘনার তরঙ্গবিস্তার, একটানা সোঁ সোঁ ঝড়ো বাতাসের গর্জ্জন।

ভোর রাত্রে দূরের আকাশে এক আস্তর ছায়া ছায়া রঙের অস্পষ্ট আলোর ছোপ ধরল। আর এমন সময় তারপাশার ষ্টীমার ঘাটায় এসে 'পারা' পুঁতল আজম।

নৌকার পাটাতনে স্থিরনির্ব্বাক বসে রয়েছে মেয়েটি ; মুখের ওপর প্রথম ভোরের মুমূর্ষু আলোর আল্পনা। সেদিকে তাকিয়ে দৃষ্টিটা কেমন কেঁপে গেল আজমের। মেয়েটির অনাবৃত মুখে যেন রমিনার আদল স্পন্দিত হয়ে গেল।

জেটীঘাটার ওপর অসংখ্য মানুষের শঙ্কিত জটলা। যাযাবরের মত দেশের স্নেহমদির ঘরভদ্রাসন ছেড়ে সকলে চলে যাচ্ছে। মুখে চোখে ভয়ের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আঁকা ; একটা অপমরণের শ্মশান থেকে ঊর্দ্ধশ্বাসে জীবনের প্রসন্ন প্রতিশ্রুতিতে পালিয়ে যেতে চাইছে সকলে।

এক সময় মেয়েটিকে নিয়ে ওপরে টিকেট ঘরের দিকে এগিয়ে এলো আজম, বলল ; "টিকিট কিনা দেই আপনের ?"

ইতস্ততঃ কণ্ঠে মেয়েটি বলল, "আমার কাছে তো টাকা নেই।"

চকিতে কি যেন মনে পড়ে গেল।

কোমরের গেঁজেতে তার বয়ঃসন্ধির বাসন্তী স্বপ্ন কিনে আনার মূল্য রয়েছে।

এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করল আজম, তারপর বিরাট জনসমুদ্র ঝাঁপিয়ে পড়ে টিকিট কিনে আনলো একখানা।

ইতিমধ্যে পোঁ দিয়ে মুন্সীগঞ্জ থেকে ঢাকা মেল এসে পড়েছে। বাকী টাকাগুলো মেয়েটির হাতে দিতে দিতে আজম বলল ; "এই ট্যাকা কয়টা রাখেন। কামে লাগব পথে। এত মানুষ যাইতে আছে, কেউরে ধইর‍্যা কইলকাতায় গিয়া উঠবেন। পারবেন তো !"

"পারবো। কিন্তু এই টাকা—"

অপরিসীম সঙ্কোচে মাথাটা নীচের দিকে নেমে গিয়েছিল মেয়েটির, ওপর দিকে দৃষ্টি তুলবার সঙ্গে সঙ্গে কারুকে দেখা গেল না। একটা অবিশ্বাস্য ভোজবাজীর কুহকে মাঝিটা যেন মরীচিকার মত কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে।

কেরায়া ঘাটে নিজের একমাল্লাই নৌকাটার দিকে আসতে আসতে আজমের কি মনে পড়ল ! রমিনাকে ? না। রাত্রির অন্ধকারে মাধব বাড়োরীর ঐ রহস্যময়ী মেয়েটিকে ? তাও নয়। আজকে সওয়ারী বাওয়ার টাকা দিতে না পারলে সৎমা রোশেনার গলা থেকে লঙ্কা রসুনের মিশ্রিত উগ্রতা বেরিয়ে সমস্ত দিন-রাত্রি বিস্বাদ করে দেবে, সেই চিন্তাতেই কি আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল আজমের স্নায়ুগুলো ! তাও নয়।

তার মনে পড়ল কাল রাত্রির সেই রক্তাক্ত কোচের ফলাগুলো ; চেতনার ওপর দিয়ে দুলে দুলে তারা যেন নেচে চলেছে অবিরাম। তার মনে হ'ল, ঐ ঝকঝকে কোচের ফলাগুলোতে রমিনার আর্ত্ত পলায়নের আর মনসামঙ্গল-রৈবতকের আর একটা পরিষ্কার অর্থ সে খুঁজে পেয়েছে। নতুন রাতপ্রভাতের কবিদার সে।

মেঘনার হু হু বাতাসের অশ্রান্ত আকুলতায় কোন বনস্পতির নিভৃত ছায়ায় রমিনাকে নিয়ে ঘর বাঁধার আগে, রাত্রির ক্রুর অন্ধকারে কতবার আফজলদের আবির্ভাব হবে ? কতবার ? !

আজমের মনে পড়ল কোচটায় অনেকদিন শান পড়ে নি। আজই শান দিয়ে রূপার মত ঝকঝকে করে তুলতে হবে কোচটা।

তেরো

ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সড়কটা সোনারঙের বন্দর থেকে উঠে এসে ফসলরিক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে মসৃণ রেখায় ছড়িয়ে পড়েছে দূরের ক্রান্তি বলয়ের দিকে। দুপাশে হিজল-বউন্যার সারি থেকে কোমল ছায়ার সোহাগ স্থির হয়ে রয়েছে সড়কটার ওপর। নয়ানজুলিতে বর্ষার জল সরে যাবার পর পুরু শৈবালচিহ্ন আঁকা হয়েছে। ধানকাটা মাঠের শূন্যতায় মেঠো ইঁদুরের ইতস্ততঃ স্বেচ্ছাসুখে পদচারণা। আলপথের ধারে ধারে সবুজ জলসেঁচি ঘাসের সন্ধানে কয়েকটা দড়ি-ছেঁড়া বিদ্রোহী গরুর আবির্ভাব হয়েছে। তাদের কাঁধের দগদগে ঘা থেকে পোকা বেছে দিচ্ছে গোটা কয়েক দার্শনিক গোবক। শেষ শীতের রোদ থেকে মধুর উত্তাপ এসে দোল খেয়ে পড়েছে আচক্রবাল প্রান্তরের ওপর।

এই ঝিমমারা দুপুরে, নির্জ্জন সড়কটার ওপর দিয়ে চলতে চলতে আজম একবার চারদিকের নিঃসীম শূন্যতার দিকে দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিল। কেউ কোথায়ও নেই। দূরের সুনীল বনশীর্ষের ওপর দিয়ে একঝাঁক বনকবুতর ধূসর রঙের বিন্দু হ'য়ে মিলিয়ে গেল। নয়ানজুলিতে বুনো কচুর নীল্‌চে সমুদ্র আলোড়িত করে একজোড়া ডাহুক দম্পতী কলরব করে উঠল।

একটু চম্‌কে উঠল আজম। আর সহসা কাল রাত্রির রক্তাঙ্কিত ঘটনাটা চেতনার ওপর দোলায়িত হ'য়ে গেল। এইমাত্র সোনারঙের কেরায়া ঘাটে 'পারা' পুঁতে সে উঠে এসেছে। এখন এই নির্মানব

সড়কের ওপর দিয়ে চলতে চলতে বুকের ভেতরটা একটা অস্বাভাবিক ভয়ের তুহিনস্পর্শে ছম ছম ক'রে উঠল। পেছন দিক থেকে কে যেন তাকে নিশ্চুপ পদসঞ্চারে অনুসরণ ক'রে চলেছে।

একবার ফিরে তাকালো আজম।

সঙ্গে সঙ্গেই পদধ্বনি থেমে গেল। আবার পায়ে পায়ে মসৃণ পথটা ধরে এগিয়ে চলল সে। আবারও সেই ভয়ঙ্কর অনুসরণ; অপরিসীম আশঙ্কার অন্ধকারে স্নায়ুগুলো আচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগল আজমের।

তবে কি মেঘনার অতলগর্ভ থেকে আফজল হকের জিন সরু সরু বঁড়শির লত অতিকায় পা ফেলে তাকে ধাওয়া করে নিয়ে চলেছে!

ব্রহ্মতালুটা যেন আঠার মত চট চট করছে; অতৃপ্ত তৃষ্ণায় ছাতিটা বৈশাখী মাঠের মত ফেটে গিয়েছে। সারাটা রাত নৌকা বেয়ে অতন্দ্র কেটে গিয়েছে আজমের। সকালের দিকে সোনারঙের কেরায়া ঘাটে আসতে আসতে শরীরের গ্রন্থিগুলো ক্লান্তিতে শিথিল হ'য়ে গিয়েছিল; এখন সেই জোড়ে জোড়ে কোথা থেকে যেন দুর্ব্বার গতিবেগ বর্ষাপ্লাবিত মেঘনার ঢলের মত নেমে এলো।

রাত জাগা রক্তাভ চোখ দুটো চারদিকে একবার ছড়িয়ে প্রাণপণ ছুটতে সুরু করল আজম। পেছনের পদধ্বনিটা যেন তারই অগ্রগতির সঙ্গে সমতালে এগিয়ে আসছে।

আরো জোরে ছুটতে লাগলো আজম, আরো আরো জোরে, দুর্ব্বার বেগে। এখন আর একটা পায়ের আওয়াজ নয়; অনেক, অজস্র। ফাঁকা মাঠের চারপাশ থেকে ফিসফিস করতে করতে দৌড়ে আসছে যেন। কারা ওরা? একটা কোচের আঘাতে কি একটা ইমাম সাহেব কোটি কোটি জিনে জন্মান্তর নিয়েছে?

হাঁপাতে হাঁপাতে সোনারঙের খালের পারে এসে সুতীব্র ঝাঁকানিতে

সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো এবার সচেতন হ'য়ে গেল আজমের। নারকেল বীথির মর্ম্মরিত পটভূমিটার পাশেই একটা উঁচু ঘাসে ভরা টিলা। সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে ভাইসাহেব। তারপরেই একটা কোমল ডাক ভেসে এলো।

"আজম—আজম—কি ব্যাপার ? এত দৌড়াচ্ছ কেন ?"

"আইজ্ঞা।"

এইমাত্র প্রেতাত্মাপরিকীর্ণ একটা গোরস্থান রুদ্ধশ্বাসে পাড়ি দিয়ে এসেছে আজম। বিপজ্জনক এলাকাটা পেরিয়ে এসে সর্ব্বপ্রথম মানুষের সাহচর্য পেয়ে যেন প্রাণিত আশ্বাসে ফিরে এলো সে।

ব্যগ্রতা-গর্ভ গলায় মনসুর বলল ; "কি হয়েছে তোমার ?"

"আইজ্ঞা—কিছু না।"

দ্রুত লয়ে পর পর কতকগুলো দীর্ঘশ্বাস পড়ল আজমের।

মনসুর বলল ; "তারপর আসছে কাল সোনারঙের বন্দরে যে আসর বসাবার কথা ছিল—তার কিছু করেছ ? চরে, গঞ্জে, গ্রামে খবর দিয়েছ ?"

এখনও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সত্তায় ফিরে আসে নি আজম; তবু মনসুরের কথা শুনতে শুনতে চমকে উঠল সে। সত্যই তো ! কালকেই তো আসর জমাবার অগ্নিগর্ভ তারিখ। সহর থেকে ভাইসাহেব কাদের যেন নিয়ে আসবে। তারা চর-গঞ্জ আর কৃষাণদের গ্রাম-জনপদগুলো থেকে আসা সহস্র সহস্র পরিশ্রমী মানুষের মধ্য দিয়ে জলবাঙলার পরিব্যাপ্তিতে বাজান নানার ভাষার দাবীকে দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে যাবে। বাঙলা ভাষা রক্ষার জন্য প্রতিটি প্রাণে প্রাণে অজেয় দুর্গপ্রাকার নির্ম্মান করে দিয়ে যাবে। তারই প্রস্তুতি কালকের আসরে। কিন্তু এই কটা দিন রমিনা তার মন থেকে বাইরের পৃথিবীকে সরিয়ে দিয়েছিল। বিস্মরণের নেপথ্যলোকে হারিয়ে গিয়েছিল মনসামঙ্গল, রৈবতক, শিবায়নের দাবীর কঠিনতম সঙ্কল্প।

অমেয় সঙ্কোচে মাথাটা নিচের দিকে নেমে গেল আজমের। সস্নেহ গলায় মনসুর বলল ; "বুঝেছি। যাক্ তার জন্য না ভাবলেও চলবে। কালকে আসর জমানো সম্ভব হতো না।"

অবাক বিস্ময়ে মুখখানা ওপর দিকে তুলল আজম। চোখে বিনিদ্র রাত্রির রক্তরাগ স্থিরচিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনসুরের কণ্ঠে বজ্র ডাকলো, তীক্ষ্ণ উত্তেজনায় থর থর করে ঘনকম্পিত হতে লাগল স্বরটা ; "জোর করে উর্দ্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাইছে সরকার ; আমাদের পূর্ব্বপুরুষের এতদিনের সাধনাকে ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইছে। জানো আজম, আজকে ঢাকাতে গুলি লাঠি চালিয়েছে এই জন্য। কিন্তু, কিন্তু আমরাও দেখব ওদের বুলেট আমাদের ক'টা পাঁজর ফুটো করতে পারে, আমরাও দেখব ওদের লাঠি আমাদের কটা মাথা গুঁড়িয়ে দিতে পারে।"

তার পরেই আশ্চর্য কোমল হয়ে এলো মনসুরের গলাটা ; "আজম তুমি কবিদার। একটা গান বাঁধতে পারো তুমি ! কাল আমরা য়ুনিভার্সিটির সামনে মিটিঙ্ করব। ১৪৪ ধারা যদিও আছে, তা ভাঙতে হবে। তোমার গান দিয়েই আমরা সভা সুরু করব, পারবে তো।"

নির্ব্বোধ দৃষ্টিটা তুলে আজম বলল; "আইজ্ঞা।"

"হ্যাঁ শোন। সব শয়তানের বিরুদ্ধে, সব ইব্লিশের বিরুদ্ধে, সব বখিলের বিরুদ্ধে গান বাঁধতে হবে। বড় ভূইঞা, মৌলবী, ইমাম—কেউ বাকী থাকবে না, সকলের বিচার হবে তোমার গানে। পারবে তো ! আমরা আছি তোমার পাশে পাশে। তোমাদের দাবীর কথা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা এসে বল। আমরা আর তোমরা একসঙ্গে থাকলে পৃথিবীর কোন শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। বাঙ্লা ভাষাকে রক্ষা করতেই হবে।"

আশ্চর্য দৃষ্টিতে তাকালো মনসুর, তার চোখে একটা আশ্চর্য আগুনের দীপ্তি ফুটে বেরিয়েছে।

উত্তেজিত মর্ম্মলোক থেকে স্বীকৃতি ভেসে এলো আজমের ; "হ, হ, ঐ ভূইঞা, ঐ ইমাম, কেউরে আমি ছাড়ুম না। কোচের ঘাই মাইর‍্যা সব গুলিরে আমি শ্যাষ করুম।"

চোখ দুটো তার রক্তাক্ত মনে হচ্ছে।

মনসুর বলল ; "এই তো চাই। কাল আমার সঙ্গে ঢাকায় যেতে হবে আজম ; কোচের আঘাত নয়, তার চেয়েও বড় কাজ তোমার রয়েছে। তোমার হাতে কোচ নয়, কলম থাকবে, গলায় থাকবে সুর সেইতো সবচেয়ে বড় অস্ত্র। যেতেই হবে তোমাকে। কাল সকালে কেরায়া ঘাটে চলে এসো। এখন যাই, অনেক কাজ আছে মুন্সীগঞ্জে।"

ঘাসের জাজিম-বিছানো টিলাটার ওপর থেকে ডিষ্ট্রিকবোর্ডের সড়কটায় নেমে গেল মনসুর।

অগ্নিপ্লাবিত দুপুরের ঝিমধরা নেশায় কথা দিয়ে এসেছিল আজম। সে গান রচনা করবে। মনসুরের সবগুলো কথার অর্থ আজ পরিষ্কার উপলব্ধি করেছে সে, মর্মলোকের আলোড়নে অনুভব করেছে বহ্নিঝরা গান বাঁধার নির্মমতম আবেদন। সে জলবাঙলার সহস্র মানুষের অভিনন্দিত মানসশিল্পী। প্রয়োজন হ'লে হাতের মুঠোয় সে কোচের নিষ্ঠুর ফলাগুলোকেও চেপে ধরতে পারে।

এখন সন্ধ্যা। ধূপছায়া রঙের অন্ধকার ঘনীভূত হয়েছে আকন্দ-লাটার পত্রপুটে, অর্জ্জুন-ছৈতানের শাখা-প্রশাখায়।

নিজের ঘরখানায় ঢুকে কুপীটা জ্বালিয়ে দোয়াত কলম নামিয়ে বসল আজম। মনসুরের কথাগুলো একটা বিচিত্র উত্তেজনার মত রক্ত-কণিকাগুলোর ওপর অস্থির পদসঞ্চারে নেচে চলেছে। আগামী কাল

তাকে ঢাকায় যেতে হ'বে, আগামী কালের রক্তাক্ত অধ্যায়কে রাজান নানার সাতপুরুষের ভাষার মধ্যে সঞ্চারিত করতে হ'বে আজ রাত্রেই।

মনসামঙ্গল, রৈবতক, ময়নামতীর গানের রহস্যলোক থেকে সেই কুহকিত পথটা কী সব মায়া, সব মোহ, সব অস্পষ্টতার প্রান্তবিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে? মেঘনাপারের মানুষগুলোর প্রশ্নদীপিত দৃষ্টির, ভাইসাহেবের রহস্যময় গলার, রমিনার ভীতচকিত পলায়নের, কাল রাত্রিতে সেই রক্তাক্ত কোচের ফলাগুলোর সমস্ত অর্থই কি পরিষ্কার হয়ে এসেছে মর্মলোকে?

মাটির পৃথিবীর কাছে বড় বেশী দাবী ছিল না আজমের। রক্তঝরা দুর্গম পথের কবিদারই সে হ'তে চেয়েছে, হ'তে চেয়েছে মেঘনাপারের সহস্র মর্মমানসের প্রতিনিধি। স্বীকার করে নিয়েছে সমস্ত পরিশ্রমী মানুষের প্রার্থনা—সেই বাঙলা ভাষাকে। তার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাসহচরী হিসাবে পেতে চেয়েছিল রমিনাকে। সঙ্গে সঙ্গে মাটির অকৃপণ ভাণ্ডার থেকে কয়েককণা শস্য, একটী শান্তশ্রী গৃহাঙ্গন—কবিদারের কল্পলোকের একটি সুস্নিগ্ধ পরিবেষ্টনের প্রার্থনাও ছিল। কিন্তু নির্মম পৃথিবী তাকে আঘাত দিয়েছে; আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করে দিয়েছে তার হৃদয়কোষে সহস্রদল স্বর্ণপদ্মের সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা শিল্প সরস্বতীকে।

মনের নীহারিকায় নীহারিকায় একটা ক্ষ্যাপা উন্মাদনা স্পন্দিত হ'তে থাকে আজমের।

সারাদিন তারাপাশার কামরুদ্দিন শেখের বাড়ী কামলা খেটে এসেছে জিগিরালি, শরীরটা অপরিসীম ক্লান্তিতে অবসন্ন হ'য়ে আসছে। উঠানের এক কিনারায় বসে তামাক টানতে টানতে আজমকে দেখে একেবারে ক্ষেপে উঠল; "এই যে নবাবের ছাও আইল, এইবার রাইতভর বাত্তি (আলো) জ্বালাইয়্যা গুষ্ঠীর মাথা লেখতে বসব। আমি জিগাই কেরাসিন আনতে

পয়সা লাগে না, দোকানিরা আমার সুমুন্দি হয় না কি, যে মাগ্‌না দিব বইনের জামাইরে।"

এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ অবহেলায় ফেলে রাখার পাত্রই নয় রোশেনা; সেও তার ধাতব কণ্ঠসংগীত সুরু করল; "আইজ কেরায়া বাইয়া একটা কানা আধলাও দ্যায় নাই—সে আবার গান লেখে—বুড়া খাটাস—"

বিরক্ত হয়ে উঠল আজম, ভয়ানক গলায় বলল; "চুপ মার বাজান, থাম আম্মা। এই রাইতে আর চিল্লাচিল্লি ভালো লাগে না।"

"ভালো লাগে না! আমার বাদ্‌শাজাদারে, যাও বাইর হও, আমার বাড়ীতে তোর আর ভাত নাই। এই মুহূর্ত্তে বাইর হইয়া যা।"

আর কোন জবাব দিল না আজম। কাগজপত্র, দোয়াতকলম, ছেঁড়া মনসামঙ্গল আর পুরনো চণ্ডীদাসের পদাবলীখানা নিয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

রোশেনা শ্লেষঝরা গলায় বলল; "ত্যাজ (তেজ) কইর‍্যা বান্দীর পুত আবার যায় কই এত রাইতে?"

আগ্নেয় দৃষ্টিটা রোশেনার মুখের দিকে সম্পাত করে চাপা গলায় বলল আজম; "কবরে—"

রাত্রির অন্ধকারে বিশৃঙ্খল পা চালিয়ে সোনারঙের খালটার কাছে এসে পড়েছে আজম। শরীরের প্রতিটি রোমরন্ধ্র দিয়ে অজগরের লিকলিকে জিভের মত আগুনের ফণা বেরিয়ে আসছে যেন। কি সে এখন করবে?

আচম্‌কা শুক্‌নো মাদার পাতার ওপর পদধ্বনিতে চমকে উঠল আজম, তারপর রুদ্ধ গলায় চেঁচিয়ে উঠল; "কে?"

"আমি হাসেম। আপনে এইখানে, এত রাইতে! কি ব্যাপার কবিদার!"

হাসেমের গলায় বিস্ময়ের চমক।

"এমনেই। তুমি কি মনে কইর‍্যা ?"

একটু হাসির অভ্যর্থনায় মুখর হবার চেষ্টা করল আজম।

"গাঙে যামু বড়শিটা পাততে।"

সহসা গলাটা নামিয়ে আজম বলল ; "রমিনারে এট্টা খবর দিতে পারো হাসেম। আমি তার লগে দেখা করুম এক ফির।"

"আপনের লগে আর রমিনা বইন দেখা করব না।"

"ক্যান ?"

হৃৎপিণ্ডটা দুলে উঠল আজমের।

"আইজ আর ডর নাই কবিদার। আইজ যদি বড় ভূইঞা আমারে খুন কইর‍্যা ফেলায়, তবু কমু। আপনের গান শুইন্যা বুকে বল পাইছি। রমিনা বইনের প্যাটে ঐ শয়তান বড় ভূইঞাটার পোলা রইছে ; সেই সরমে সে আর আসব না আপনের কাছে।"

একসময় আজমের বিগতবুদ্ধি দৃষ্টির সামনে দিয়ে মেঘনার দিকে মিলিয়ে গেল হাসেম।

মাথার মধ্যে কোথায় যেন আর একবার অগ্ন্যুৎপাত হ'ল আজমের।

অনেক রাত্রে মুখুটি বাড়ীর উঠানে এসে মৃদু গলায় ডাকল আজম ; "ঠাইন দিদি, অ ঠাইন দিদি—ঘরে আছেন না কি।"

"কে রে আজমা না কি ; আয়, আয় ভাই।"

একা রক্তচাঁপা রঙের কুপী জ্বালিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন একজন বৃদ্ধা তিনি ছাড়া এতবড় বাড়ীটার শ্মশানপর্বে প্রহর জাগার মত আর কোন নায়ক নায়িকাই নেই। দেশ-বাটোয়ারার সঙ্গে সঙ্গে সব ক'লকাতায় চলে গিয়েছে।

আজম বলল ; "আপনেগো দক্ষিণ দিকের ঘরখান খুইল্যা দ্যান, আমি আইজ রাইতটা থাকুম এইখানে। আমারে একটা কুপী দিবেন ঠাইন দিদি।"

একমুহূর্ত্ত আজমের মুখের ওপর সস্নেহ দৃষ্টিটা স্থির রেখে বৃদ্ধা বলে উঠলেন ; "গোসা হইয়া আইছস নিচ্চয় ; মুখখান শুকাইয়া কই লইয়া গেছে ! তুই গিয়া দক্ষিণের ভিটির ঘরে বস, খোলাই আছে। আমি দুগা চিড়ামুড়ি লইয়্যা আসি।"

একটু পরেই একটা বেতের ডালায় কিছু চিঁড়েমুড়ি নিয়ে এলেন বৃদ্ধা, বললেন ; "এ গুলা খাইস। আইজ কাইল আর তো আসসই না। তোর মুখে সখীসোনার গান এত মিঠা লাগে, অথচ তুই একদিনও আইস্যা শুনাইয়্যা যাইস না।"

"আর ঐ সখীসোনার গান গাইতে দিব না। গরমেণ্ট আইন বাইন্ধ্যা দিব। বাঙ্‌লা ভাষা ভুইল্যা যান।"

আশঙ্কিত গলায় বৃদ্ধা বললেন ; "বাঙ্‌লা ভাষা ভুলুম ক্যামনে ? ও যে বুকের মধ্যে মিশ্যা আছে। ক'স কি তুই আজমা যত সব্বনাইশ্যা কথা !"

"যা কই সত্য। বন্দুকের গুলী দিয়া ঐ বুকখান ফুটা কইর‍্যা দিলেই একমুহূর্ত্তে ভুইল্যা যাইবেন ঠাইন দিদি।"

একটা করুণ হাসির ম্লানিমা বিকীর্ণ হ'য়ে পড়ল আজমের সমস্ত মুখখানার পটভূমিতে।

তীক্ষ্ণ শঙ্কায় বৃদ্ধা বললেন ; "দেখিস তুই আজমা, গরমেণ্ট যতই আইন বান্ধুক, বাঙ্‌লা ভাষা ভুলাইতে পারবো না। আমার মনে ঠিক কয়, এত মানুষ রইছি আমরা। যাউক, তুই পরশুদিন আইস্যা আমারে সখী-সোনার গান শুনাইয়া যাইস, ক্যামন ?"

"আইচ্ছা।"

ঝাঁকরা ঝাঁকরা চুলে-ভরা মাথাটা স্বীকৃতিতে দোলাল আজম।

এক সময় বৃদ্ধা উঠে গেলেন। রাত্রি গহন হ'ল।

উন্মুক্ত দরজার মধ্য দিয়ে অবারিত আকাশের দূরবিস্তৃত পটভূমি নজরে আসে। কাল রাত্রির মত আজও তারার স্বর্ণচম্পা ফুটে রয়েছে অজস্র। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটা আগ্নেয় সুরের কুহেলিকা সমস্ত স্নায়ুগুলোর ওপর নেমে এলো আজমের। তারও পর সেই অস্পষ্ট কুয়াশা একটা সুস্পষ্ট জ্যোতির্ময় রূপ গ্রহণ করল।

আজমের কলমটা হরফের পর হরফের সজ্জায় কাগজের পত্রপুট ভরিয়ে তুলতে লাগল একটার পর একটা ; অনেক, অজস্র।

বাইরে নিস্তব্ধ ত্রিযামা ঝিম ঝিম করছে। এই মনসামঙ্গল, ভাসানের গানের দেশ এখন একটা কোমল-মসৃণ ঘুমের অতলান্তে ডুবে গিয়েছে। তারই শিয়রে অতন্দ্র বসে বসে আগামী কালের সূর্যসাধনা করে চলেছে আজম ; সহস্র সহস্র মানুষের বিমুগ্ধ অভিনন্দনে প্রাণিত কবিদার সে।

এক সময় কলম থেমে গেল। প্রসন্ন পরিতৃপ্তিতে গুন্ গুন্ করে সদ্য রচিত গানটায় সুরের প্রাণসঞ্চার করল আজম। বেশ ভালই হয়েছে। বড় ভূইঞা, ইমাম সাহেবের জিন, মৌলবী, বাঙলা ভাষাকে যারা হত্যা করতে চাইছে, সেই সব অজানা শয়তানদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ছন্দ বেশ প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে।

কাল রাত্রির কথা মনে পড়তেই ঠোঁটের ওপর দিয়ে একটা মৃদু হাসির রেখা আভাসিত হ'য়ে উঠল। নতুন দিনের কবিদার সে। কোমল হাতে শুধু খাগের কলমই নয় কঠিন থাবায় কোচের ফলা ধরার প্রয়োজনও তার আছে। রৈবতক, পলাশীর যুদ্ধের সেই রহস্যময় পথটা আর কতদূর গিয়ে পরিসমাপ্ত হয়েছে, এখনও আজমের পরিষ্কার জানা নেই।

কুপীটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে গায়ের ওপর ভারী কম্বলের উষ্ণ আশ্রয়কে টেনে নিল আজম।

চোদ্দ

আবার সেই মোরগ-ডাকা আশ্চর্য সকাল।

বিছানা থেকে উঠেই সোনারঙের কেরায়া ঘাটের দিকে পা চালিয়ে দিল আজম; মনের ভেতর কালকের গানখানা বিচিত্রভাবে দোলা দিয়ে দিয়ে উঠছে। একটা অদ্ভুত ঝঙ্কার উঠছে কথাগুলোর।

দুপাশে সজীব ঘাসের পত্রফলকে শিশিরের চুণীপান্না। দুরান্ত সূর্য রক্ত কমলের মত ফুটে রয়েছে।

এক সময় কেরায়া ঘাটে এসে দাঁড়ালো আজম। বংশীবটের বিসারিত পত্রাচ্ছদনের নীচে এই শিশুপ্রভাতেই এসে দাঁড়িয়েছে কেরায়া মাঝি, ভেসাল-জেলে, মহাজনী নৌকার মাল্লারা। তাদের মধ্যে মনসুরের আকাশ--সংকেত করা মাথাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

সাম্‌নে এগিয়ে এসে আজম বলে; "ভাইসাহেব আইছি।"

"হ্যাঁ—ভালো হয়েছে। তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। এবার যেতে হ'বে আমাদের। চল।" চারপাশে বৃত্তাকার মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে মনসুর বলল; "আজ এখানে যে জমায়েৎ হবার কথা ছিল, তা আর হ'ল না। পরে একদিন হ'বে। তোমরা সকলে শুনে রাখো আমাদের বাঙ্‌লা ভাষার জন্য সহরে কাল গুলী চালিয়েছে। তোমরা আজ থাক, প্রয়োজন হ'লে তোমাদেরও যেতে হ'বে। আমরা এখন যাচ্ছি। তোমরা সকলে প্রস্তুত থেকো।"

মনস্থর আর আজম গুদারা (খেয়া) নৌকার পাটাতনে এসে উঠল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে অজস্র মানুষের চলমান প্লাবন একেবারে মেঘনার তরঙ্গ সূচনায় এসে নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

নৌকাটা ধীরে ধীরে মাঝ-নদীর দিকে এগিয়ে চলতে স্থরু করল। অনেক দূর থেকে পারের মানুষগুলোকে ছোট ছোট বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। সহসা সেই অভিভূত মানুষের স্তব্ধ পরিসীমানা থেকে একটা শপথ গর্ভ চীৎকার ভেসে এলো; "আমরা ঠিক আছি ভাই সাহেব; বাজান নানার ভাষা আমরা বাচামুই।"

মেঘবরণ নদীর দূরান্তে মনস্থরের প্রসন্ন হাত নাড়ার চিহ্ন। সামনের দিকে হাতটা প্রসারিত করে আন্দোলিত করছে সে।

একটু একটু করে সূর্যস্বাক্ষর পরিষ্কার হয়ে চিহ্নিত হচ্ছে পারের স্থনীল বনরেখার ওপর; প্রভাতী বন্দনা সমাপ্ত ক'রে ঝাঁকে ঝাঁকে নাম-না-জানা পাখী আকাশের নিঃসীম শূন্যতায় শতনরীর মত বেড় পরিয়েছে। মোচার খোলার মত ছোট ছোট জেলে ডিঙি নদীর ওপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে রয়েছে।

সদরঘাটে নেমে, বাঙলা বাজার উজিয়ে, রমনা পেরিয়ে দুজনে চলে এলো বিদ্যার সেই পবিত্র ভূমিতে। ঢাকা য়ুনিভার্সিটি। এখানেই তবে পড়াশোনা করতে আসে মনস্থর।

হৃৎপিণ্ডের ওপর দামামার নির্ঘোষ যেন শুনতে পাচ্ছে আজম। সামনের দিকে অপরিচয়ের দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিয়ে একেবারে চমকে উঠল সে।

বিরাট দালান। সামনে ছোট ছোট করে ছাঁটা ঘাসের সবুজ জমির বিছানা। তারই ওপর মিলিটারী ভ্যান; সমস্ত জায়গাটা ছেয়ে গিয়েছে পুলিশ-বন্দুক-লাঠির একটা মিলিত হিংস্রতায়। একটি অগ্রগামী পদক্ষেপের

সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের ব্যারেলগুলো সবুজ আগুন উদ্গীরণ করে নিষ্ঠুরভাবে গর্জ্জে উঠবে।

চারপাশে অজস্র ছাত্র একই কঠিন প্রতিজ্ঞায় পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, কতকগুলি অপরূপ মেয়েও রয়েছে গেটটার একপাশে। পিঠের ওপর দিয়ে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে প্রলম্বিত বেণী, আর বুকের ওপর সোনালী হাতের সুদৃঢ় আকর্ষণে চেপে রেখেছে বই খাতাগুলো। অনেকগুলো মেঘনাদ বধ কাধ্য আর মনসাঙ্গমল ও যেন দেখতে পেল আজম। কিন্তু এই চক্‌চকে রাইফেলের নলের সম্মুখে, এই বিপদমৃত্যুর রক্তাক্ত মুহূর্ত্তে, এই হিংস্র প্রেতযজ্ঞের পটভূমিতে কেন এসেছে এই সুঠামতনু কুলকন্যারা। আজম ঠিক করে উঠতে পারে না। ভাসানের গান, ময়নামতীর ছড়ার এ কোন মৃত্যুগর্ভ অর্থের মুখোমুখী তাকে টেনে নিয়ে এসেছে মনসুর!

সবগুলো ছেলেমেয়ের চোখে ঝক্‌মক্ করছে কী একটা শাণিত প্রতিজ্ঞা, কী একটা বজ্রদীপ্ত সঙ্কল্প।

মনসুরকে দেখেই একটা গুঞ্জন উঠল; একটি মেয়ে সমুখে এগিয়ে এসে বলে; "তোমার যে এত দেরী। ময়মনসিং, বরিশাল, ফরিদপুর—সব জায়গা থেকেই আশাতীত সাড়া দিয়েছে ছাত্ররা। সকলে এসে গিয়েছে সেই ভোর রাত্রে। কেবল তোমার জন্যই অপেক্ষা।"

"হ্যাঁ একটু দেরী হয়ে গিয়েছে। এই যে সেই বৈতালিক কবি, যার কথা সেদিন তোমাদের বলেছিলাম। এর নাম আজম। এর গান দিয়েই আজকের মিটিঙ্ সুরু করবো।"

মেয়েটির যুক্ত-কর একটি নাচের মুদ্রার কমনীয় ভঙ্গিতে কপালের ওপর উঠে এলো; মিষ্টি করে হেসে ছন্দিত গলায় সে বলল; "খুব খুশী হয়েছি কবি আপনাকে পেয়ে, জাতীয় ভাষার এই সঙ্কটময় অবস্থায় আপনারা

ঝাঁপিয়ে না পড়লে কি করে চলবে। আসুন, আসুন, এদিকে আসুন।"

বিনীত স্বাগত জানালো মেয়েটী।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মেয়েটির সঙ্গে গেটটার দিকে এগিয়ে গেল আজম। ইতিমধ্যে অনেকগুলো ছেলে মেয়ে এসে ঘিরে ধরেছে মনসুরকে, বলে; "মনসুরদা, এখনই কি গেট ভেঙে ঢুকবো আমরা! মিটিঙ্ করতেই হবে আজ। শুধু আপনার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি সেই সকাল থেকে।"

"নিশ্চই, মিটিঙ্ আমরা আজ করবই য়ুনিভারসিটির ভেতরে।"

একটি কণ্ঠ ভেসে এলো; "আজও গুলি চলবে বলে মনে হচ্ছে। দেশী গভর্ণমেণ্ট এত টির‍্যানিক্যাল্ হয়ে উঠেছে; স্বাধীনতা পাওয়ার আগে টের পাইনি।"

অনেকগুলো গলা পদ্মা-মেঘনা ইলসা-বুড়ীগঙ্গার মাতাল বন্যার মত গর্জ্জন করে উঠল; "সাতচল্লিশ সালে আজাদীর প্রহসন করেছে—তাও সয়েছি, দেশের মানুষ না খাইয়ে ম্যাসাকার করেছে—তাও সহ্য করেছি। কিন্তু আজীবনের ঐতিহ্যকে অপমান করে হত্যা করবে, তা বাপ হলেও সহ্য করব না। করুক গুলি, দেখব কত ট্রুকুল্যাণ্ট আর টাইর‍্যাণ্ট ওরা।"

মনসুর বলল; "ভাই সব, তোমারা একটু দাঁড়াও, আমি ওদের নিয়ে আসছি; তারপর সব একসঙ্গে সামনের পথ দিয়ে ঢুকবো।"

আজমের পাশে এসে দাঁড়াল মনসুর; পিঠের ওপর বিশাল হাতখানা কোমল আশ্বাসের মত বিছিয়ে দিয়ে শান্ত গলায় বলল; "ভয় পেয়েছ কবি! ভয়ের কিছু নেই। এই সংগ্রামই শেষ নয়। তবে এটার প্রয়োজন সর্বাগ্রে।' এরপর মুখোমুখি দাঁড়াতে হ'বে বড় ভূইঞাদের। এখানেও বড় ভূইঞারা নানা রূপ নিয়ে রয়েছে।"

"আইজ্ঞা।"

আড়ষ্ট স্নায়ুগুলো ঠেলে ঠেলে কথাটা ঠোঁটের ওপরে উঠে এলো আজমের। ইতিমধ্যে সেই মেয়েটি পাশে এসে দাঁড়িয়েছে; পিঠের প্রলম্বিত বেণী, বুকের ওপর আড়াআড়ি করে ধরা মেঘনাদবধ না যেন কথানা বই, এ ছাড়া সব কিছুই দুর্বোধ্য ঠেকছে আজমের চেতনায়।

মেয়েটি তাড়া দিয়ে ওঠে; "চল, এবার চল সব। সিডিউল্ড্ টাইম মনে আছে মিটিঙের? এগারোটা বাজে যে।"

সেই মত্ত ছাত্র-জনতার প্রবাহ য়ুনিভার্সিটি গেটটার দিকে এগিয়ে চলেছে। একেবারে সমুখে সেনাপতির মত পা ফেলছে মনসুর আর আর সেই মেয়েটি; তাদের পেছনে অসংখ্য জোড়া পায়ের ভৈরব ধ্বনি শুনতে শুনতে আজমও অগ্রসর হতে থাকে।

ওপাশ থেকে অনেক গুলো রাইফেলের নল হিংস্র প্রতিজ্ঞায় উদ্যত হয়ে উঠল; একটা নির্ম্মম গলা ভেসে এলো; "হল্ট্, ডোণ্ট্ প্রসিড্ এনি ফারদার—"

একবার দাঁড়িয়ে পড়ল মনসুর; পেছন দিকে ফিরে তাকাতেই তার চোখে বৈশাখের আগুনজ্বালা সূর্যের উত্তাপ পেল যেন আজম। ততক্ষণে মনসুরের কণ্ঠে একটা ক্রুদ্ধ আগ্নেয়গিরির আত্মবিদারণের আওয়াজ উঠেছে; "বন্ধুগণ, যারা মরতে না চাও ঘরে ফিরে যাও। ভয় যাদের বেশী তারা, ভয় যাদের নেই, তাদের অগ্রগতিকে গণ্ডগোল করে জটিল করে তুলো না।"

কী আশ্চর্য! ওপাশের ঐ হাফ প্যাণ্ট পরা কাঁধের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি করে স্কুলের ব্যাগঝুলানো ছেলেটাও এক পা সরে গেল না পেছন দিকে।

কে যেন শ্লোগান দেয়; "বাঙলা ভাষা।"

"রক্ষা করো, রক্ষা করো।"

অনেকগুলো শাণিত গলায় স্থির উচ্চারণ উচ্চকিত হ'য়ে ওঠে।

একটু চমকে উঠল আজম। সেই মেয়েটি মনসুরের হাতদুটো আঁকড়ে ধরেছে ব্যগ্র মুঠিতে, ব্যাকুল গলায় বলছে ; "ফিরে চল মনসুর, কী প্রয়োজন এর ? বুলেট তো তোমার বুকেই প্রথম লাগবে। না, না, চল মনসুর।"

রাইফেলের চক্‌চকে নলের সামনে এ কোন জীবন-কাব্য, এ কোন রোদন-ভরা মানস শিল্প ; জলবাঙলার অজস্র মানুষের অভিনন্দন পাওয়া কবিদার ঠিক করে উঠতে পারে না।

হাতটা ছাড়িয়ে মনসুর বলে ওঠে ; "এখন ওকথা ভাববার সময় নেই ; ফার্স করো না রুবি।" তারপর অত্যন্ত অপরিচিত গলায় উচ্চারণ করে উঠল ; "ভুলে যেওনা রুবি সে কথা ক'টা—ইয়ণ্ডার স্কাই ছাট শাইনিং ষ্টার, এ ফিক্স্‌ড ফ্লেম্—"

এই কথাগুলোর অর্থ আজম বোঝে না, মনসুরের ঐ গলাটার পরিচয়ও এই প্রথম পেল সে ; কিন্তু নির্ভুলভাবে সে বুঝেছে, মনসুরের ঐ রহস্যময় উচ্চারণ একটা নিশ্চিত ঝড়ের সওয়ার হ'য়ে হু হু করে কি একটা অনিবার্য সংকেতকে এই মুহূর্ত্তে, এই পটভূমিতে আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছে।

ইতিমধ্যে গেটের ওপর গিয়ে পড়েছে মনসুর। আর সঙ্গে সঙ্গেই অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। হাঁটুর ওপর এসে উল্কার মত একটা রাইফলের গুলি বিঁধেছে। পা-টা চেপে যন্ত্রণাবিকৃত মুখে বসে পড়ল মনসুর।

স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মিছিলটা।

একমুহূর্ত্ত দ্বিধা করল আজম।

সে নির্ভূম চাষার ছেলে—না, না। তার আর একটা পরিচয় আছে—সে কবিদার। পৃথিবীর বৃহত্তম দিগন্তটা তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তার খ্যাতির অভিনন্দন পদ্মা-মেঘনা-আড়িয়াল খাঁ—মনসামঙ্গলের দেশের উত্তরঙ্গ নদী, নিবিড় অরণ্য, রূপালী বালুচর—এক ক্রান্তি রেখা থেকে আর এক

চক্রবালের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সোনারঙের খালের পারে দিয়ে মনস্থরের পাশে পাশে সন্ধ্যার সেই রহস্যময় পথটা এক বিচিত্র জগতের স্থর্যোদয়ের দিকসঙ্কেত করেছে—সেই রৈবতক, সেই মেঘনাদবধ কাব্য, সেই ময়মনসিংহ গীতিকা, রমিনার সেই আর্ত্ত পলায়ন, আজাদীর দিন সৎ-ভাইএর সেই রক্তবমন, আম্মার সেই অম্লগন্ধি বমি, পরশু রাত্রের সেই রক্তাক্ত কোচের ফলা—

বাজান তাকে ভাত দেবে না বলে শাসিয়েছে—না দিক; সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে বাতাসে দোলা-লাগা মর্মরিত তালের বীথিটার পাশে কোনদিন আর অপেক্ষা করবে না রমিনা, না করুক। তার বয়ঃসন্ধির স্বপ্নকামনাকে কিনে আনার মূল্য সে তুলে দিয়েছে সেই রহস্যময়ীটার হাতে। পেছনের আকর্ষণ আর নেই তার। সোনারঙের কেরায়া ঘাটে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অজস্র পরিশ্রমী মানুষ তার জন্যই দাঁড়িয়ে আছে—কিংবা মুখুটি বাড়ীর বৃদ্ধাও শুনতে চেয়েছিল সখীসোনার গান। থাক ওরা। আজমের জায়গার নতুন কেউ আসবে, আসবে নতুন প্রভাতের কবি; নতুন মানুষের বৈতালিক। এই মহাভাষা বাঙলা দিয়ে বাঁধবে কত কান্তকোমল পদাবলী। উত্তরস্থরীদের জন্য নিরাপত্তার আশ্বাস রেখে যাবে আজম। এই রক্তাক্ত মুহূর্ত্তটা তার কাছে বড় পবিত্র। জীবনের সবচেয়ে পরিচয় সে পেয়েছে—সে কবিদার।

সামনের দিকে একবার তাকালো আজম, আচমকা দৃষ্টিটা থমকে গেল মনস্থরের দেহটার ওপর; বাণীর বরপুত্রের শ্বেত পদ্মের মত দেহটা রক্তকমলের মত লাল হয়ে গিয়েছে। মনস্থরের রক্তের আয়নায় একটা ছায়া দুলে গেল—মনসামঙ্গল, না রমিনা, না কাল রত্রির সেই শানানো কোচের ফলা, না সব মিলিয়ে একটা কিছু?

আজমের রক্তের ভেতর দিয়ে পরশু রাত্রির মত কোচের ফলা নিয়ে

ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা মর্মান্তিক উত্তেজনা শির শির করে সঞ্চারিত হয়ে গেল। কিন্তু, কিন্তু একটা কোচ দিয়ে একটা আফজলের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যেতে পারে। দেশব্যাপী সহস্র সহস্র আফজল হকেরা আর বড় ভূইঞারা ছড়িয়ে রয়েছে; তার জন্য অতিকায় কোচের প্রয়োজন।

সহসা দৃষ্টিটা মনসুরের চোখের মণির বিন্দুতে স্থির হ'য়ে পড়তেই সমস্ত মর্মকোষের মধ্য দিয়ে একটা ভূমিকম্পের প্রচণ্ড উৎক্ষেপ বয়ে গেল আজমের। সে চোখে পদ্মা-মেঘ্‌না-ইল্‌সাপারের অজস্র মানুষের জিজ্ঞাসা, আর তীক্ষ্ণ দাবীর জ্বালা প্রতিফলিত হয়ে রয়েছে। সামনের দিকে তাকালো আজম। রাইফেলের চকচকে শিকারী নলের মাথায় মনসামঙ্গলের সর্বশেষ অর্থটা যেন পরিষ্কার হয়ে ফুটে বেরিয়েছে। সেই রহস্যময় পথটা একটা জ্যোতির্ময় অথচ স্পষ্ট আলোকমূর্ত্তির মধ্যে যেন ফুরিয়ে গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে বড় ভূইঞার হিংস্র সরীসৃপী চোখ দুটোকে।

এই মুহূর্ত্তে একটা বিরাট হাতিয়ারের সন্ধান পেয়েছে আজম। সে অস্ত্র তার সংগীত; সে অস্ত্র তার সুর; সে অস্ত্র তার কণ্ঠ।

নিমেষে দ্বিধাটা কেটে গেল আজমের। পেছনে স্তব্ধ সমুদ্রের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে মিছিলটা। নিজেরই অজান্তে কাল রাত্রির সেই গানটা শাণিত কৃপাণের মত ঝকঝকে কণ্ঠে একটা ভৈরব ঝঙ্কার তুলল আজমের:

'ও রে, আমার বাঙ্‌লা ভাষা—
তুমি আমার পরাণ-বন্ধু, আমার বুকের লৌ,
মায়ের মুখের মিষ্ট কথা; সখীর মুখের মৌ।
কোন দানবে বান্ধিতে চায় তোমার হস্ত ধরি,
তোমার দুখে ধিকি ধিকি আমরা জ্বইল্যা মরি—
হে সুন্দরী।

ও রে, আমার বাঙ্‌লা ভাষা—
কোনখানে কোন ভাইরা আছ বাঙ্গালী সুজন,
বাঙ্‌লা মায়ের চুল ধইরাছে দুষ্ট দুঃশাসন,
তোমার বুকে রক্ত নাই কি বাঙ্গালী সুজন!
দানব মাইর‍্যা মায়ের তুমি ঘুচাও বন্ধন।'

গাইতে গাইতেই গেটটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আজম। বড় ভূইঞাদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ প্রাণকে মুক্তি দেবার জ্বালাময়ী সুযোগ খুঁজে পেয়েছে সে। মনসামঙ্গলের দেশের সে প্রথম সাগ্নিক কবিদার। তারই একটি নির্দেশের জন্য মেঘনাপারের মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংগ্রামী মানুষ। থাক তারা।

আর একঝলক সবুজ আগুন ঝলসাল রাইফেলের হিংস্র ব্যারেলটার মুখে, আর সঙ্গে সঙ্গেই বিদীর্ণ পাঁজরটা চেপে বসে পড়ল আজম।

সেই মুহূর্ত্তে ঘটে গেল ঘটনাটা।

পেছনের সেই সহস্র মত্ত পদধ্বনি এবারে বন্যার মত হু হু করে এসে পড়েছে সেই ছোট ছোট করে ছাঁটা ঘাসের জমি-শয্যায়, মিলিটারী পুলিশের সেই অবরুদ্ধ দুর্গটা ভেঙে ছত্রখান হয়ে গিয়েছে। সব কিছুকে ছাপিয়ে; সব কোলাহলকে ডিঙিয়ে প্রমত্ত ছাত্র-জনতার মর্ম্মকোষ থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সুতীক্ষ্ণ গর্জ্জন উঠছে:

"বাঙ্‌লা ভাষা—"

"রক্ষা করো, রক্ষা করো।"

দেখতে দেখতে চোখের ওপর বাদুড়ের ডানার মত কালো যবনিকা নেমে আসতে লাগল আজমের; ঘিয়ের দীপের মত প্রসন্ন দৃষ্টিটা স্তিমিত হ'য়ে আসছে একটু একটু করে। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের শেষ আর

প্রায় নিঃশব্দ স্পন্দনগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে আজম নির্ভুল শুনতে লাগল:

"বাঙলা ভাষা—"

"রক্ষা করো, রক্ষা করো।"

একসময়ে দৃষ্টিটা একেবারেই নির্বাপিত হ'য়ে যায় আজমের। মনসা-মঙ্গলের দেশের সে বিপ্লবী কবিদার। তার শোণিতশুদ্ধ ভাষাকে সহস্র সহস্র হৃদয়ের ফসলের প্রার্থনা-ভরা প্রান্তরে অগ্নিবীজের মত ছড়িয়ে দিয়েছে সে।

* * * *

এর পরেও আর এককাল এক আছে; আছে আর এক ইতিহাস। মনসুর, আজম—এদের রক্তে স্নান করে আগামী প্রভাতে ঝলক-লাগা ক্রান্তিরেখায় উদিত হবে নতুন পৃথিবীর সূর্য; নতুন উদ্দীপনায়, নতুন প্রেরণায় সাতকোটি মানুষের জয়যাত্রার রাজপথ মসৃণ করে দেবে। আর ভয় নেই। আমরা যারা রইলাম; তাদের মহিমার ধ্বজাকে আকাশের দিকে তুলে ধরে, তাদের কীর্ত্তিকে ধ্রুবতারা ক'রে এগিয়ে যাব। এই রক্তধৌত পবিত্র মুহূর্ত্তে আমরা সাতকোটি নিবেদিত-প্রাণ মানুষ প্রতিজ্ঞা নিলাম, তাদের রক্তদানেও যে ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি অসমাপ্ত রইল, আমাদের অস্থিমজ্জা দিয়ে, আমাদের আত্মদান দিয়ে সে ইতিহাসের অধ্যায় রচনা শেষ করে যাব।

